ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ১৯৪৭-১৯৫১

এ. জি. স্টক

ভাষান্তর ॥ মোবাশ্বেরা খানম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দফায় তিনি ঢাকা ভিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। প্রথমবার দেশ বিভাগের ঠিক প্রাক-মুহূর্ত থেকে ১৯৫১ সন অবধি, দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। '*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি*'-তে মিস এ জি স্টক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে তাঁর প্রথম পর্বের শিক্ষকতা জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন। কিন্তু একজন নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষকের পেশা বা কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণী মাত্র নয় এ বইটি। তৎকালীন পূর্ব বাঙলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্র হিসেবেও বইটির একটি আলাদা মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে।

একজন বিদেশিনী হিসেবে খানিকটা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কিন্তু গভীর আগ্রহ ও দরদ নিয়ে মিস স্টক এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সাধারণ জনজীবন, বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ইত্যাদিকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। সদ্য-গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব, এ ব্যাপারে তরুণ সমাজের প্রতিক্রিয়া, আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের স্বরূপ, সর্বোপরি ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট চাঞ্চল্য ও গণজাগরণ-নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে অগ্নিগর্ভ সে সময়ের যে অন্তরঙ্গ ও বিশদ বিবরণ লেখক দিয়েছেন কি বস্তুনিষ্ঠতায় কি ঐতিহাসিক মূল্যে তার সমকক্ষ রচনা বেশি পাওয়া যায় না। মিস স্টকের মূল ইংরেজি বইটি বেশ কিছুকাল আগেই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এর একটি বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হয়ে আসছিল।

মোবাশ্বেরা খানমের শ্রমনিষ্ঠ, প্রাঞ্জল ও বিশ্বস্ত অনুবাদটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা তাই আনন্দিত। সবাইকে শুভেচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোবাশ্বেরা খানম-এর জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, বেড়ে ওঠা ঢাকায়। বাবা মোহাম্মদ মোস্তফা আলী 'কাশতকার' ছদ্মনামে জনপ্রিয় ছিলেন কৃষিবিষয়ক লেখালেখির জন্যে। মা মোহসেনা খানম আগ্রহী ছিলেন চিত্রাংকনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে স্নাতক, মাষ্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন। অনেক টেলিভিশন নাটকের নাট্যরূপ যেগুলো প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন চ্যানেলে। রবীন্দ্রনাথের বেশ ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। মৌলিক নাটকও লিখেছেন। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির সহযোগী অধ্যাপক ও ডীন হিসেবে কর্মরত।

জীবনসাথী : চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন নাটক নির্মাতা সাইদুল আনাম টুটুল। তাদের দুই কন্যা ঐশী আনাম ও অমৃতা আনাম।

প্রচ্ছদ ॥ মোবারক হোসেন লিটন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি
১৯৪৭-১৯৫১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি
১৯৪৭-১৯৫১

এ.জি. স্টক

ভাষান্তর

মোবাশ্বেরা খানম

SUBARNA

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ❑ এ.জি. স্টক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১১। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১।
প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক। সুবর্ণ। বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দোতলা)
রুম নং ২৩৫। ৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০। ফোন : ৭১২২৪১৬
কম্পোজ : উত্তরণ কম্পিউটার। মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স। ৩৬ শ্রীশ দাস লেন।
ঢাকা ১১০০। স্বত্ব : অনুবাদক। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ।

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 70297 0090 7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জি স্টকের ভূমিকা

১৯৭০ সালের ক্রিসমাসের ঠিক আগে আমি ইংল্যান্ডের একটি গ্রামের শান্ত পরিবেশে বসে, যেখানে এসে থেমেছিলাম প্রায় বিশ বছর সাগরপারে কাটানোর পর, এই স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেছিলাম। এই স্মৃতিকথায় লিখতে শুরু করেছিলাম কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তার ক্রোধ, ক্ষোভ, চমৎকার সাহচর্য ও অবর্ণনীয় আকর্ষণ দিয়ে অমন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বাগতম জানিয়েছিল এবং প্রায় সিকি শতাব্দী আগে এতকিছু শিখিয়েছিল সেসব মনে করার আনন্দে। মনে হচ্ছিল সেই সময় ও স্থান থেকে তখন আমি যেন অনেক দূরে, কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে বাস না করে কারও জন্যে তার সাথে যোগাযোগ রাখা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত একটি মনস্তাত্ত্বিক ফাটলে পরিণত হয়েছে, বরং ইংল্যান্ড মানসিক ও শারীরিকভাবে দুদেশের কাছেই তাদের পরস্পরের চেয়ে বেশি সহজগম্য ছিল। তবে আমি তখন ইংল্যান্ডে ছিলাম না। ১৯৫১ সালে ঢাকা ছাড়ার পর আমি দুটো সংক্ষিপ্ত সফরে ফিরে এসেছিলাম, একবার ১৯৫২র শেষে পাঞ্জাব থেকে আর একবার আরও কবছর পর কলকাতা থেকে। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানতাম না কেবল মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় প্রলয়ঙ্করী বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের সংবাদ-বিস্ফোরণ ছাড়া। যদি কখনও সবকিছু ঠিকঠাক চলত তা খবর হত না। তবুও এই খেরোখাতা থেকে কিছু-কিছু ব্যাপার অনুমান করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান সব সময়েই অসন্তোষ ও সমস্যায় কীর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখনও আন্দোলনের পুরোভাগে, তারা এমন একটি সরকারের মুখোমুখি যে-সরকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার জন্যে আরও বেশি প্রস্তুত যেন আমার সময়ের চেয়েও। কিন্তু আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম এই সবকিছু নিয়েই ঢাকা ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীতে রূপ নিচ্ছে, যদিও পাকিস্তানের শুরুতে যে ফাটলের আভাস দেখা দিয়েছিল তা মোটেও বন্ধ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল, অনিচ্ছুক পশ্চিম পাকিস্তানকে চাপের সাথে একথা বুঝিয়ে যে সে তার আত্মপরিচয় নিয়েই রাষ্ট্রটির একটি অংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর বেশি আমি কিছুই জানতাম না। আর যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী অস্পষ্ট ছিল, আমার স্মৃতি ছিল স্পষ্ট। তাই অবসরে আমি সেসব মনে করতে শুরু করলাম। আমি যখন ১৯৪৮ সালের ভাষার দাঙ্গায় এসে পৌঁছেছি তখন ১৯৭১ মার্চে শুরু হলো যুদ্ধ। টিভি পর্দায়, বেতারে এবং খবরের কাগজে বর্তমান বীভৎসভাবে জীবন্ত হয়ে এল, স্মৃতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে। প্রায় মাসখানেক পর আমি আমার বন্ধুদের ভাগ্য জানতে পেরেছিলাম। জ্যোতির্ময়কে তাঁর ছাত্রদের সামনেই হত্যা করা হয়েছিল, মুনীর চৌধুরী তাঁর সাহস ও উচ্ছলতা নিয়ে ইটের ভাটায় অনেক লাশের মধ্যে একটি লাশ হয়ে পড়েছিল। কেউ-কেউ ভারতে কেবলমাত্র প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে, কেউ-কেউ সক্রিয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। অন্য আরও অনেকের কোন খবরই জানতে পারিনি। অবশ্যই বুদ্ধিজীবীরা জঘন্যতম প্রতিশোধের শিকার হয়েছে ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার কখনও স্মৃতি ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠবে এমনটি যেন অসম্ভব মনে হতে লাগল।

আমার বইটি ভীষণ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, আর একসময় মনে হলো এই লেখা চালিয়ে যাওয়াই একটি ঠাট্টার মতো। তবু টুকরো টুকরো ও সামগ্রিক যে-গল্পই আমার জার্নালে যতটুকুই বলা হয়েছে এবং যে-স্মৃতিটুকুই তারা জাগিয়ে তুলেছে তার সবটুকুই সত্যি এবং তা হয়ত সেই বিপর্যয়ের শুরুটা কীভাবে হলো তা জানাতে কিছুটা আলো ফেলতে পারবে এক পাশ থেকে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দৃশ্যান্তরে যাবার আগের ঘটনা পর্যন্ত আমি লিখে যাব, সেই সময়ে আমি যা দেখেছি এবং ভেবেছি সেই পর্যবেক্ষণ ও ভাবনাকে এখনকার ফিরে-দেখা থেকে বিচ্ছিন্ন করেই রাখব। যখন আমি চোখের সামনে অতীতকে মেলে ধরছিলাম, বর্তমান বদলে যাচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাইভস্ম থেকে বাংলাদেশ উঠে দাঁড়িয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের ভেতর থেকে নিজেকে আবার সৃষ্টি করেছে। আমি এই অলৌকিকে আনন্দিত হয়ে উঠলাম কিন্তু নিজের চোখে দেখতে পাব এমন প্রত্যাশা ছিল না প্রায়। তাই যখন ডাক এল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয়ার, মুহূর্তের জন্যে যেন মনে হলো আমার নিজের মনের আবিষ্টতাই বোধহয় কোনভাবে কাগজের ঐ টুকরোতে বাস্তব রূপ নিয়েছে। কোন ব্যাপারে কারও অন্তরের যথার্থ উপলব্ধি এমন দ্রুত বাইরের ঘটনার সাথে খুব কমই মিলে যায়। কিন্তু এটাকেই বাস্তবে দেখা গেল এবং যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জন্যে এতটুকু জায়গাও থাকে আমি অন্য কোথাও যাবার আগে সেখানেই যাব। অতএব আমি একটি পাসপোর্ট বানালাম, টিকিট কাটলাম আর আমার সমস্ত কাগজপত্র ইকোনমি ক্লাসের ব্যাগেজে ঠেসে ভরলাম।

এই ঘটনাই হয়ত আমার দৃষ্টিভঙ্গির পাগলামিকে ব্যাখ্যা করবে। বইটি একটি স্মৃতিকথা, ইতিহাস নয়, অতএব ঐতিহাসিকের বিচ্ছিন্নতা বা গবেষণা এখানে দাবি করা যায় না। আমি যা লিখেছি তা ততটাই সঠিক যতটা সঠিকভাবে আমি উপস্থাপন করতে পেরেছি। আমার কাছে যেসব ঘটনা যথেষ্ট কৌতূহলের ও আগ্রহের বিষয় ছিল, আমি কাগজের পাতায় তুলেছি অথবা আমার মনে সেগুলোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুবহু ছিল। হয়ত অন্যেরা পেছনে ফিরে সেই দিনগুলোর দিকে তাকালে অন্য একটি পূর্ব পাকিস্তান দেখতে পাবে। আমার মনে হয়ত তা সত্ত্বেও এখানে কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, কারণ এটি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয়, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিশোধ। ঢাকা তখন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যগুলো পরে হয়েছে এবং তাদের শিক্ষকের জন্যে নির্ভর করেছে ঢাকার ওপর, এর মানসিক শক্তি ও বোধকে ভাগ করে নিয়েছে। 'ব্যাখ্যা' বলে আমি সমর্থন করাকে বোঝাতে চাইছি না ; পূর্ব পাকিস্তানের ঐ প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীরা জনগণের এত কাছাকাছি ছিলেন যে তাঁরা তাদের মূল্যবোধ, আশা ও সীমাবদ্ধতার প্রকৃত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। আর তাই তাঁরা এমন একটি সরকারের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ভীতিপ্রদ যে-সরকার এই সবকিছুকে কোন গুরুত্বই দিত না এবং এঁদেরকে কোনভাবেই গণ্য না করে দেশটিকে শাসন করার চেষ্টা করেছিল। বাংলাদেশে এসব কোন কথাই হয়ত আর বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু দেশের বাইরের পাঠকদের কাছে, যদি আদৌ কেউ থেকে থাকেন, তাঁর কাছে ব্যাপারটি অত স্পষ্ট নাও হতে পারে।

কুড়ি বছর পর ফিরে এসে, আমার মনে হলো ছাত্ররা খুব বেশি বদলায়নি, যদিও আমি বর্তমানের চেয়ে অতীতকেই বেশি জানি। মিছিল ও স্লোগানে তাদের উৎসাহ দেখে মনে হয় তারা এখনও বিশ্বাস করে যে তারা যদি মিছিল না করে, স্লোগান না দেয়, সরকার জানতেই পারে না জনগণ কি চায়, কী ভাবে। তারা ঠিক করছে কি না সেটা একজন নবাগতের বিচার্য নয়, কিন্তু আশা করা যায় যে সবসময়েই ঠিক এমন অবস্থা থাকবে না। জনগণ তাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করার একান্ত এবং আরও প্রত্যক্ষ মাধ্যম খুঁজে পাবে, এবং সরকারও এখন আর বিদেশি নয়, সুতরাং সেও নিশ্চয়ই বুঝবে বধির না থেকে কী করে সেসব কথা শোনা যায় আর ছাত্ররাও নিশ্চয়ই বুঝবে যে, মিছিল ও স্লোগানকে কমিয়ে আনার অর্থ পুরনো প্রজন্মের কাছ থেকে পাওয়া অতীত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়। স্বীকার করছি এ সমস্তই সংশোধনাতীত সেকেলে একজন শিক্ষকের মতামত। সারাজীবনের শিক্ষকতার পর অন্যরকমটি ভাবা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আমার মনে হয় প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে অন্তত একটি অত্যন্ত ভালো কথা বলেছেন, যখন তিনি ঘোষণা করেছেন যার যার নিজের কাজটি সাধ্যমতো ভালোভাবে করাই একটি ন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ সমাজের মূল গাঁথুনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং সরল চিন্তার বিকাশ। যদি প্রবল চাপে ঘিরে-থাকা এই বিশ্বের যে-কোন চাপের মুখে সে নিজেকে এই উদ্দেশ্যের কোন একটি থেকেও সরিয়ে নেয় পৃথিবীর আর কোন প্রতিষ্ঠানই তা হলে এই মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার টিকাটুলিতে অবস্থিত সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষা কোজ্রাদী ও কলেজ শিক্ষিকা পরিবেষ্টিত এ জি স্টক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের ভূমিকা

আমি তাঁকে দেখেছিলাম, কিন্তু পরিচয় হয়নি। তাঁকে জানতে পারিনি। যদ্দুর মনে পড়ছে দিনটি ছিল ১৯৭২-এর ১৮ই অক্টোবর। নবজাত বাংলাদেশে আমরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনতম শিক্ষার্থী। সেদিন প্রথম বর্ষ সম্মানের ক্লাস শুরু হয়েছে। অপরিচয়ের ভয় ও দ্বিধা, সেইসাথে কৈশোরের স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা ও কৌতূহল নিয়ে ঢুকেছি ইংরেজি বিভাগে। রুটিন বুঝে খাতায় তুলতেই সময় শেষ প্রায়। অনেক খুঁজে- পেতে ২০৬৭ নম্বর রুমে ঢুকে দেখি বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জপ্রায়, বিবর্ণ মলিন জামা পরনে একজন মেমসাহেব। কণ্ঠস্বরেও বয়সের দুর্বহ ভার কিন্তু ঠোঁটে স্পষ্ট হাসি। আমাদেরকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে সেই প্রশান্ত হাসি আরও বিস্তৃত হোলো, স্বাগত জানালেন নবাগতদের। তাঁর শিথিল দেহ, কম্পিত কণ্ঠস্বর, দুর্বোধ্য খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণ আমাদের চঞ্চল হৃদয়ে খুব দাগ কেটেছিল বলতে পারব না। তিনি অনেক কিছুই বলেছিলেন হয়ত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার আবেগে রোমাঞ্চিত হৃদয়ে এবং টানা অমন ইংরেজি শুনতে অনভ্যস্ত অনেকের কানেই তাঁর সেই কথার বোধহয় কোন আবেদনই তখন ছিল না। কেবল এটুকু উদ্ধার করেছিলাম যে তিনি মিস এ.জি.স্টক, আমাদেরকে শেক্সপীয়ারের ই Midsummer Night's Dream পড়াবেন। তারপর তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ স্নেহ ও ঔদার্যে আমাদেরকে আরও প্রগল্‌ভ হতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর সীমাহীন প্রশ্রয়ে ঐ ক্লাসটি আমাদের জন্যে শ্রান্তি বিনোদনের যথার্থ সময় হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই তাঁর অনুকরণে ইংরেজি বলার চেষ্টা চলত। তাঁর সদাহাস্য মুখ, প্রায়-মলিন পোশাক ও স্বাভাবিক শারীরিক দুর্বলতা হয়ত আমাদের তারুণ্যস্পর্ধিত মনে কিছুটা করুণারই সঞ্চার করত। তাঁকে নিয়ে হেসেছি, তিনি দেখেও প্রশ্রয় দিয়েছেন, আবার পড়ানোয় মন দিয়েছেন। কিন্তু কখনও তিরস্কারের সুর শুনতে পাইনি।

আজ এতদিন পর তাঁর বইটির অনুবাদ করতে গিয়ে যতই তাঁকে পড়ছি, ততই জানছি, অবাক হচ্ছি, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি মাথা নত হয়ে আসছে। সেইসাথে অক্ষম আক্ষেপে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি এই সত্য অনুভব করে যে এত কাছে পেয়েও তাঁর কাছে যাইনি, তাঁকে পাইনি। আসলে আমরা তাঁকে চিনতেই পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবনের যে অন্ধ অহঙ্কার অনেক সময়েই ওপরের ঝলমলে সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিভোর হয়ে যায়, মুখ ফিরিয়ে নেয় আপাত-নিরাভরণ কিন্তু গভীর অনিবার্য সত্য থেকে, সেই অন্ধত্বই তখন আমাদেরকেও বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আমরা তাঁকে পেয়েও পাইনি, সরাসরি শিক্ষক হিসেবে পাবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েও তাঁকে জানতে, বুঝতে পারিনি।

আজ প্রায় আটাশ বছর পর তাঁর স্মৃতিকথা হাতড়ে যে-মানুষটিকে আবিষ্কার করলাম তিনি যেমন আমার কাছে এক সীমাহীন বিস্ময়ের আধার হয়ে রইবেন তেমনি যেন শিক্ষাঙ্গনে ও জাতীয় জীবনের ঘনায়মান আঁধারে হয়ে রইবেন অনির্বাণ দীপশিখা, বাঙালি ও বাংলাদেশের জন্যে তাঁর ভালোবাসা ও উৎকণ্ঠায়। আজ যখন নিজের শিক্ষক জীবনে বারবারই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিশাল গহ্বরে হোঁচট খাচ্ছি, বারবারই তাঁকে মনে পড়ছে। তাঁর সংবেদনশীলতা, পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার প্রজ্ঞাকে হৃদয়ের গভীরের সশ্রদ্ধ প্রণতি।

আমার এই অক্ষম চেষ্টা সেই অপরিণত বয়সের দৃষ্টিহীনতার পাপস্খালনের প্রয়াস মাত্র। এই চেষ্টা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতা নয় বরং ঋণস্বীকারের দুর্বল একটি উদ্যোগ।

ব্যক্তি মিস স্টককে তিনি নিজেই আড়াল করে রেখেছেন তাঁর বইয়ে। নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলেননি। আমরাও জানতে পারিনি তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে। কিন্তু জেনেছি তাঁর ব্যক্তিমানসকে।

তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। একজন বিদেশিনী কী অপরিমেয় আত্মীয়তায় উপলব্ধি করেছিলেন এই দুঃখিনী ভূখণ্ডকে তারই সাক্ষী তাঁর এই অসামান্য আত্মজীবনী। ভারত উপমহাদেশ বিভক্তির সময়ে এই জনপদের অধিবাসীদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র এত বিশ্বস্ত বর্ণনায় খুব বেশি পাওয়া যায় না। তিনি দেখেছিলেন ভাঙার সংকীর্ণ রাজনীতি, দেখেছিলেন অমিত সম্ভাবনাময় মানুষের গড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, গড়ে ওঠার কাল। নির্মোহ দৃষ্টির কারণেই তাঁর এই আত্মজীবনীটি আমাদের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। মিস এ. জি. স্টকের আত্মজীবনী এই প্রজন্মের তরুণদের কাছেও বিস্ময়কর এবং প্রাসঙ্গিক মনে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ১৯৪৭-৫১ এমন একটি বই যা আমাদের কেবল সেই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি, শিক্ষার মান, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, এইসব কিছুর সাথেই পরিচয় করিয়ে দেয় না, সেইসাথে পরিচয় করিয়ে দেয় একজন নিবেদিত শিক্ষকের স্নেহসিক্ত হৃদয়ের সঙ্গে যিনি এই সবকিছুই দেখেছেন এক নব্যস্বাধীন উপনিবেশের শৃঙ্খলমুক্ত জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রাণঢালা সমর্থন নিয়ে। কিন্তু সেইসঙ্গে মিশিয়েছেন একজন বিদেশির কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা। মিস স্টক '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পটভূমি দেখেছেন, দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শহীদ মুনীর চৌধুরীকে দেখেছেন, দেখেছেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে। ডঃ সারোয়ার মুর্শেদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন তাঁর ছাত্র সহকর্মী। এবং এমন আরও অনেকেই, যাঁরা আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দেখা বাংলাদেশ, তাঁর দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে, নন্দিত শিক্ষক হিসেবে, আবার একজন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবেও, যিনি এসবের ভেতরে থেকেও বিদেশি। তাই তাঁর দেখার ভেতরে আমরা আমাদের আবেগ, অভ্যেস, পরিবেশকে যেভাবে দেখতে পাই তা নূতন করে যেন আমাদের নিজেদেরকেই নিজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এদেশের ছাত্র-রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁর মনে রেখাপাত করেছে। তাঁর সহমর্মিতা, সমবেদনা ও সেইসাথে তীক্ষ্ণ, সজাগ পর্যবেক্ষণ আমাদের মুখোমুখি করে কিছু বাস্তব সত্যের যার প্রতি হয়ত নিজেদের আবেগের কারণেই আমরা অন্ধ। যেমন ১৯৭১ সালে ২০ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে তাঁর পর্যবেক্ষণ যা তিনি নিজেই তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

আজকের সন্ত্রাসমুখর শিক্ষাঙ্গনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলুষিত রাজনীতি ও বিকৃত ইতিহাসে বিভ্রান্ত তরুণ প্রজন্মকে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়াটা খুব জরুরি মনে হচ্ছে। তাই শেকড় খোঁজার পালা শুরু হয়েছে। এখন যখন আমাদের শিক্ষা, মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সবকিছুই বিরাট একটি প্রশ্নের মুখোমুখি, তখন এই বইটি হয়ত আমাদের ফিরিয়ে নিতে পারে সেই গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুখরিত ছিল জ্ঞানচর্চায় উন্মুখ ছাত্র ও শিক্ষকের পদচারণায় ; উদ্বেলিত ছিল শত শত তরুণের দেশ ও ভাষার প্রতি ভালোবাসায়।

বিস্মৃত প্রায় সেই অতীত খুঁড়ে নস্টালজিক হবার জন্যে এই বইটি হয়ত কিছুটা ফ্ল্যাশব্যাকের কাজ করতে পারে।

আত্মপরিচয় সন্ধানে আমাদেরকে আগ্রহী করে তুলবে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে মিস ষ্টকের সম্পর্কেই আমরা জানিতে পারি খুব কম। তাঁর ছবি যোগাড় করতে গিয়েও হতাশ হয়েছিলাম, ইংরেজী বিভাগে তাঁর কোন ছবি না পেয়ে। পরে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যাক্ষা বেগম বেগজাদী আপার কাছে তাঁর ছবি পেয়েছি একটি, তাও গ্রুপ ছবি। বেগজাদী আপা ও তাঁর স্বামী প্রয়াত অধ্যাপক জনাব আব্দুল মতিন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকতুল্য মতিন স্যার, তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রপাত্রী ছিলেন। তাঁদের সাথে মিস ষ্টকের একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল।

তিনি মতিন স্যারকে সন্তান জ্ঞান করতেন এবং 'সানি' বা পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। বেগজাদী আপার কাছেই জানতে পারি ১৯৭৫ সালে বিলেতে ফিরে যাবার কয়েক বছর (হয়ত ৩/৪ বছর হবে বা তার কিছু বেশী) পর তিনি একটি Old Home যে মারা যান। তাঁর ফিরে যাবার সময়ে বিমান বন্দরে বিদায় জানাতে আসা ছাত্রদের একজন (নাট্যশিল্পী খায়রুল আলম সবুজ) তাঁর ব্যাগটি বয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেছিলেন নিজের ভার তিনি নিজেই বইতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাই করেছিলেন। তিনি নিজের ভারই কেবল নিরবে নিভৃতে বহন করেননি, আমাদের দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে যেন আমাদের অনেক ভারও স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাই '৫২র ভাষা আন্দোলনের যে পটভূমি এই স্মৃতি কথায় বিধৃত হয় তা যেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যায়। আর তাঁর গভীর ও তীক্ষ্ণ সেই পর্যবেক্ষণ এখনকার বাংলাদেশও সত্য প্রমাণিত হয়ে প্রমাণ করে তাঁর দার্শনিক সত্ত্বার শাশ্বত উপলব্ধিকেই। তাঁর প্রতি আবারও আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি। সেই সাথে তাঁর সেই অতুলনীয় ভাষা সুষমার এমন অক্ষম ও দুর্বল অনুবাদ প্রয়াসের জন্যে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা।

বইটির প্রথম খোঁজ পেয়েছিলাম জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের কাছে। তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতির একটি সংকলনে পরীক্ষা প্রসঙ্গটি অনুবাদ করে দিয়েছিলাম। এরপর অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন পুরো বইটি অনুবাদ করার পরামর্শ দেন। তার পর থেকে তাঁরই ক্রমাগত তাগিদে বইটি পুরোটাই অনুবাদ করা হয়ে যায়। প্রথমে কিছুদিন দৈনিক সংবাদে ও পরে সাপ্তাহিক 'প্রবাহ'তে ধারাবাহিকভাবে অনেকটাই ছাপা হয়েছিল। এরপর বইটি ছাপানোর সব দায়িত্ব জনাব মুনতাসীর মামুনই নিয়েছেন এবং আমাকে ঋণী করেছেন।

ফেব্রুয়ারি ২০০১

মোবাশ্বেরা খানম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

কীভাবে এলাম

সেটা ছিল নিশ্চয়ই ১৯৪৭-এর গোড়ার দিকে যখন Times Educational Suppliment-এ উগান্ডার ম্যাকারেরে কলেজের ইংরেজির একটি প্রভাষক পদে ও পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির একটি অধ্যাপক পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। আমি দুটো পদেই আবেদন করেছিলাম, যেন আমি নিজেই নিজের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে চাচ্ছিলাম যে এখন বেরিয়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

এমন নয় যে, ইংল্যান্ড আমার রুচির সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ আর দুদিকেই সন্তোষজনক একটি দ্বৈতজীবন আমি যাপন করছিলাম। লন্ডনের একটি প্রশিক্ষণ কলেজে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে আমি আমার প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করছিলাম। আর কাজ আমার ভালো লাগছিল— ভালো লাগছিল আমার সহকর্মী ও ছাত্রদেরকে, ভালো লাগছিল শিক্ষকতা। এমনকি খানিকটা বিরক্তি ও বদমেজাজের সঙ্গে সেইসব ক্রোধজনক হতাশাগুলোতেও ভালো লাগছিল, যা কিনা ঘিরে থাকে শিক্ষা বা Education-এর বড় E-কে। কারণ সৎসংসর্গে ক্রোধান্বিত হওয়াও অনুপ্রেরণাদায়ক। 'খণ্ডকালীন' মানে আমার বৃহস্পতিবার ছুটি ছিল। আর বৃহস্পতিবারে ও সপ্তাহান্তের দিনগুলোতে এবং ছুটির সময়ে আমার কাজের চাপ ছিল খুব বেশি, মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলাম বলে। এখানে 'ভালোলাগা' শব্দটা ভুল। আমি এমন একটি বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম যে আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমার মনে হয় না যে আমি কখনও নিজেকে খুব শিগ্‌গিরই সাম্রাজ্যবাদের অবসানে সেই প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগ আসবে বলে বিভ্রান্ত করেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এর শেষ হতেই হবে এবং আমার মেজাজ, মানসিকতা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও যা-কিছু সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সবই একাভিমুখী হয়ে আমায় চালিত করছিল আমার এই বিশেষ নির্দিষ্ট গন্তব্যে। ভারত তখন স্বাধীন হবার পথে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংল্যান্ডে আমরা যা-ই ভাবি আর করি-না কেন, এই ব্যাপারে। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোর স্বাধীনতা তখনও দূরঅস্ত। আর আমরা এমন তীব্র ও দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম যে, অসম্ভাব্যতা বা তেমন সম্ভাবনা আমাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারেনি। নিশ্চিতই এই কাজেই তার পুরস্কার এসেছিল। যৌথ কাজে সহযোগী হবার আনন্দ ও বিভিন্ন ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিল কাজ করার মস্ত সুবিধা। বিভিন্ন অপরিচিত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ভেতরেও একই মূল্যবোধের স্বীকৃতি যেন ঝলসে উঠেছিল আমাদের মাঝে। আর পূর্ণকালীন শিক্ষকতার পদের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি বা পেনশনের আবিষ্কারের তা ছিল বিরাট ক্ষতিপূরণ।

এই দ্বৈতজীবনে অন্য কোন অসুবিধে ছিল না, কেবল সমস্যা ছিল যে দুটো দিক যেন পরস্পরের সঙ্গে খাপ খেত না, কারণ দুটোই ছিল জীবনগ্রাসী। সাহিত্যে আমার বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল। কেবলমাত্র গভীর বিশ্বাস ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রাখার মতো কোন বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আমার ছিল না। দুটো জীবনকেই আমার প্রয়োজনীয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত একটিকে বেছে নিতে হয়েছে। তাই এই নবোত্থিত দেশগুলোর কোনটিতে গিয়ে সাহিত্য পড়ানো আমার এই দ্বন্দ্বের সমাধান বলে মনে হলো। জাতিগঠনের কাজে হয়ত এই কাজ সামান্যই ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু তা একেবারে তুচ্ছও নয়। আর এই কাজের অনুশীলন আমাকে বুঝতে সাহায্য করবে সেইসব লোককে যাঁদের বক্তব্য বোতলের ছিপি খুলতে সাহায্য করতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। ক'মাস ধরে এই সক্রিয় যুক্তি আমার মাথায় কাজ করছিল, ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রচণ্ড শীতে দুটো বিজ্ঞাপন নিঃসন্দেহে সেই যুক্তিকে আরও জোরালো করে তুলল। সেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কালো আকাশ, তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস, বরফের স্তূপ, শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়া পথ আর জ্বালানির স্বল্পতা এই দুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে ; রৌদ্রালোকে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট ভালো যুক্তি দাঁড় করায়।

যোগ্যতার দিক থেকে আমি ভেবেছিলাম ম্যাকারেরে প্রভাষক পদটি পাওয়ার হয়ত সুযোগ আছে, কিন্তু স্পষ্টতই বাছাই কমিটি তা ভাবেননি। তাই আমাকে ইন্টারভিউতেই ডাকলেন না। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের জন্য আবেদনটি অবশ্যই একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল।

আমার বেশ ভালো একটি ডিগ্রি আছে, এবং নিজেকে সে কাজটির যোগ্য ভাবার কারণও ছিল, কিন্তু বেশ ভালোই জানতাম যে গত বিশ বছরে আমি অক্সফোর্ড ছাড়বার পর থেকে এমন কিছুই করিনি যাতে দায়িত্বশীল একটি কমিটি আমার ব্যাপারে রাজি হতে পারে। রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে যখন এমন একটি চিঠি এল যে যদি আমাকে নিযুক্তি দেয়া হয়, তা হলে আমি কত তাড়াতাড়ি সেখানে যোগদান করতে পারি ও কেমন বেতন আশা করি, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন টাইপিস্টের ভুলে চিঠিটি এখানে চলে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গেই এল উপাচার্যের কাছ থেকে আরেকটি আনুষ্ঠানিক চিঠি যাতে সবকিছু ব্যাখ্যা করা ছিল। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, আমরা অক্সফোর্ডে একই সময়ে ছিলাম এবং জানালেন যে যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোতে কিছু সময় লাগবে কিন্তু আমি যদি সত্যি সত্যিই আসতে চাই, তা হলে তাঁর উপদেশ, আমার সুবিধের জন্যেই, আমি যেন শিগ্‌গিরই ভারতে যাওয়ার টিকিট কেটে রাখি।

যদি আমি তখন জানতাম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যপ্রণালীর খামখেয়ালিপনার ব্যাপারগুলো, যা পরে জেনেছি, আর আমি যদি ওঁর কথাগুলোকে অতখানি বিশ্বাস না করতাম আমি ভুল করতাম। ডঃ মাহমুদ হাসান যে-কোন কমিটিতে তাঁর মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রকৃতই আস্থাশীল ছিলেন।

আমার মনে পড়ল, অক্সফোর্ডে আমি যখন অনার্স পড়ছিলাম, উনি তখন ডক্টরেট-এর থিসিস লিখছিলেন। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে তো চিনতামই না মনে হয় তবে সেই সময়ে রোববারের সান্ধ্য মজলিশি বিতর্কে একমাত্র আমিই ছিলাম নিয়মিত উপস্থিত ইউরোপিয়ান ছাত্রী যে কিনা ভারতীয় ব্যাপারে আগ্রহী, এমনকি মাঝে মাঝে দুচার কথা বলবারও সাহস পেতাম। আমাদের কিছু সাধারণ বন্ধু ছিলেন এবং আমি প্রায়ই তাঁদের বলতাম যে আমি ভারতে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী, তবে সেদেশ স্বাধীন হবার আগে নয়। তাঁকে আমার উদ্দেশ্য ও প্রশংসাপত্র সম্পর্কে আবার আশ্বস্ত করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল।

এগুলোই কেন শক্তিশালী সুপারিশ হয়ে তখন কাজ করেছিল বুঝতে হলে আমার জানার চেয়ে বেশি ভেতরের আরও অনেক কিছু জানা দরকার। যা আমি নিশ্চিতই জানতাম তা হলো এই যে, ভারত দুটো পৃথক রাষ্ট্রে স্বাধীন হতে যাচ্ছে এবং ঢাকা পড়বে পাকিস্তানের ভিতরে। আমি কলকাতা ও নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা, সেখানে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের বিজয়ের কথা পড়েছি। আমি জানতাম না যে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, বুদ্ধিজীবীরা বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু এবং তাঁরা এত দ্রুত সীমান্ত অতিক্রম করছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী-সমস্যা সংকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। একথাও আমার মাথায় আসেনি যে যখন ব্রিটিশ সব অভিবাসীই প্রায় দেশে ফিরে আসছেন, যাঁরা অন্যদিকে যাচ্ছেন, খুব সহজেই তাঁদেরকে ভুলপথের অভিযাত্রী বলা যায়। বেশ পরে আরেকটু পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার অপ্রত্যাশিত আবেদনপত্রটি তাঁদের কাছে ঐশ্বরিক একটি অজুহাতের মতোই এসেছিল, যে-কারণে তাঁরা আরেকজন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন যাঁর নিখুঁত যোগ্যতা ও মুসলিম গোঁড়ামিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তাঁর সাহসের খ্যাতি। আমি যা দেখতে পেয়েছিলাম তা হচ্ছে এই যে—একটি সুযোগ আমাকে আমার প্রার্থিত গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কলেজে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম। ফ্রাঙ্কোনিয়া জাহাজে অগ্রিম সিট ভাড়া করলাম। জাহাজটি জুলাইয়ের শুরুতে লিভারপুল থেকে ছাড়বে। বেতনের ব্যাপারে রেজিস্ট্রারের প্রশ্নের জবাবে আমি জানালাম, যদিও কত চাওয়া যায় সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই, আমি আমার সহকর্মীদের মতোই জীবনযাত্রার মান রক্ষা করে চলতে চাই এবং আশা করি একই যোগ্যতাসম্পন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ভারতীয়কে যে-বেতন দেয়া হয় আমাকেও তা-ই দেয়া হবে। পরে জেনেছিলাম আমার উত্তরটি খুব ভালো প্রভাব রেখেছিল।

ঢাকা যে পাকিস্তানের ভেতরে পড়বে তাতে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। আমার ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম সব বন্ধুই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে ইংল্যান্ডে যার ফলে সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের হিংস্রতা তারা দেখেনি। তারা স্বাধীনতাকে দেখেছে পুরো উপমহাদেশের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা হিসেবে। দেশ-বিভাগকে দেখেছে এরই দুঃখজনক পরিণতি হিসেবে যা চিরস্থায়ী হতেও পারে, না-ও পারে।

অতিথি বক্তারা, মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস যে-দলেরই হোক, এই ধারণাকেই নিশ্চিত করতেন। আমি অধ্যবসায়ের সাথে সেইসব বক্তৃতা শুনতাম। কংগ্রেসি বক্তারা কখনও ব্রিটিশ শ্রোতাদের সামনে সাম্প্রদায়িক বিবাদকে প্রশ্রয় দিতেন না। মুসলিম বক্তারাও দিতেন না। যত প্রবল আবেগের সাথেই তাঁরা 'দুইজাতি' তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেখাতেন-না কেন তাঁরা এটা বোঝাতে ব্যর্থ হতেন যে, ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়া তাঁদের কাছে ততটাই যতটা হিন্দু ভারতবর্ষ।

আমি কিন্তু প্রথমত আত্মজীবনীর কোন অধ্যায় লেখার চেষ্টা করছি না, বরং পূর্ব পাকিস্তানকে দেখার প্রথম চার বছরে এর জীবন সম্পর্কে যে-ধারণা আমার হয়েছে সে-ধারণাই লিপিবদ্ধ করছি। বাস্তব ও সত্য হতে হলে একে ব্যক্তিগত ও পক্ষপাতপূর্ণ হতেই হবে। একটি দেহ যখন এমন বিশাল বড় ও জটিল হয় যে তাকে পূর্ণ অবয়বে দেখতে হয়, তখন এর ভেতরে যে-আকৃতিই আবিষ্কার করা হোক-না কেন তা হবে সেই দর্শকটির দৃষ্টি থেকে, যে তাকে দেখে ; সে যা দেখে অথবা দেখে না তা থেকে। আমার নিজের এই ছোট্ট বিবরণটি এজন্যেই দিলাম যে পাঠকেরা এখন এই দর্শকটির দৃষ্টিকে বুঝতে পারবেন, এ-দৃষ্টিভঙ্গির তাঁরা অংশীদার হবেন বা এর ভ্রমকে তাঁরা মেনে নেবেন কি-না ভাবতে পারবেন।

ফ্র্যাঙ্কোনিয়া ছিল একটি পুরনো আটলান্টিক পাড়ি-দেয়া জাহাজ যেটা মেরামত করা হয়েছিল ভারতে ও চায়নায় ভ্রমণের জন্যে। এটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর দুজন যাত্রীর জন্যে এল ডিজাইন নকশার একটি কেবিনে আমরা ছ'জন ছিলাম। কিন্তু আবহাওয়া চমৎকার হওয়ায় আমি মুখ-হাত ধোয়া ও ঘুমানোর সময় ছাড়া খুব কমই ভেতরে থাকতাম। আমার সহযাত্রীরা সময় আর ঋতুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একেবারে উপযুক্ত দল। প্রায় অর্ধেক ছিলেন ইউরোপীয়, বেশির ভাগ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অথবা প্রশাসনে কর্মরত, আর ছিলেন তাঁদের স্ত্রীরা, ছিলেন ধর্মপ্রচারকারী যাজকের দল যাঁরা ছুটিতে দেশে যাচ্ছেন। এশিয়ানদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল স্নাতক ছাত্র যারা দুবছর সাগরপাড়ের পড়াশুনা শেষে দেশে ফিরছে, যে-দেশ তারা চলে যাওয়ার পর স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তান বা ভারত—নামে কী আসে যায়? স্পেনের সমুদ্রতীরের জমাট বাঁধা বরফের বিস্তার অতিক্রম করার সময়ে সেদিকে তাকিয়ে একজন তরুণ পাকিস্তানি সেনাক্যাডেট আমাকে বলল, 'একটি দেশ চিরকালের মতো ভাগ হয়ে যাবে এ যেন আমরা কল্পনাও করতে পারি না।' 'আমাদের মুসলমানদের হয়ত দশ বছর সময় লাগবে নিজেদেরকে বুঝতে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে। তারপর আমরা যুক্তভারতে ফিরে আসব, আরও সমৃদ্ধি নিয়ে যা আমরা ভারতকে দিতে পারব।' সে ছিল ডঃ জাকির হোসেনের একজন ছাত্র, আর ডঃ জাকির হোসেন হলের সেই মহিমান্বিত মুসলমান যিনি ভারতে থাকতেই পছন্দ করেছিলেন এবং পরে সেদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। ছেলেটি একেবারেই তরুণ আর এমনই আদর্শে পূর্ণ যে সে কল্পনাও করতে পারছে না বিচ্ছেদ কীভাবে চিরস্থায়ী হয়। যদি সেখানে এমন অন্য কেউ থেকেও থাকে যারা এই বিভাজনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছিল তারা একধরনের বৈরিতাহীন নীরবতার চুক্তি পালন করছিল ভ্রমণের সময়টুকুর জন্যে। আমাদের এসব কথা বলার সময়েও যে সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ ঘটে যাচ্ছিল তা যেন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ছাড়া আমাদের সবার মনেই অর্ধবাস্তবতা। আর তারা এ-ব্যাপারে কোন কথাই বলছিল না।

সমুদ্রভ্রমণের প্রথমাংশ স্বাভাবিক সামাজিক নিয়মেই চলল। সচরাচরের মতো ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা ছিল, ডেকের খেলাধুলা ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল, স্বাভাবিক প্রেমের টুকিটাকি ঘটনা, তীরে ঘুরে বেড়ানো সবই ছিল ; লোকেরা বন্ধুর মতো মিশত অথবা অন্যের উপর নিজেকে একেবারেই না চাপিয়ে নিজেদের মতো থাকত। পোর্ট সইদ থেকে দুটো সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। ইউরোপীয়রা হয় ডেক-চেয়ারে ছাতার নিচে বসে ঢুলত অথবা বারে জমা হত কিংবা কার্ড-টেবিলে যেখানে তারা সূর্যকে ভুলে থাকতে পারে। ভারতীয়রা, আমিও যাদের দত্তক সদস্য ছিলাম, একটি পাঠচক্র তৈরি করল ; ডি-ডেকে আমাদেরকে একটা ঘর ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল, যেখানে আমরা দুবার, দশটায় আর চারটায় সমবেত হতাম। কোন সদস্য তার নিজস্ব গবেষণার বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধ পড়ত এবং জাতিগঠনে এর সম্ভাব্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা করত। 'ফ্রাঙ্কোনিয়া' তাপানুকূল ছিল না। জুলাইয়ের এক বিকেলে লোহিত সাগরের বুকে জেগে থেকে আমি যখন ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ বা বৈদ্যুতিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উপর একটি বক্তৃতা শুনছিলাম, যার পাঁচটির মধ্যে একটি বর্ণইমাত্র বুঝতে পারছিলাম, আমি ভাবলাম 'যাহোক বাংলার গ্রীষ্মের জন্যে এটা ভালো অনুশীলন।' কিছু-কিছু আলোচনা আমার মানসিক স্তরের কাছাকাছি ছিল। আমার কাছে অন্তত একটি—জাপানি একটি প্রকল্প, কুটিরশিল্পের বৈদ্যুতিকীকরণ-সম্পর্কিত, বেশ বাস্তবসম্মত মনে হয়েছিল সেই জাহাজের উপরের পরিবেশে বসে যেখানে আমাদের কারওই যে-প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। সম্পদ ভাগ করে নেয়ার চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা নেবার উদ্বুদ্ধ আবেগে আমরা যেন বাতাসের ভেতরে কথা বলে যাচ্ছিলাম।

এডেন বন্দরে কয়েকজন পূর্ব আফ্রিকান এশীয় জাহাজে উঠল। তারা ছাত্র নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা সত্যিকারের কী ঘটছে সে-বিষয়ে অনেক বেশি জানত। আমি একজনকে ডেকের বেঞ্চে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখেছি যেন ওর হৃদয়টা ভেঙে যাচ্ছে। ওর কষ্টের কথা আমাকে বলার মতো ইংরেজি জ্ঞান ওর ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমি নম্র ও একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত কামাথকে ডাকলাম ওর সাথে কথা বলার জন্যে। লোকটি হায়দ্রাবাদ (সিন্ধ)-এর একজন হিন্দু, যে তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের রেখে মোম্বাসায় একটা ব্যবসা গড়ে তুলতে গিয়েছিল। এখন ওর স্ত্রী লিখেছে যে হিন্দু বাচ্চাদের স্কুলে যাবার পথে মুসলিমরা আক্রমণ করার জন্যে ওঁত পেতে থাকে, তাদেরকে বিষাক্ত মিষ্টি খেতে দেয়। ওদের নিজেদের বড় ছেলেই সে-মিষ্টি খেয়ে মারা গেছে। সে দেশে ফিরে যাচ্ছে পরিবারের বাকিদের সরিয়ে নিতে। ইংরেজিতে সে বলল, 'হিন্দুস্থান, পাকিস্তান এগুলো সবই বোকামি, অর্থহীন। আমাদের বাচ্চাদের কী হবে?' কামাথ হিন্দিতে তার সাথে সদয়ভাবে কথা বলল। আমাকে পরে ও জানাল যে ও তাকে বুঝিয়েছিল যে এমন করুণ বিপর্যয়ের সময় প্রতিশোধস্পৃহা কারওই মঙ্গল করে না। অশুভের উত্তর অশুভ দিয়ে না দেয়ার শিক্ষাই সবচাইতে ভালো শিক্ষা। হয়ত কামাথ লোকটির মনে আস্থা জন্মাতে পেরেছিল। যেভাবেই হোক ওর আন্তরিক সহানুভূতি লোকটির অশ্রু শুকিয়ে দিল। যাত্রার বাকি সময়টায় আমার মনে হয় আমরা সবাই সচেতন ছিলাম যে আমরা (ইতোমধ্যে আমি ভুলেই গেছি যে আমি একজন বিদেশি আগন্তুক) এমন একটি দেশে যাচ্ছি যে-দেশে আবেগের একটি উন্মত্ততা চলছে আর সে-ব্যাপারে প্রবাসীরা কিছুই জানে না। আমাদের সদিচ্ছাগুলোর যতটা সাদর সম্ভাষণ পাবার সম্ভাবনা আছে ততটাই আছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া পাবার। আর কামাথের মতো লোকেদের, যারা পুনর্মিলন-এর কথা ভাবছে, তাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে সেই অভিজ্ঞতার ক্ষমতাকে এবং হয়ত তার প্রতি নমিতও হতে হবে, যে-শক্তি এই দেশটিকে টুকরো টুকরো করেছে।

বোম্বেতে জাহাজ ডকে ঢুকল, পরিচিত ধূসর ও সাদা গাংচিলের বদলে বাদামি সামুদ্রিক বাজপাখিরা আমাদের ঘিরে চিৎকার করতে লাগল, আর আমরা এক-একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হয়ে ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। একমাত্র পাকিস্তানি একজন প্রকৌশলি যাকে দৈবাৎ এক বা দুই বছর পর দেখেছিলাম, আর আমার মতো অল্প ক'জন যারা ট্রেনে কলকাতায় যাচ্ছিল, তাদের ছাড়া আমাদের পাঠচক্রের আর কারও সাথে কখনও আর দেখা হয়নি।

বোম্বে থেকে কলকাতা ট্রেনে তিন দিনের পথ। আমরা ছ'জন ছ'জনের একটি বার্থ কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছিলাম যেটাকে তখনকার দিনে বলা হত দ্বিতীয় শ্রেণী (তার পর থেকে এটাকেই আবার প্রথম শ্রেণী বলা হচ্ছে কিন্তু সাথে বিলাসবহুল তাপানুকূল শ্রেণী যোগ করা হয়েছে যার ভাড়া প্রায় বিমানভাড়ার সমান)। অন্যদের সবারই এ-ধরনের যাত্রার উপযোগী উপকরণ ছিল, একটি পাতলা তোশক, একটি চাদর, একটি বালিশ আর সবকিছু হোল্ডঅলে বাঁধা। আমি তরুণ এক হোস্টেলবাসীর শিট ব্যাগে কিছু কাপড় তোয়ালেতে কুণ্ডলী পাকিয়ে বালিশের মতো করে শেষ মাথায় বালিশের জায়গাটায় রেখে ঘুমিয়েছিলাম আর দেখলাম সেটা যথেষ্ট গরম। বার্থগুলো বেশ ভালোভাবে গোছানো, ছাদে পাখা ছিল, আর স্নানাগারে একটি ঝরনাও ছিল, আর প্রত্যেকটা বড় স্টেশনে বেয়ারারা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে খাবারের অর্ডার নিচ্ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-খাবার আসছিল পরবর্তী বিরতিস্থানে জানালার ফাঁক গলিয়ে ট্রেতে করে। পর্যটকরা, যাঁরা বেশির ভাগ আকাশপথে ভ্রমণ করেন, তাঁরা যেমনটি ভাবেন ভারতের উঁচুশ্রেণীর ট্রেনযাত্রা তত কষ্টকর বা ভয়ের নয়। প্রচুর চোর আছে তবে কেবল বোকারাই তাদের মালপত্র খোলা রেখে বা দরজা-জানালা খুলে ঘুমাবেন ; কিন্তু আমি এত বছরে স্বাভাবিক কাজের সূত্রে একা একা প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছি, খুন অথবা ধর্ষিতা তো হইইনি, এমনকি ডাকাতিও হয়নি।

ঠিক এই নির্দিষ্ট যাত্রাটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলতে পারছি না কারণ আরও অনেক কিছুর সাথে এর স্মৃতি মিশে গেছে। মনে পড়ে বেশির ভাগ সময়টা আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাটিয়েছি এবং কোনদিনই ট্রেন থেকে ভারতবর্ষ দেখবার ছেলেমানুষি মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। গঙ্গার তীরবর্তী সমভূমি জ্বলন্ত সূর্যের আলোয় ট্যাপেস্ট্রির (দেয়ালসজ্জা) মতো ছড়িয়ে আছে অশেষ একঘেঁয়েমিতে আর অশেষ বৈচিত্র্যে ; দেয়ালে ঘেরা একটি গ্রাম, একজন কৃষক পরিশ্রমের সাথে জমিতে সেচ করছে, লেভেল ক্রসিংয়ে একসার গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকটি যেন পালাক্রমে এমন একটি পৃথিবীর কেন্দ্র যার আয়তনের বিপুলতা পরমুহূর্তেই তাকে ভুলে যায়। তারপর যখন তুমি বাংলার দিকে এগুবে নিসর্গ সবুজ হতে শুরু করবে, আরও ছায়াছায়া আম আর কলার বাগান দিয়ে ঘেরা, নারকেল ঝুলে আছে পুকুরপাড়ের গাছে যার সাদা চওড়া সিঁড়ি সেদিকেই নেমে গেছে আর শাড়ি পরা মহিলারা বুকসমান পানিতে দাঁড়িয়ে ডুব দিচ্ছে আবার ছলাৎ ছলাৎ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে শাড়ি আর নিজেদেরকে বাষ্পীয় রোদে শুকাতে। ধীরে ধীরে মাঠ প্রান্তর জায়গা করে দিল শহুরে হৈচৈয়ে ভরা নোংরা কুঁড়েঘরের জন্যে, মিলের চিমনি, ধুলোর রাস্তায় সাইকেল-আরোহী, সর্বত্র ছড়ানো ছাগলের পালের জন্যে, যতক্ষণ না তোমাকে কলকাতা আর হাওড়া স্টেশনের রাগবি হাফব্যাক বলের মতো উগরে ফেলল।

কলকাতা থেকে ঢাকায় যাবার সহজ পথ আকাশপথ, কিন্তু আমি কখনও সেকথা ভাবিনি। ১৯৪৭ সালে এমনও লোক ছিলেন যাঁদের কাছে ওড়াটা একটি ব্যাপার কিন্তু আমি তাঁদের দলে নই। টাকা ফুরিয়ে আসছিল, বেতন পাবার দিনের সম্ভাবনা অনিশ্চিত, আর, যা-ই হোক এই এলোমেলো এগিয়ে যাওয়ায় আমি মজাই পাচ্ছিলাম। পৃথিবীর বুকের ওপরে ঢাকায় স্টিমারে আরও একদিনের পথ, দুদিকেই শেষে ট্রেনে যেতে হবে। কেউই পৌঁছানোর সময় সঠিক বলতে পারছে না, তা ছাড়া স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে সবকিছুর মতোই টেলিগ্রাফ সার্ভিসও সম্ভাব্য সীমান্তে অনিশ্চিতভাবে কাজ করছিল। আমি ভাবলাম বরং আগে সেখানে পৌঁছাই তারপর বিশ্বাবিদ্যালয়ের অফিসকে জিজ্ঞেস করব কী করতে হবে।

ভটভট শব্দ করে বিস্তীর্ণ নদীর মাঝ দিয়ে স্টিমার চলতে শুরু করল। নদীর পানিতে কচুরিপানা এমন ঘন হয়ে আছে যেন তৃণভূমি। কিন্তু থোকা-থোকা হালকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগুনি ফুলগুলো সবই উপরে ভাসছে, আমাদের সামনেই সেগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অতিক্রম করার কোন চিহ্নও না রেখে আবার অলসভাবে মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। আমি স্টিমারের পেছন দিকে ঝুঁকে ছিলাম, ফুলগুলোর মতোই এলোমেলো ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরছিল, তখন একটি বাঙালি মেয়ে নীরবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখতে লাগল। দ্রুতই সে বলল, জীবনটাকে খুব আঁকড়ে ধরা উচিত না। আমি ওর কথার মানে বুঝে উদ্ধৃত করলাম :

'যে নিজের কাছে একটি আনন্দকে টেনে নামায়
ডানাঅলা জীবনকে সে নষ্ট করে
কিন্তু উড়ে যাওয়া আনন্দকে যে চুমু খায়
অনন্তের রৌদ্রালোকে সে বাস করে।'

'দয়া করে আরেকবার বলুন, আমি লিখে নিই।' ওর চাচা আমাদের সাথে যোগ দিলেন, আমরা এক পট চা ভাগ করে খেলাম। ওঁরা মেয়েটির বোনের বিয়েতে ঢাকায় যাচ্ছেন এবং যখন শুনলেন আমিও ঢাকায় যাচ্ছি আমাকেও সেই বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলেন। নতুন জীবনের জন্যে এটা একটি শুভ সূচনা। তাঁরা কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের লোক (আমি দেখেছি বাংলায় লোকেরা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলে পরিচয় শুরু করে)।

ব্রাহ্মসমাজ হচ্ছে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের একটি পরিমার্জিত একেশ্বরবাদী বিকল্প যা ঈশ্বরের একতায় বিশ্বাস করে আর মূর্তিপূজাকে প্রত্যাখ্যান করে। রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মবিশ্বাসে লালিত হয়েছিলেন এবং এই মেয়েটিও পড়াশুনা করেছে তাঁরই সৃষ্ট বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে যখন কবি বেঁচে ছিলেন ও সেখানে শিক্ষকতা করতেন। সেটাই হয়ত ওর উপরে তাঁর কবিতার স্পর্শ রেখে গেছে আর আমার মনে হলো ও যেন এমন একটি পৃথিবীর অংশ যেখানে এমন কোন আবেগ নেই যা কিনা নিয়ন্ত্রিত হয় না বাজনা, সঙ্গীত, নৃত্য বা কথার ভেতর তাদের যথার্থ প্রকাশে। সম্ভবত এই সাধারণ পৃথিবীর জীবনের জন্যে এটা একটি মারাত্মক বা ভয়ানক প্রস্তুতি। কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও দু'একজন শিষ্যকে দেখেছিলাম এবং তারা সবাই তাদের বিদ্যালয়-জীবনকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছে।

প্রায় দশ বছর পার হওয়ার আগে আমি শান্তিনিকেতনে যাইনি। কবির মৃত্যুর পর তাঁর বিদ্যালয়, সেখান থেকে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে চলে এল। তাঁর মূল স্বপ্নের খুব বেশি আর টিকে রইল না। আজকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে স্বপ্ন দেখার সুযোগ ক্রমশই সীমিত হয়ে আসছে। কিন্তু এখনও এটি একটি সুন্দর জায়গা, এখনও ভারত এর বাদ্য, নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতের ঐতিহ্যের জন্যে গর্বিত, আর এখনও পর্যটকরা এর অতিথিশালাকে স্নায়ুবিধ্বংসী আবর্জনাপূর্ণ কোলাহলময় কলকাতা থেকে পালিয়ে নিরিবিলি শান্তির আশ্রয় মনে করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেই আমরা ঢাকার বন্দর নারায়ণগঞ্জে পৌছলাম অমনি কোমরে বাদামি রঙের কাপড় গুঁজে পরা একদল ছেলে লাফিয়ে পানিতে নেমে সাঁতরে স্টিমারে উঠল। আমি এমন সাঁতার কখনও দেখিনি। কাপড় ব্যবসায়ীর কাঁচি যেমন কাপড়ের নিচ দিয়ে দ্রুতবেগে যায় তেমনি তারাও পানির ভেতর দিয়ে সাঁতরে নিমেষে পাটাতনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেজা চকচকে গায়ে পানি ঝরাতে ঝরাতে ঘিরে ধরল আমাদের বাক্সপেটরাগুলোকে। আমি তো ভয়ে এই ভেবেই আমার টাইপরাইটারটি আঁকড়ে ধরলাম যে আমাদেরও বুঝি এভাবেই তীরে উঠতে হবে। কিন্তু যথাসময়ে আমাদের নামার উপযোগী কাঠের সিঁড়ি ফেলা হল আর দেখতে আরও ধোপদুরস্ত একদল এল যাদের গায়ে ইউনিফর্মের মতো ছিল। তারা কোম্পানির কুলি। ঐ ছেলেগুলো ছিল বাইরের, নিজের মতো কাজ করার আশায় এসেছে। যেহেতু মালপত্রও প্রচুর ছিল, অসুবিধে হয়নি। আমি আমার নিজের জিনিসপত্রসুদ্ধই ঢাকার ট্রেনে উঠতে পেরেছিলাম, অন্য কারও জিনিস নিয়ে নয়।

আমার ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদের খুঁজে পাইনি আর। তাঁরা কিন্তু আমাকে খুব বুদ্ধিমানের মতোই ডাকবাংলোয় একটা ঘর খুঁজে নেয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। অন্তত যতক্ষণ না আমি আমার পরবর্তী করণীয়টি জানতে পারি। ব্রিটিশরাজের বেশ একটি প্রয়োজনীয় সৃষ্টি এই ডাকবাংলো। এগুলো হচ্ছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবসরকেন্দ্র, যেগুলো সরকারি কাজে প্রধানত অফিসারদের সুবিধের জন্য ব্যবহার হয়। সরকারি কর্মকর্তারাই এর প্রাথমিক দাবিদার। তবে তাঁদের যখন প্রয়োজন হয় না সে-সময়ে সাধারণ পর্যটক বা যাত্রীরাও এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আমি উপদেশটি ঠিকই শুনেছিলাম, কিন্তু সময়টা ছিল ভুল। বাংলোগুলো তখন নবাগত কর্মকর্তায় উপচে পড়ছে। তাঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জন্মের জন্যে প্রহর গুনছেন (এবং প্রকৃতপক্ষে চার বছর পর আমি যখন সে-দেশ ত্যাগ করি তখনও তাঁরা সেখানেই)। সুতরাং আমি উপাচার্যের বাসায় ফোন করলাম। তক্ষুনি আমাকে সেখানে যেতে বলা হল। রাস্তার পাশে অপেক্ষারত একটি সাইকেল-রিকশায় মালপত্র চাপিয়ে যাত্রার শেষ পর্যায় শুরু করলাম। পুরনো ঢাকা শহর তখন নতুন রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। প্রচুর চিৎকার করে করে ও বেল বাজিয়ে বাজিয়ে রিকশাওয়ালা পা চালাতে লাগল। সরু গলির ভেতর দিয়ে পথচারীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে সে চলতে লাগল। সারা পথ জুড়ে ছুটোছুটি, কেউ কাউকে খুঁজছে, কেউ কোথাও যাচ্ছে। কেউ দাঁড়াচ্ছে, কারও যেন নিজের ছাড়া অন্যের জন্য ব্যয় করার মতো মুহূর্তটিও নেই।

পথের দুপাশে বাড়ির শূন্য দেয়াল ভেসে উঠল, ছোট্ট ছোট্ট জানালা, তার ফাঁকে, ফাঁকে লুকিয়ে-থাকা জীবনের আভাস নিয়ে। এতক্ষণে আমিও নিজের ভাবনায় ডুবে গেছি অন্যদের মতো। দিনটি ছিল গরম আর ভেজা। অনেক দূরে যাত্রা শেষ করেছি, ক্ষুধার্ত, এলোমেলো, আমি তখন ঘামছি। উপাচার্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোসল সেরে একটু পরিপাটি হওয়া দরকার। কিন্তু আমরা তখন শহরের বাইরে। বড় বড় তোরণের ভেতর দিয়ে গাছপালায় ঘেরা বড় একটি গুরুগম্ভীর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এলাম। ভাবলেশহীন একটি ভৃত্যের দেখা পেলাম দরজায়, সে আমায় নিয়ে গেল ঠাণ্ডা, সতেজ করে তোলা একটি ঘরে। ঘরটির ঠিক সামনেই সরু গলিটিতে উপাচার্যের আট বছরের ছেলেটি ব্যক্তিগত বীরত্বপূর্ণ কোন অভিযানে ব্যস্ত। অদ্ভুত এই অনুপ্রবেশকারীটিকে সে আগে জরিপ করে নিল। তার কাঠের তলোয়ারটিকে নাটকীয় কায়দায় ঘোরাল, শেষে চমৎকার ইংরেজিতে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিল, "In my soul I am afraid of nothing." (আমার মনের ভেতরে কোন ভয়েই আমি ভীত নই)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিত্যদিনের জীবনযাপন

আমাকে নাগরিক আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করলেন ডঃ হাসান। বিশ বছর আগের স্মৃতিচারণ করলেন। আমি আন্দাজ করতে পারলাম যে আমার তাৎক্ষণিক অনেক সমস্যাই উনি আমি জানবার আগেই সমাধান করে ফেলেছেন। আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাংলো তৈরি হয়ে আছে আর রং-মিস্ত্রিরা সেখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ওঁরই অতিথি। বাংলোটা ছোট্ট কিন্তু তিনি যথার্থই ভেবেছেন যে আমার জন্য বিশাল বড় পেশাদারি প্রাসাদের চেয়ে এটাই ভালো হবে। কিছু আসবাবেরও দরকার হবে। তাই উনি আমার হয়ে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় কিছু কিনে রেখেছেন স্বদেশগামী এক ইংরেজের কাছ থেকে। বেতন থেকে আমি তাঁকে পরে শোধ করে দেব। তৈজসপত্র, ছুরি, চামচ, আমি আপাতত যতক্ষণ না বুঝতে পারছি কী কী লাগবে, বেগম হাসানের কাছ থেকে নিতে পারি। বেগম হাসান আমার জন্য, ইংরেজ-বাড়িতে কাজে অভিজ্ঞ একজন বেয়ারা-বাবুচি দেখে রেখেছেন। আর আমার কর্মক্ষেত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন ছুটি চলছে। আমার পূর্বসূরি ইতোমধ্যেই কলকাতায় রওনা হয়ে গেছেন। তবে ইংরেজি বিভাগের রিডার ডঃ গাঙ্গুলি এখনও এখানে আছেন। ছুটিতে যাবার আগে ক'দিন সকালে ইংরেজি বিভাগের অফিসে তাঁর সাথে আমার দেখা হবে, তিনি আমাকে কীভাবে সব চলছে বুঝিয়ে দেবেন। সুতরাং জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় মুহূর্তেই আমি যেন দেখলাম নিজেকে বেশ গুছিয়ে বসা। যদিও আমার যাত্রা তেমন কষ্টকর ছিল না, তবু অজানার উদ্দেশে এ যেন ছিল এক ক্রমাগত অভিযান। তাই যাত্রাশেষে পেলাম স্বস্তিপূর্ণ রোমাঞ্চ।

উপাচার্যের সেই সময়কার, অন্যান্য ব্যস্ততার কথা ভাবলে যে-পরিমাণ ব্যক্তিগত ও খাঁটি যত্ন ও পরিচর্যা এইসব ব্যবস্থাগুলোর ভেতরে ছিল তা সত্যিই বলার মতো। তিনি মানুষটাও ছিলেন এমন যিনি কোন সংকট বা বিপদ এলে উপভোগ করেন এবং সেগুলো ঠিক ঠিক সমাধান করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের শুরুতে ঢাকায় তাঁর মতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চাসনে আসীন একজন ব্যক্তির মনকে আচ্ছন্ন করে রাখার মতো যথেষ্ট সংকট তো চলছিলই। আর মাত্র দুসপ্তাহের মধ্যেই জন্ম নেবে পাকিস্তান, আর ভারতের মতো স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি তো তার ছিল না। মাত্রই সে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। মেজাজে ও পদমর্যাদায় ডঃ হাসানকে প্রাথমিক পরিচালনা-কৌশলের সবরকমের ঝামেলাই পোয়াতে হয়েছে। দেশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়টিও প্রচণ্ড সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ক'মাস আগে এখানে ভয়ংকর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে। হিন্দু ছাত্ররা এরপর আর তাদের ঘর থেকে বেরুবার সাহস পায়নি। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি হারিয়েছে ও হারাচ্ছে বেশ অনেক হিন্দু শিক্ষককে যাঁরা সীমান্তের ওপারে দেশত্যাগীদের দলে যোগ দিয়েছেন। হবু রাজ্য সরকার এর মধ্যেই বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দখল করে নিয়েছেন (আসলে লর্ড কার্জনের সময়েই এমন একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল যখন প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়)। এদিক-সেদিক বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো লেকচার-রুমে আর অস্থায়ী কুঁড়েতে নানা অসুবিধের মধ্যে গাদাগাদি করে কাজ চলছিল। এর কর্মধারায় পরিবর্তন আসছে ; এটা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এর নিজের ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ। এখন একে এতদিন পূর্ববঙ্গের যত কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এফিলিয়েটেড ছিল সেসব কলেজের পরিচালনা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হবে।

আমি খুব ভাসাভাসাভাবে সাধারণ অবস্থাটা জানতাম। পাকিস্তানের বিমূর্ত ধারণাটি বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত মানুষের একটি মূর্ত চিত্রে বা ক্যালাইডোস্কেপে পরিণত হতে সময় লাগছিল। ছোট বড় কেউই তখন সাধারণ ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছে না। ডঃ হাসান আমার কাজের ধারায় আমিই যাতে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি সে-সুযোগ দিলেন। আর বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকার সে দিনক'টি এই নতুন পৃথিবীর সাথে আমার পরিচয়টা সহজ করে দিল। কারণ তাঁরা কেবল আপ্যায়নকারী হিসেবেই চমৎকার ছিলেন না, পুরো পরিবারই উর্দুর মতো স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজিও বলেন। এমনকি ছোট্ট রেহানা, যে তখনও সবকথা বলতেও শেখেনি, সেও। তারা বাংলা বলতে বেশ অসুবিধে বোধ করতেন, যদিও এতদিন ধরে তাঁরা ঢাকায় আছেন যে বাংলা ভালোই বুঝতে পারার কথা। ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে আসা উর্দুভাষীদের সাথে বাঙালিদের কথা বলার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। উভয়ের কাছেই ইংরেজি ছিল সম্মানের ভাষা এবং শ্রদ্ধেয় একটি সংস্কৃতির প্রবেশপথ। কিন্তু তারা কেউই নিজের ভাষা নিয়ে এমনভাবে ভাবত না। পরে এর তাৎপর্য আমার কাছে স্পষ্ট হল। কিন্তু পাকিস্তানের সেই জন্মপূর্ব মুহূর্তেও আমি যদিও দুই সম্প্রদায়ের সাথে কেবলমাত্র ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম, এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, কেউ যেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু সহজবোধ্য বিপরীত দুই পৃথিবীর ভিতরে নড়াচড়া করছে। বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দুর মধ্যকার বৈপরীত্য ছাড়াও এটি ছিল অন্য একটি ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি নতুন দেশকে আবিষ্কার করা যুক্তিপরম্পরা বা কালপরম্পরায় কোন কর্মধারা নয়। সব দিক থেকে সব ধরনের ধারণা এলোমেলোভাবে বর্ষিত হচ্ছে। কিছু হারিয়ে যাচ্ছে, কিছু হয়ত পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে রং বদলাচ্ছে, অথবা এত বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে যে খেয়াল করছি না। ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটছে, আর প্রথমবারের চেয়ে তাকে অল্পবিস্তর বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে পরের বারে। ধীরে ধীরে একটি ছবি তৈরি হচ্ছে এর মাঝে, আরও নৈর্ব্যক্তিক ছবিটাকে খানিকটা নষ্ট করে, খানিকটা ব্যাখ্যা করে। আমি হয়ত যেমন এলোমেলোভাবে এসব ঘটছে তার খানিকটা মাত্র তুলে ধরতে পারি।

যেমন সেই ব্রাহ্মসমাজের বিয়েটার কথাই বলি। আমি এসে পৌছানোর দ্বিতীয় দিনে নিমন্ত্রণটি আনুষ্ঠানিকভাবে পেলাম। খানিকটা উৎসবের আমেজ নিয়ে আমি সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, কারণ এখানে আমার এটিই ছিল প্রথম নিজস্ব সামাজিক আমন্ত্রণ। ঘোড়াগাড়ি যখন আমাকে আধো আলো-আঁধারিতে অশেষ সেই পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, যাদের কাছে যাচ্ছি তাদের কি আমি ভালো করে চিনি? দেখা গেল ঠিকই তা-ই, তবে বিয়ের অনুষ্ঠানটি সত্যিই উপভোগ্য ছিল। বাঁশের তৈরি বিরাট লম্বা একটি ঘর অনেকটা ইংরেজি যাজকপল্লীর মতো, বিয়ের উপহার সামগ্রীতে দুধার জ্বলজ্বল করছে। সেই সন্ধ্যায় পুরষদের সাদা ধুতির মাঝে মাঝে এবং মহিলাদের উজ্জ্বল ঝলমলে শাড়ির আন্দোলন -এর মাঝেও আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সবাই যথেষ্ট বন্ধুসুলভ ও আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু আমি আর কোনদিনই সেই বর, বউ বা সেই মেয়েটি যে স্টিমারে এমন আনন্দময় সঙ্গী হয়েছিল তাদের দেখিনি। অল্প ক'দিন পর একদিন হঠাৎ স্টেট ব্যাংকের কাউন্টার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে হাত নাড়লেন একজন অতিথি আমাকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে এবং আমার পরিচয়কে নিশ্চিত করে। আমি বেতন থেকে খানিকটা অগ্রিম তুলে ব্যাংক বন্ধ হওয়ার অল্প আগে সেখানে পৌছেছিলাম একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে। কিন্তু নগদ টাকা হাতে নিয়ে গিয়ে দেখি, পাসপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র কিছুই আমার পরিচয়পত্র হিসেবে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানকার একজন পুরনো ক্লায়েন্টকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, আর আমি তো কাউকেই চিনি না। ছোট একটি ঘটনা। কিন্তু সেই তরুণটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিয়েটা তা হলে একটি শুভলক্ষণই ছিল বলতে হয়।

আমার মনে হয় সেদিনেই আমি বাড়ি পাল্টেছিলাম। বাংলোটায় রান্নাঘর ছাড়াও তিনটি ঘর ছিল, ভারতীয় ধরনে একটি স্নানঘর ও শৌচাগার। পানির ব্যবস্থা ছিল না। বালতিভরে প্রতিদিন পথের ধারের টিউবওয়েল থেকে আনতে হত। একজন সুইপার শৌচাগারটি পরিষ্কার করত। স্নানঘরটির মেঝে একদিকে সামান্য ঢালু হয়ে এক কোনায় একটি ছোট্ট ফুটোমতো ছিল। সেখান দিয়ে পানি গড়িয়ে একটি খোলা ড্রেনে গিয়ে পড়ত। স্নানঘরে ছিল বড় একটি পানি রাখার পিপে, আর ছোট একটি মাটির পাত্র। আমি গোসল করতে চাইলে বালতিভর্তি পানি গরম করে নিতে হত। মাটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রটায় ঠাণ্ডা ও গরম পানি মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ মাত্রায় এনে তার পরে আমার গায়ে ঢালতাম। পানি গড়িয়ে ছোট্ট ফুটোটা দিয়ে বেরিয়ে যেত। গরম আবহাওয়ায় এভাবে গোসল করা খুবই আরামের। এলোমেলো একটি বাগানও ছিল, যার বেড়ায় মাঝে মাঝেই ভাঙা ছিল আর ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রার সাহেবের গরুগুলো ও একটি ছাগল ঢুকে পড়ত। বাগানের কোনায় চাকরদের থাকবার একটি কুঁড়েঘরও ছিল। আবদুল—আমার বেয়ারা ও বাবুর্চি সেখানে কিছু কাপড়চোপড় রাখলেও, শহরেই থাকত আর আমাকে রাতের খাবার দিয়েই চলে যেত।

রাতে আমি যখন একেবারে একা থাকতাম তখন শব্দের ভেতর দিয়ে আমি যেন অনুভব করতে পারতাম এই দেশের অপরিচয়ের দূরত্বকে। আমি এমন একটি সময়ে এসেছি যখন এখানে ভরাবর্ষা, উত্তর-ইউরোপের সাথে যার মোটেই মিল নেই। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিজলি চমক দিচ্ছে, ক্রমাগত মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি শোনা যায়। তারপর হয়ত একটি বাতাস উঠবে, প্রথমে মনে হবে যেন দূরের গাছগুলোর দীর্ঘশ্বাস। ক্রমশ জোরালো হবে, তারপর অগ্রসরমাণ সেনাবাহিনীর মতো বাংলোটার ওপর হামলে পড়বে। তারপর ধীরে ধীরে অজানা গন্তব্যে সরে যাবে। ব্যাংগুলো ঠিক যেন জানালার পাশেই এমন আবহাওয়ায় খুশি হয়ে কানফাটানো কোরাস গাইতে থাকত, হঠাৎ করে থেমে যেত, আবার, সমস্বরে গলা মিলিয়ে একসুরে সুপরিকল্পিত আর্কেস্ট্রার তালে গাইতে শুরু করত। শব্দের মাঝে মাঝে বিরতি পড়ত ; একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দে বা গাছের ডালে কোন খুনোখুনির ঘটনায় অথবা কাদার ওপর দিয়ে ঝোপের মাঝে প্যাচ প্যাচ করে গরুর ছুটে যাওয়ার শব্দে ; অথবা কখনও শিকারি শেয়ালের গর্জনের ওঠা-নামা, কেঁপে কেঁপে ওঠা অবিরাম ভাঙাভাঙা চিৎকার—পৃথিবীর সবচাইতে ভয়াবহ সে-চিৎকার। এইসব ভৌতিক শব্দের ভেতর মাঝে মাঝে মানববুদ্ধির গোচর কিছু শব্দও শোনা যেত, যেমন কোন বাঁশির শব্দ অথবা সাহস ধরে রাখার জন্য বিলম্বিত কোন পথিকের গেয়ে-যাওয়া ধর্মীয় গানের কলি।

মশারির নিচে শুয়ে শুয়ে আমি শব্দের একই কোরাস শুনতাম, যতক্ষণ না শব্দগুলো মিলিয়ে যেত। আর আমি জেগে থাকতাম অন্য দেবতাদের পৃথিবীতে। ভারতে ভোরবেলা হচ্ছে সবচাইতে ভালো সময়। যদি বৃষ্টি না হত, আমি বেরিয়ে পড়তাম, সরু সরু পথ খুঁজে খুঁজে সেখানে, যেখানে নিচু জোলো জমিতে ধানের ক্ষেত, তার দুপাশে উঁচু-করা মাটির পথ কিন্তু বিস্তৃত উজ্জ্বল সবুজ সাগরের মতো ধানের রাশি, মাঝে মাঝে আমগাছ ও খেজুরগাছের ঘন ঝোপ সেই সবুজের ঢালকে বেঁকেচুরে দিয়েছে। এখানে সেখানে ছোট্ট ডোবার পাশে বক একপায়ে দাঁড়িয়ে অথবা একঝাঁক টিয়ে যেন ধানের সেই সবুজেই গা চুবিয়ে উঠেছে, রোদে ডানা কাঁপাচ্ছে। বাতাস ভেলভেটের মতো নরম, সবকিছুই আলোয় ঝলমল করছে। আমি বাড়ি ফিরে দেখি আবদুল ডিম রান্না করছে, আর অফিসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দিনটা ভ্যাপসা গরম হয়ে ওঠে। সূর্য ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত হাঁটা আর আনন্দদায়ক থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই ও কাগজপত্র যাতে ঘামের ফোঁটায় ভিজে না যায় তাই সারাক্ষণ বিজলিপাখার নিচে বসে থাকতে হয়।

সেই নিসর্গের ভেতরে কতক মানবাকৃতিও ছিল এবং তাদের ক'জন ধীরে ধীরে ব্যক্তিরূপ নিল। যেহেতু তখন ছুটি চলছিল, তাই প্রথমে আমার বেশির ভাগ সময় ভরিয়ে তুলল ছাত্র বা সহকর্মীরা নয়, বরং উৎসুক প্রতিবেশী, হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া লোকজন বা প্রতিদিনকার কাজে যাদের দেখা পেতাম তারা। এই আলাপ করার ব্যাপারে কিছু বলার আছে। এবং পড়াশুনার সময় শুরু হতে হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের বাইরে এদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে—সে, যতই সাময়িক ও খামখেয়ালিপূর্ণ হোক—আমার একটি ধারণা হয়ে যাচ্ছিল।

এদের মধ্যে প্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে আবদুল হক, আমার বেয়ারা ও বাবুর্চি। সে সত্যিই একটি অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিল। স্বভাবে গুরুগম্ভীর তার পেশায় সেই ছিল শ্রেষ্ঠ, যে কিনা বাছা-বাছা ইউরোপিয়ানদের বাড়িতে কাজ করত। সে আমাকে বলেছে যে, একসময়ে কলকাতার ইম্পেরিয়াল কেমিক্যালসের ম্যানেজারের বাড়িতে সতেরোজন অধস্তন কর্মচারীর সে ছিল প্রধান পরিচারক। আবার হাইকোর্টের এক কুমার জজের বাড়িতে সে একাই ছিল বাবুর্চি, বেয়ারা, গৃহপরিচারক— সব। আমার সন্দেহ হয় সে কখনও স্বেচ্ছায় কোন ভারতীয় মহারাজার বাড়িতে চাকরি করার মতো নিচে নামতে রাজি হত কি না। আবদুল হকের নিজের পদমর্যাদার গৌরববোধ সেই অভিজাত ভদ্রলোক যিনি বিপ্লবের ফলে শ্রেণীচ্যুতিকে প্রচণ্ড গর্বে অবজ্ঞা করেন তাঁর চেয়ে কিছু কম ছিল না। ওর মতো যারা, তারা 'স্বরাজে'র সবচাইতে বড় দুর্ভোগটা ভুগেছে। কারণ ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালে তাদের নিয়োগকর্তারা দেশে ফিরে যেতে শুরু করেছে। পৃথিবীতে ওদের স্থান মুছে যেতে শুরু করেছে।

তার সীমিত ইংরেজিজ্ঞানে সে আমার চেয়ে বেশি ভালো জেনে ফেলেছে একজন মেমসাহেবের কখন কী কী দরকার আর পা ফেলার আগেই আমি দেখি জিনিসটি তৈরি। তার কাজে তাকে একা ছেড়ে দিলে সে ভীষণই বিশ্বাসী এবং আমাকে এই কারণেই এত পছন্দ করত (আমার কোন কাজ করার ইচ্ছে বা যোগ্যতা কোনটাই ছিল না)। পরে আমি আমার এক জার্মান অধ্যাপক-প্রতিবেশীর স্ত্রী, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সুগৃহিণী, তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে যেসব মেমসাহেব রান্নাঘরের কাজে নাক গলাতেন তাঁদের ব্যাপারে ওর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। তার পরও আমি ঠিক ওর মানে উঠতে পারিনি অনেক ব্যাপারেই।

আমার ছাত্ররা ফিরে এলে ওর সাথে আমার গুরুতর ভুল-বোঝাবুঝি শুরু হলো। একদিন ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল, অপমানিতের বেদনায় ওর বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আমার সামনে ওর যত প্রশংসাপত্র ছিল সব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখল। আমি হতবাক। কী অপরাধ করেছি আমি তো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ওর ইংরেজিজ্ঞান এমন ছিল না যে, বুঝিয়ে বলতে পারে। ব্যাপারটা ঠিক কূটনৈতিক মতবিনিময়ের মতো। ও বেরিয়ে গেল। রাস্তার পাশে কলম-কালি-কাগজ নিয়ে বসে যে পেশাদারি দলিল-লেখকরা, তাদের কাছে গেল। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা একটি কাগজ নিয়ে ফিরে এল।

সেখানে জানানো হয়েছে যে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন দোষই সে খুঁজে পায়নি। আমি অত্যন্ত ভালো মনিব, ও এ-পর্যন্ত সে আমার কাছ থেকে একটি কটুবাক্যও শোনেনি। কিন্তু আমার বাড়িতে খুব বেশি ভারতীয় অতিথি আসে। সে ভারতীয়দের সেবা করতে অভ্যস্ত নয়, ওদের এঁটো বাসন ধুতে ও আদেশ পালন করতে তার ভীষণ আপত্তি আছে। এমন চলতে থাকলে, সে মনে করছে হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার চাকরি ওকে ছাড়তে হবে।

আমি দেখলাম ওরও নিজস্ব একটা যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা থাকতেই পারে। আমরা ছাত্ররা ও সহকর্মীরা সারাক্ষণ আসছে, চায়ের কাপে বা লেমন স্কোয়াশের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সারা পৃথিবী নিয়ে আলোচনা চলছে। মধ্যরাত পর্যন্ত হুইস্কি-খাওয়া ইংরেজ ভদ্রলোকদের আতিথেয়তা করতে হয়ত ওর বাধত না, কিন্তু ওই ব্যাপারটা ওর মর্যাদায় আঘাত হেনেছে। আমি একই রকম গাম্ভীর্য ও সৌজন্য বজায় রেখে একটি উত্তর লিখলাম যে, আমি ওর চেয়ে ভালো বেয়ারা কখনোই পাব না। কিন্তু যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি এবং আমার ছাত্র ও সহকর্মীরা ভারতীয় (সে এখনও পাকিস্তানিদেরকেও ভারতীয় বলে), সুতরাং আমার বাসায় তারা আসবে এটাই স্বাভাবিক। যদি এই কারণে সে আমাকে ছেড়ে যায় তবে তা হবে খুবই দুঃখজনক ; তবে আমি অবশ্যই ওর সম্পর্কে আমার উঁচু ধারণা প্রকাশ করে প্রশংসাপত্র লিখে দেব। আর যদি সে মনে করে যে, থাকা সম্ভব, তবে আমি আশ্বস্ত করছি যে, আমার ভারতীয় অতিথিরা তাকে সরাসরি কোনো আদেশ দেবে না। যদি নিতান্ত দিতেই হয় আমার মাধ্যমে দেবে। (এটা অনেক সাধু প্রস্তাব ছিল, কারণ যেসব ইংরেজ পরিবার বা লোকজনের বাড়িতে আবদুল কাজ করেছে তাদের আতিথিরা কখনও গৃহকর্তার কাজের লোককে আদেশ করে না, যেভাবে ভারতে এটা চালু আছে। সুতরাং ওর এই ক্ষোভ খুবই যুক্তিযুক্ত।)

চিঠিটা নিয়ে ও চলে গেল আর বেশ প্রসন্নমুখে ফিরে এল। যেমন আশা করেছিলাম ও ঠিক আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়নি, কিন্তু ওর নীতিগুলোর প্রতি ও নিষ্ঠাবান ছিল। আমিও সম্মানজনক মধ্যস্থতার পথ খুঁজে পেলাম। এরপর ছাত্ররা এসে চা খেয়ে চলে গেলে আমি সেই চুক্তি মনে রেখে নিজেই চায়ের কাপগুলো ধুয়ে নিলাম। সেটা আবার তার অহং-এ খুব বেশি বাধল। সে আমাকে প্রায় জোর করেই রান্নাঘর থেকে বের করে দিল। সেদিন থেকে বদলে-যাওয়া পৃথিবীটাকে ও মেনে নিল, হিন্দু মুসলিম সব ছাত্রকেই খুশিমনে গ্রহণ করল এবং প্রয়োজনে ওদেরকে দোভাষীর কাজে ব্যবহার করতে লাগল। কেবলমাত্র একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংকটের কারণে যখন একদল অতিথি এসে উঠলেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেমন স্কোয়াশের গ্লাসে ঝড় তুললেন, সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে আপত্তির সুরে বলল, 'ডাকবাংলা, ভালো নয়'। রান্নায় সে অতুলনীয়। যখন খুব আনুষ্ঠানিক কোন নেমন্তন্নের ব্যাপার হত আমি শুধু বলতাম, আবদুল, আগামীকাল রাতে পাঁচজন অতিথি খাবেন, দাস সাহেব, অমুক অমুক। ব্যস, সেটা নিয়ে আর না ভাবলেও চলত। চমৎকারভাবে পরিকল্পনা করে রাতের টেবিলে খাবার সাজানো থাকত। সকালে প্রতিটি পদ ধরে দামের হিসেব আমাকে দিয়ে দিত। নীতিগতভাবে আমি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটি অপছন্দ করতাম। কিন্তু আবদুল তার নিজের দিক থেকে যথোচিত মর্যাদার সাথে সম্পর্কটি গ্রহণ করেছিল।

আমার দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল কালিপদ, ইংরেজি বিভাগের চাপরাশি। ঢাকায় অধ্যাপকদের কোন টাইপিস্ট বা কেরানি ছিল না। আমরা নিজেরাই আমাদের চিঠিপত্র লিখতাম, আর যাবতীয় প্রশাসনিক ও করণিক কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করত রেজিস্ট্রার অফিস। কিন্তু প্রতিটি বিভাগে একজন চাপরাশি থাকত, যে বার্তাবাহকের কাজ করত ও টুকিটাকি ফুটফরমাশ খাটত। নোট, রেজিস্ট্রি করার জন্য সিল-করা পার্সেল এসব সে বহন করত, চা নিয়ে আসত, অফিস খুলত ও বন্ধ করত এবং যখন কেউ থাকত না, তখন সাধারণত বেঞ্চির ওপর ছড়িয়ে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে অফিস পাহারা দিত। ওর আরেকটি কাজ ছিল অধ্যাপকদের (কিন্তু প্রভাষকদের নয়) পেছন পেছন রেজিস্ট্রার খাতাটি বহন করে ক্লাসে নিয়ে যাওয়া। কালিপদের সবচেয়ে ছোট্ট ছেলেটি ভারি দুষ্টু, মাত্র হাঁটতে শিখেছে, ন্যাংটো হয়ে প্রায়ই ওর বাবার সাথে আসত। যখন কালিপদ কোন কাজে বাইরে থাকত, তখন সে খুব উৎফুল্ল মনে তার বাবার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দিত। আমার পাশেপাশে মাঠের মাঝখান দিয়ে রেজিস্ট্রারটি রোদে হেলমেটের মতো মাথায় দিয়ে সে হাঁটত গটগট করে।

কালিপদ একজন ক্ষীণস্বাস্থ্যের হিন্দু, যার দৃষ্টিতে অতিপ্রজ পিতার উদ্বেগ। একদিকে মুসলিম সরকার-অধিকৃত মাতৃভূমি, অন্যদিকে ইংরেজ,তদুপরি মহিলা-প্রধান শাসিত বিভাগ, সবদিক থেকে ও যেন ফাঁদে আটকে-পড়া, সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত, মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব—দেশ ছেড়ে ওপারে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবে কি করবে না। আমার সৌভাগ্য যে, সে আমাকে ও সরকারকে বেনিফিট অফ ডাউট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ, ডঃ গাঙ্গুলি সময়সূচি, টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা, কাজের ভাগ সবকিছু বুঝিয়ে দেবার পর,ও আমি যতটা পারি বুঝে নেবার পর হঠাৎ (এটা অনেকটা যেন কখনও তাস না দেখেই ব্রিজ খেলা শিখতে চাওয়ার মতো) নিরুদ্দেশ হলেন আর ফিরে এলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের হারানোর ভয়, তাই যদি তাঁর দেশত্যাগে কোন বাধা সৃষ্টি হয় সেই ভয়ে তিনি খুব চুপচাপ সীমান্তের ওপারে একটি কাজ ঠিক করে রেখেছিলেন। কালিপদ থেকে গেল। প্রথম একমাস কি তার বেশি বাস্তবিক পক্ষে ও-ই বিভাগটি চালাচ্ছিল। ও ইংরেজি বলতে পারত না, কিন্তু আমার ইংরেজি খুব চট করে বুঝত এবং আমি যত তাড়াতাড়ি বাংলা বুঝতে শিখেছিলাম তার চাইতে দ্রুত সে প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ ও শব্দাবলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝে নিতে শিখে গেল। কোথায় কী রাখা আছে, কোন্ ফাইলের ভেতরে কী আছে সব ওর জানা ছিল। কোন্ স্টেশনারি জিনিস দরকার, কীভাবে তা কেনার ব্যবস্থা করতে হবে, কোন্ চিঠির এক্ষুনি উত্তর দিতে হবে, কোন্টার উত্তর পরে দেয়াই ভালো, সব ও জানত। আনুষ্ঠানিকভাবে ও ছিল নিরক্ষর কিন্তু আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে সে আমাকে নামের বানানগুলো ঠিক করে দিত। একবার আমি খামের মুখ সিল না করে একটি চিঠি দিয়ে ওকে পাঠিয়েছিলাম উপাচার্যের কাছে ; অর্ধেক মাঠ পার হয়ে ও ফিরে এল, দেখাল, আমি চিঠিতে সই করিনি। হয়ত নিজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনের উপলব্ধিই ওকে ওর নড়ে-ওঠা নৈতিক শক্তির ভিত আবার স্থিত করে দিল, কারণ চলে যাবার বদলে ও আমার কাছে নতুন একটি ইউনিফর্ম কোট চাইল এবং অত্যন্ত আবেগময় একটি মুহূর্তে সে জানাল যে, আমাকে সে তার পিতামহীর মতো মনে করে।

তার এই অপরিহার্য সেবার বিনিময়ে যে-বেতন সে পেত ন্যূনতম জীবনধারণের প্রয়োজনের অনেক কম ছিল সেই অর্থ। তাই একটি গরু পালত সে, আর তার দুধ বিক্রি করত।

বিভাগটি যতনা ছিল একটি জীবনযাপন প্রণালী তার চেয়ে বেশি একটি পেশা। যে-কোন প্রভাষকের চাইতে বেশি সময় ধরে ও কাজ করছে। আমার বিশ্বাস, আমি ওর তৃতীয় অধ্যাপক। এই বিভাগের উদ্ভাসিত পাণ্ডিত্যে সে অবগাহন করত এবং যখনই কোন সাফল্য আসত সবচাইতে প্রথম গর্বিত হত কালিপদ।

AMARBOI.COM

আমি এসে পৌঁছেছিলাম ১লা আগস্টে, রোজাশেষের দশদিন আগে। পাকা মুসলিমরা এই উপবাসকে খুব গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মাঝামাঝি সময়ে কোন খাবার বা পানীয় স্পর্শ করে না, যদিও সূর্যাস্তের পর ও ভোরের আগে দুবার দুটো শাঁসালো খাবার খায়। এক চান্দ্রমাসব্যাপী এই উপবাসকাল, বছর ঘুরে পেছনে যেতে থাকে সৌর-ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করে এবং এর শেষ হয় ঈদ উৎসব দিয়ে, ইসলামি বছরের সবচাইতে আনন্দের দিন। সেদিন সব বাড়িতে বিশেষ খাবারের আয়োজন করে উপোস ভাঙা হয় অনেকটা ক্রিসমাসের টার্কি বা প্লাম পুডিঙের মতো খাবার দিয়ে। সেদিন সবাই নতুন বা সাদা বা পরিষ্কার কাপড় পরে বাইরে আসে, ঝলমল করতে থাকে—পিলগ্রিমস প্রগ্রেস এর উজ্জ্বল একজনের মতো; ঈদ মুবারক বলে একজন আরেকজনকে সম্ভাষণ জানায়। তবে নতুন চাঁদ দেখার খবর কেউ না দেয়া পর্যন্ত কিন্তু উৎসব শুরু হয় না। যদি মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা থাকে, তবে উপবাসের সময় বেড়ে ত্রিশ দিন হয়। যদি তার পরও চাঁদ দেখা না যায় তবে ধরে নেয়া হয় সে তার নির্দিষ্ট স্থানেই আছে।

এ-বছর রাতগুলো ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তিনজন তরুণ, এঁদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, অতীতের সমস্ত নজির ভেঙে প্লেনে করে আকাশে উড়ে মেঘের ওপারে চাঁদের অবস্থান জানালেন ; যদিও তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপত্তি জানালেন এই বলে যে, নবী নিজে কখনোই এমন কিছু করতেন না, তবু ঈদ শুরু হলো। আবদুল সকালে নাশতার পর ছুটি নিয়ে গেল, অন্তত আমার তো তা-ই মনে হলো। আমি যেহেতু রান্না-করা খাবারের চেয়ে আমার সুবিধামতো স্যান্ডউইচ ও কফি দিয়ে দুপুরের খাবার সারতে পছন্দ করতাম, তাই আমার এতে কোন অসুবিধাই হলো না। এবং আমি একটি বই নিয়ে নিরিবিলি সকালটিতে স্থির হয়ে বসলাম। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ও ফিরে এল, ছোট কন্যাটিকে সাথে নিয়ে, নিজের বাড়িতে তৈরি অপূর্ব একটি খাবারসহ। জাফরানি রং চালের সাথে মাংস ও অপূর্ব মশলা দিয়ে রাঁধা একটি পদ, মিষ্টি, ফল। ওরা দুজনে উদ্ভাসিত হাসি দিয়ে পরিবেশন করছিল, আমি বসে বসে খাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে বাদ দিয়ে ঈদের আনন্দের কথা ভাবতেও পারেনি। সব শোভনতা রক্ষা করে ওদের পরিবারেও আমাকে ডাকতে পারছে না, সুতরাং এর চাইতে ভালো আর কোনভাবে কাজটি করা যেত না।

সে বছর ঈদের পরপরই এল আরেকটি সরকারি ছুটির দিন ১৪ই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবস। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সকালের সামরিক কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে আমার জন্যে একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। আবদুল দিনটির আনুষ্ঠানিকতার কথা মনে রেখে বাংলোর গেটে একটি ছোট জাতীয় পতাকা টানিয়ে দিয়েছে, ছুটি নিয়ে যাবার আগে। আমি অনুষ্ঠানশেষে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালাম লোকজন দেখার জন্যে।

সবাই যেন ছুটি কাটাতেই বেশি আগ্রহী। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ-উল্লাসের কোন স্মৃতি স্পষ্ট মনে পড়ছে না। বরং মনে হলো একটি চাপা ক্ষোভ বুঝি ঘিরে আছে দিনটিকে। এ কি আমারই ভাবনার ছায়া? পাকিস্তানের জন্ম নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্যে, এতদিন যারা সবসময়ে জনজীবনে পেছনের সারিতে বসেছে তাদেরকে এই ইসলামিক রাষ্ট্রটি একটুখানি শ্বাস ফেলার জায়গা করে দিয়েছে। কিন্তু বাংলার কী হলো? পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলাতেই লোকেরা একই খাবার খায়, এক ভাষায় কথা বলে, একই ঐতিহ্য ও শিল্প সাহিত্যের অংশীদার। কিছু মুসলিম পরিবার ভারতবর্ষকেই বাসভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছে আবার কিছু হিন্দু পরিবার সীমান্তের এপারে পিতৃপুরুষের ভিটাতে রয়ে গেছে। সবাইকে না হলেও অনেককেই এই সীমারেখা তাদের ভাই ও জ্ঞাতিদের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এখনও বাংলার স্নায়ুকেন্দ্র বলতে কলকাতাকে বোঝায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলকাতার রাতের জীবনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলত আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পী, কবিরা এর চৌম্বকশক্তির জোরে ছুটে যেত যেমন যেত ইংল্যান্ডের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সবাই লন্ডনের দিকে। কেউ জানত না, দেশ-বিভাগ কেমন ব্যাপার হবে। এটা যেন অনেকটা শরীরের কর্তিত একটি অংশকে তার স্বাধীনতা উপভোগ করতে বলার মতো।

এমন নয় যে বাংলার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা খুব অবাস্তব কোন ব্যাপার। এর শিকড় প্রোথিত ছিল ইতিহাসে আর আর্থসামাজিক বিভেদ সেগুলোকেই আরও দৃঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। ঐ কারণে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। হয়ত আরও হবে। এমনও নয় যে তাদের পাঞ্জাবের সহধর্মীদের চাইতে বাঙালিরা কম ধার্মিক। তবু উত্তরের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণে ভেসে-আসা পাঞ্জাবি জনস্রোতের সাথে একাত্মবোধ করার চাইতে বাঙালি মুসলিমরা যেন অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বাঙালি হিন্দুদের সাথে। এ-বিষয়ে তারা সচেতনও ছিল। বাংলা বাংলাই। গ্রামের জীবনে এর সভ্যতার শেকড় প্রোথিত এবং ধর্ম সেই সভ্যতার একটি অংশ হলেও সবটুকু তো নয়ই এমনকি গভীরতম অংশও নয়।

এখন বলা সম্ভব নয় তখন আমি এসব সংশয় কতটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম, অথবা সত্যিই তেমন কোন ব্যাপার ছিল কি না অথবা আমি কি পরবর্তী ধারণার রঙিন আয়নায় কিছু ফিরে দেখছি। তবে এটা সত্যি পাকিস্তান সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা এসেছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর। যার ফলে ঘটনা ঘটার আগে থেকেই এটি একটি মানসিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল। এই সংগ্রামে মুসলিম ও হিন্দু উভয়ে অংশ নিয়েছিল। তারা মার খেয়েছে, জেলে গিয়েছে এই উপমহাদেশকে বৃটিশরাজের শাসনমুক্ত করতে। ভারতের কাছ থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছিল একটি উপজাত ব্যাপার। এবং এর জন্য যতটা আপোস আলোচনা চালাতে হয়েছে ততটা লড়তে হয়নি। তাই ব্যাপারটা পাকিস্তানিদেরকেও বিস্মিত করে তুলেছিল। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যাদের আনুগত্য সেইসব উঁচু ও দায়িত্বশীল পদে সমাসীন কর্তাব্যক্তিরা স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যেই নিজেদের ভেতরে এমন সব কথা বলাবলি করতে লাগল। "একান্তই আমাদের নিজেদের ভেতরে বলছি। পাকিস্তান পুরোপুরি হিন্দুদের ভুলের ফসল। ভীত ও আতঙ্কিত না হয়ে, আমাদেরকে এ-ব্যাপারে সিরিয়াস হতে বাধ্য না করে ওদের উচিত ছিল এই দাবিকে একটি বিপজ্জনক নীতির চাতুর্যের ফল হিসেবে দেখা।" দুই সরকারের রশি-টানাটানির সময়ে খুব বিরক্ত হয়ে কোন এক মুহূর্তে ডঃ হাসান এমন একটি কথা আমাকে বলেছিলেন। খুব জোরালোভাবে যদিও মনে করতে পারছি না যে এটাই কী সত্য ছিল কি না। কিন্তু সাধারণভাবে যদি লক্ষ্য করি তা হলে মনে হবে অন্তত মুহূর্তের জন্যে একথা এমন একজন লোক ভাবতে পেরেছিলেন যিনি এই দাবি সমর্থন করেছিলেন এবং এর পরিণতিতে তাঁর দায়ভাগ বহন করেছিলেন। কায়েদে আজম জিন্নার আরেকজন একনিষ্ঠ সমর্থক তাঁর মৃত্যুদিনে বলেছিলেন,"'তিনি একাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা বাকিরা তাঁর পাশে ছিলাম কারণ আমরা তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তের আগে কখনোই বিশ্বাস করিনি যে এমনটি সত্যিই ঘটবে।" কিন্তু ঘটে যাওয়ার পর এখন পাকিস্তান একটি অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা, আর এটা বাঞ্ছনীয় ছিল কি-না, কেন ও কার কাছে এ সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক।

রোজা শেষ হবার দশ সপ্তাহ পরে আসে ২য় ঈদ উৎসব। এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয় সেই ঘটনার স্মরণে যখন ইব্রাহিম আল্লাহর নির্দেশে ইসমাইলকে বলি দেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে তৈরি হয়েছিলেন (ইসহাক নয়, ইসলামি মতে আরবদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ইব্রাহিম, ইহুদিদের সাথে এখানে তাদের মতপার্থক্য আছে). আর ঝোপের মধ্যে বেঁধে-রাখা ভেড়াকে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে বলি দেয়ার জন্য। প্রতিটি বাড়িতে হয় একটি গরু, আর গরু যদি পারিবারিক বাজেটের বাইরে হয় তা হলে ভেড়া অথবা ছাগল কোরবানি দেয়া হয়। যেহেতু এটা ছিল চমৎকার একটি ছুটির দিন, আমি বাগানে বসে পড়ছিলাম। একজন তরুণ এসে নিজেকে মুনীর চৌধুরী বলে পরিচয় দিল। সে এম এ পরীক্ষা দিয়েছে এবং মৌখিক পরীক্ষা ও ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। ও বলল যে ও গরু কোরবানি সহ্য করতে পারে না। তাই এই ভেবে এখানে এসেছে যেন আমার সাথে পরিচিত হয়ে সময়টা সে কাটাতে পারে। সে একজন বামপন্থী, আর কিছুদিন আগে মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল থেকে কমিউনিস্ট ও নাস্তিক বলে মার খাওয়ার ও বিতাড়িত হওয়ার সম্মান লাভ করেছে। ও আমাকে জানাল, সত্যি বলতে ব্যাপারটা সে উপভোগই করেছে, মার খাওয়ার অংশটুকু বাদে। মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর ব্যাপারটা নিয়ে একটি নাটক লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করল। ইতোমধ্যেই সে বাংলায় দুএকটি সফল হাসির নাটক লিখেছে। ও আশা করে আরও লিখবে। আমি ওকে ওর লেখার কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম আর মুহূর্তে আমরা খুব প্রাণবন্ত এক আলোচনায় মেতে উঠলাম। আমি দাঁড়ালাম এক্সপ্রেশনিজমের পক্ষে, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করে বাস্তবধর্মী, সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা নাটক প্রথার ভেতরে বন্দি ব্যক্তির হতাশা ও অসহায়তার বাইরে কিছু প্রকাশ করতে পারে। বিপ্লবী কোন অন্তর্দৃষ্টিকে, যা এখনও ঘটেনি এমন কোনকিছুর দর্শনকে প্রকাশ করতে অবশ্যই প্রয়োজন হবে প্রতীকের, এমন একটি মঞ্চবিন্যাসের, যেখানে অদৃশ্যও হয়ে উঠবে গতিশীল এবং স্থির নিশ্চল পরিবেশের চাইতে আরও শক্তিশালীভাবে তা প্রকাশ করবে। সে বেশ জোরের সাথে এই মত অস্বীকার করল। সে বুঝে উঠতে পারছে না এবং ভাবছে হয়ত ইউরোপে তা সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু এখানে এখন সামাজিক বাস্তবতাই সবচাইতে বেশি প্রয়োজন যাতে লোকেরা নিজেদের চেহারা নিজেরাই দেখতে পায়। প্রতীকধর্মী কবিতা তো কেবল ক্রিয়াশীল জগৎ থেকে একটি নাটকীয় বিষয়কে সরিয়ে দিয়েছে। একজন প্রকৃত শিল্পী যেমন তার শিল্পের মাঝে নিজেকে ভুলে যায়, সে-ও তেমনি তর্কে এমন মেতে উঠল যে, ওর সেই দুর্ঘটনার বর্ণনাটা শেষ করতে ভুলে গেল আর আমার মনে হলো এমন আরও ছাত্র যদি পাই সময়টা দারুণ কাটবে (অবশ্যই এমন আর ছিল না ; আরও অনেক রকম ছাত্র ছিল যদিও। তবে মুনীর নিজেই একটি ধরন ছিল)। আমরা আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলাম যতক্ষণ না কোন ব্যাঘাত ঘটে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মুনীর বলল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়েছে। আবার আসবে বলে চলে গেল।

সন্ধ্যায় আবদুল বাড়ি চলে যাবার পর একদিন দরজায় টোকা পড়ল। আমি দরজা খুলতে বারো বছরের তুলনায় ছোটখাটো একটি ছেলে আলোকিত ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে ঢুকে পড়ল। পরনে ছিল মলিন একটি লুঙ্গি—কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা ডোরাকাটা সুতির স্কার্টের মতো কাপড় যা দরিদ্র মুসলিম পুরুষেরা পোশাক হিসেবে পরে। আর হাতে ছোট একটি টিনের তোরঙ্গ। নিজেকে বেশ সোজাসুজি দাঁড় করিয়ে সে ঘোষণা করল, 'I Business man'। অদ্ভুত দেখতে এই ঘরটিকে ভালো করে জরিপ করার সময় ওর নজরে পড়ল জোমোকেনিয়াত্তার আফ্রিকান ছাগলের চামড়া গায়ে জড়ানো রাজকীয় পোট্রেটটার দিকে, আর সে বিমূঢ় হয়ে উচ্চারণ করল, 'Oh my God!' এইসাথেই ওর ইংরেজির ভাণ্ডারও ফুরিয়ে গেল। সুতরাং সে মেঝেতে উপুড় হয়ে তোরঙ্গ খুলে বসল তার পণ্যসামগ্রী প্রদর্শনের জন্য। সেলাই সুতোর রিল, চিরুনি, লম্বা ফিতা ইত্যাদি। ওর অদম্য স্পৃহা দেখে আমি ছোটখাটো কিছু জিনিস কিনলাম। আবার ও ঘুরতে বেরিয়ে গেল।

দুই কি এক সপ্তাহ পরে ও আবার এল। কিন্তু এবারে আবদুলের সাথে দেখা হয়ে গেল এবং আমি হস্তক্ষেপ করার আগেই সে ওকে হুমকি দিয়ে বের করে দিল। তারপর আমার প্রতিবাদের উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলল 'বদমাশ'। এর পর থেকে ও একটু বিরতি দিয়ে আসত আর চালাকের মতো আবদুলের বাড়ি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঢুকত। আমি জানতাম বিচার ক্ষমতা আমার চাইতে আবদুলের বেশি, কিন্তু ঐ সরল মুখটিকে বদমাশ বলে ভাবাও খুব কঠিন ছিল। দেখা গেল, বেগম হাসানও তার একজন অনিয়মিত ক্রেতা। তিনি আমাকে জানালেন কুখ্যাত কোন এক পরিবারের ছেলে ও। কিন্তু কোন কারণে তাদের সাথে ঝগড়া করে এখন নিজে একাই থাকছে। কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। এদিকে এলে কখনও কখনও ওদের বাগানের একটা ছাউনিতে ঘুমায়। তিনি যদ্দুর জানেন ছেলেটি সৎ।

একদিন সন্ধ্যায় সারাগায়ে কাদা মাখা, তোরঙ্গ ফাঁকা আর ভাঙা, ও এসে ঢুকল, চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল, প্রায় কাঁদোকাঁদো। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি আর অঙ্গভঙ্গি মিলিয়ে ও এটা স্পষ্ট করতে পারল যে ওর সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি জোড়াতালি দিয়ে গল্পটা দাঁড় করালাম। নিজে নিজেই যেন দাঁড়িয়ে গেল গল্পটা, কারণ পরিবর্তনশীল সময়ের ইতিহাসের একটি অনুচিত্র ছিল সেটি। যখন সে ফেরিওলার কাজ শুরু করে তখন সেটাকে জীবিকা হিসেবে টিকে থাকার মতোই মনে হয়েছিল। একরকম নির্বাচিত এই আবাসিক এলাকায় বেশকিছু প্রভাষকের বাংলো আর কিছু বড় বাড়ি ছিল। কিন্তু কোন দোকান ছিল না। আর যেহেতু শহর থেকে প্রায় দুমাইল দূরে জায়গাটা তাই টুকিটাকি যেসব জিনিসপত্র সে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বিক্রি করত তাতে অনেকে সময়ে সময়ে সাইকেলে চড়ে কেনাকাটার ঝামেলা থেকে বেঁচে যেত। কিন্তু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে স্বল্পবেতনের কেরানিরা ঢাকায় আসতে শুরু করল। অস্থায়ীভাবে একটি ছোটখাটো কলোনি এখানে গড়ে উঠল। এগুলো আমাকে তার বলার দরকার ছিল না। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ঘটনাগুলো ঘটতে। সপ্তাহ ধরে আমি দেখছিলাম একদল কুলি রাস্তার পাশে জায়গা দখল করে সেখানে বাড়ি তুলছিল। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তারা দেয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করল, মেঝে তৈরি করল, তারপর দরজা জানালা লাগাল। তারপর সেই কাঠামোটা বাইরের সিঁড়ি ছাড়াই দোতলা বাড়ি হয়ে গেল। খড় দিয়ে চাল ছাওয়া হলো। তারপর প্রতিটি বাড়িতে দুটো করে পরিবার এসে উঠল। পরিবারগুলোর প্রয়োজন মেটাতে অস্থায়ী একটি বাজারও গড়ে উঠল, সামনে খোলা ছোট্ট-ছোট্ট বাঁশের তৈরি চায়ের স্টল, মনোহারি দোকান যেগুলোর মালিকরা সারাদিন দোকানে বসে থাকত। এরাই ছেলেটাকে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাউরে মেরেছে, ওর টিনের বাক্সটা ভেঙে দিয়েছে এবং এখানে যেন ওর চেহারা আর না দেখা যায় সেই হুমকি দিয়েছে।

শুরু করতে ওর কত খরচ হবে? পনেরো টাকা লাগবে, ও বলল। ইংরেজ টাকায় এক পাউন্ডের সামান্য বেশি। এটুকু আমি দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু যেহেতু ও ভিখিরি নয়, একজন ব্যবসায়ী, ওর সম্মান রক্ষা করতে আমি একটি কাগজে লিখলাম, 'আমি পনেরো টাকা নিয়েছি', ওকে সই করতে বললাম, তারপর টাকাটা দিলাম। খুব খুশি হয়ে ও চলে গেল আর আমি ভাবলাম বোধহয় এই শেষ দেখা ওর সাথে। কিন্তু তিনদিন পরেই ও ফিরে এল, নতুন একটি টিনের বাক্স ও জিনিসপত্র সমেত এবং আমাকে আটআনা ফেরত দিল। চুক্তিপত্রে পরিশোধ লেখা হলো। খুব ধীর গম্ভীর স্বরে সে বলল, 'তুমি—পনেরো টাকা পাও।' তারপর চলে গেল।

কয়েক আনা করে করে প্রায় দুবছর ধরে এই টাকা সে পুরো শোধ করল। শেষদিকে এত কষ্টের পয়সা নিতে আমার খুবই লজ্জা করত। কিন্তু চুক্তি বাতিল করে ওর অহংবোধকে আঘাত করার সাহস হত না। শেষ কিস্তি যখন নিয়ে এল তখন ওর সাথে এক বন্ধু ছিল ওরই বয়েসী। সে দেখল যে কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া হয়েছে আর ওর ব্যবসায়ী সততাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। এরপর ওকে আর একবার দেখেছি। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবার আগের সন্ধ্যায় একটি বিদায় অনুষ্ঠান থেকে ফিরে দেখি ও দোরগোড়ায় বসে। চট্টগ্রামে একটি ব্যবসা করার চেষ্টা করছে। যখন শুনেছে আমি চলে যাচ্ছি আমাকে বিদায় জানাতে এসেছে। সীমিত সাধ্যের মধ্যে এমনভাবে আসা সত্যিই কষ্টকর। ওর উন্নতি হয়েছে ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু যেহেতু ও পড়াশুনা জানত না, ওর কাছ থেকে আর কোন খবর পাইনি।

আবদুল কিন্তু ওর প্রতি সীমাহীন বৈরিতা নিয়েই রইল । তবে ওর দিক থেকে যথেষ্ট কারণও ছিল। পরিণত বয়সের একটি ছাত্র একবার সন্ধ্যায় আমার সাথে দেখা করতে এসে ছেলেটিকে বাংলোর গেটে দেখেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল ওর কাজ কী আর তখন হঠাৎ খুব বিশ্বাসের সাথে ওকে একটা দিবাস্বপ্নময় গল্প বলা হয়েছিল। আমি খুব ভালো মেমসাহেব, ছেলেটা ওকে বলেছিল। আর আমার দুষ্টু চাকরটা আমাকে ঠকাচ্ছে এবং আমি যাতে কখনোই সত্য-না জানতে পারি তাই আমাকে দৈত্যের মতো পাহারা দিয়ে রাখছে। কিন্তু ও আমাকে উদ্ধার করবেই। আবদুলকে ও সরিয়ে দেবে, আমাকে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করবে, আমার অন্তত শ'খানেক টাকা বাঁচিয়ে দেবে যতক্ষণ না আমি ওর সাথে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটিকে আশীর্বাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব। আমাদের সম্পর্কের জন্যে সৌভাগ্যের ব্যাপার, আমরা দুজনেই এত বাজে ভাষাবিদ ছিলাম যে এমন সব রোমান্টিক আশা না বলাই রয়ে গেল। আর আমিও কখনও সেগুলো বুঝতে পারিনি। আমি কখনও জানতেও পারিনি যে আব্দুল সেগুলো জানতে বা আন্দাজ করতে পেরেছিল কি না, কিংবা ও কি ভয় পেয়েছিল এই ভেবে যে আমি হয়ত এসব গল্প বিশ্বাস করে ওকে বরখাস্ত করে ছেলেটাকে রাখতে পারি, অথবা কোন সম্ভাব্য চোরের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতেই ও চেষ্টা করছে।

একদিন বিকেলে ফিরে দেখি বাংলোর গেটে পাঁচজন বাঙালি মুসলমান ভদ্রলোক একান্ত আলাপে মগ্ন। তাঁরা দেখতে খুবই গম্ভীর, খুবই সম্ভ্রান্ত, খুবই দাড়িওয়ালা, আর যেহেতু স্পষ্টতই তাঁরা আমার কাছে এসেছেন আমি একটু ভয়ে ভয়ে তাঁদের ভেতরে আসতে বললাম। ঠাণ্ডা পানীয় ও বিস্কুট দিতে বললাম। কয়েক মিনিট সৌজন্য-বিনিময় করলাম এবং পরপরই এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জন তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। উপসংহারে এসে তাঁরা জানালেন যে, আমার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্তি পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী হয়নি। তাঁরা একথা আমাকে জানানো উচিত মনে করে এসেছেন। আমি বললাম, আমি আশা করি তাঁদের আস্থা অর্জন করতে পারব। তাঁরা চলে গেলেন।

এই প্রথম আমি এমন সব সংশয়ের কথা শুনতে পেলাম ; অবশ্যই এটা কোনকিছু জানার একটি আশ্বস্তপূর্ণ পদ্ধতি। আমি যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি তাঁদের সংশয়কে খুব বিস্ময়কর মনে হয়নি কিন্তু তারা কোথায় হারিয়ে গেলেন! আমার কর্মসময় বা কর্মকাল এখনও শুরু হয়নি, এবং যেহেতু আমি তাঁদের কাছ থেকে ভালো বা খারাপ নম্বর পাওয়ার মত কোন কাজই এখনও করিনি,আমি এই প্রশ্নের কোন উত্তরও খুঁজে পেলাম না। একথা সত্য যে, কোন রহস্যময় কারণে আমি তাঁদের বিচারে খুব অনিষ্টকর প্রতীয়মান হইনি। পশ্চিমিরা এদেশে বাস করতে এসে যে বৈরিতার সম্মুখীন হয়, প্রচ্যের দেশগুলোতে তারা প্রাথমিকভাবে যে-বিরুদ্ধ পরিবেশের মুখোমুখি হয়, আমাকে তা হতে হয়নি। উল্টো বরং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একথাই ভেবেছেন যে আমি তাঁদের পক্ষে, অন্তত আমি একথা স্পষ্ট করে বুঝবার আগেই যে সেখানে কোন পক্ষ নেয়ার মতো ব্যাপারই আদৌ ছিল কি না।

সেই সপ্তাহেরই কোন এক সময়ে, টার্ম শুরু হবার ঠিক আগে, আমি যখন বসে চা খাচ্ছিলাম, রোগা, প্রাণবন্ত চেহারার এক তরুণ দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল রহমান বলে। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ঢুকতে যাচ্ছে। সে নিশ্চিত আমি তার সাথে পরিচিত হতে উৎসাহী হব, কারণ ইতোমধ্যেই সে নিজেকে একজন বিক্ষোভকারী বা আন্দোলনকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। আর উচ্চমাধ্যমিক কলেজে সে অনেক সফল ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে যা ইতিহাসে অনেকেই পারেনি। এখন যেহেতু সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সেহেতু ছাত্রদের সব দুঃখকষ্ট লাঘব করার প্রস্তাব সে রাখছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সেগুলো কী?' এখন সে-সম্পর্কে ও কিছু জানে না, তবে সে ওগুলো খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার করবে আর তার প্রতিকার করবে। জনসেবার নজির আছে এবং তার জন্য সঙ্গতভাবেই গর্বিত এমন একজনের মতো করে ও কথাগুলো বলল।

চা খেতে খেতে আমি ছাত্র-ধর্মঘট সম্পর্কে আমার বিরূপ মতামত ব্যক্ত করলাম। সে বেশ সহজভবেই তা গ্রহণ করল। যেন বিদেশি হিসেবে আমাকে কিছুটা ছাড় দিল, এখনও সবকিছু জানার আছে তো। তার ওপর আমার মতামতগুলো সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। কারণ ইংল্যান্ডে ১৯৪৭ সালে ধর্মঘট বাস্তব অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে দাঁড়ায়নি। সম্ভবত আবদুলের কেক পাচক রস থেকে একটি সহনশীলতার মনোভাবও মস্তিষ্কে ঝরিয়ে দিচ্ছিল, কারণ প্রায় এক ঘণ্টা কি তার বেশি সময় ধরে আমরা বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই বিষয়ে আলোচনা করলাম। আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বিদায় নিল। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে সে আসত। এমন চমৎকার আলোচনা আমার মতো সেও উপভোগ করত। আমরা একধরনের দায়হীন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলেছিলাম।

মুনীরের মতো সে মাঙর্সিষ্ট ছিল না। কোন দলের সমর্থকও ছিল না। সে একজন একনিষ্ঠ পাকিস্তানি যে দেশ-বিভাগপূর্ব বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছে এবং মহোল্লাসে জনগণের গণতন্ত্রের আশায় তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ওর মূলমন্ত্র হয়ত ছিল, 'আমি চিরকালের যোদ্ধা, সুতরাং আরও একটা যুদ্ধ।' যা-কিছু খারাপ হয়েছে অথবা যা হয়নি তা দেখার মতো একটি দৃষ্টি ওর ছিল, ছিল একটি প্রতিবাদী চেতনা। আর প্রত্যক্ষ কাজ বা লড়াইয়ে পবিত্র বিশ্বাস ছিল ওর। এসব অবধারিতভাবে আমলাতন্ত্রের সাথে ওকে সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলবে, তা ছাড়াও ও দাবি করত যে সাংগঠনিক ক্ষমতাও ওর আছে।

* * *

দিনের তাপ চলে যাচ্ছে। আমি শহর থেকে দূরে মিরপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। দুটো ছেলে একটি সাইকেল থেকে পড়ে গেল (একটি বাঙালি-সাইকেলের জন্যে দুজনের ওজন সহনীয়) আমার পায়ের কাছে। নিজেদের উঠিয়ে ওরা বেশ নম্রভাবে বলল, 'আমরা মিটিঙে যাচ্ছি।' 'কোন মিটিং?—' 'একটি গ্রাম্য স্কুলের ব্যাপারে'—'সেটা আমার কাছে বেশ কৌতূহলের । আমি কি আসতে পারি?' সুতরাং তারা সাইকেল চালিয়ে আমার পাশে পাশে আসতে লাগল।

দীর্ঘ পথ হাঁটতে হলো। পথে দুজনের মধ্যে বেশি-কথা-বলা ছেলেটি যার নাম শিকদার, সে জানাল, যে-গ্রামে আমরা যাচ্ছি সে-গ্রামের বাচ্চাদের জন্য একটি প্রাইমারি স্কুল খোলার জন্য অনেকদিন থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। এখন বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছে, শিক্ষক পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যায় স্কুলটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। যখন তারা জানতে পেল যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, খুবই উদ্দীপ্ত বোধ করল। স্পষ্টত অনুভব করল আমার উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে গৌরবময় করে তুলবে। ওরা নিজেরা উচ্চ-মাধ্যমিকের ছাত্র (উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও স্নাতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে দুবছরের একটি কোর্স) ঢাকা কলেজে। তারা এই গ্রামের অধিবাসী নয়। যা আন্দাজ করতে পারলাম তা হলো প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ওরা এসেছে, তাদের সমাজসেবার আগ্রহ এই স্কুলের টাকা তোলার ব্যাপারে তাদেরকে জড়িয়েছে।

আমরা গ্রামটিতে পৌঁছলাম। গাছের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা মাটির কুঁড়ে নিয়ে গ্রামটি। গাছের ফাঁক দিয়ে ছোট পুকুরের পানিতে আলো পড়ে চিকচিক করছে। এর সামনে সবুজ মাঠের মুখোমুখি স্কুলটি দাঁড়িয়ে। বাঁশে-ছাওয়া লম্বাঘরটি, শ্রেণীকক্ষের সামনেটাও ছাউনি দেয়া। একজন দাড়িওয়ালা শিক্ষক মাটির ওপর আড়াআড়ি পা ফেলে বসে আছেন। কোন ব্ল্যাকবোর্ড নেই, মানুষের কণ্ঠস্বরকে সাহায্য করার আর কোন উপকরণ নেই। একপাশে জনাকুড়ির মতো ছোট ছোট শিশু, সম্ভাব্য ছাত্রছাত্রীরা ঝাঁক বেঁধে বসে, বিপরীত দিকে তাদের অভিভাবকরা, সংখ্যায় আরও বেশি, সবারই দাড়ি, সবারই টুপি। গোধূলির সোনালি আলোয় পুরো দৃশ্যটা ভেসে যাচ্ছে।

শিকদার আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল বড়দের সাথে। কেউ-একজন চেয়ার আনতে দৌড়ে গেল। আমি সেটাতে বসলাম, ওদের এই সৌজন্যকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলাম না বলে, কিন্তু মনে হতে লাগল মাটির সমতলের একটি সমাবেশে আমি যেন জিরাফের মতো। সেসময় একজন একটি নারকেল ভেঙে আমাকে একটি গ্লাসে পানিটা খেতে দিল। শিশুরা গান গাইল, নেতৃস্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ক'জন বাংলায় ভাষণ দিলেন। শিকদার আমাকে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি যদি দয়া করে উপদেশমূলক ক'টি কথা বলো, আমি সেগুলো বুঝিয়ে দেব।'

আমি রাজি হলাম। অন্য বক্তারা কী বলছেন সে-ব্যাপারে অবশ্যই আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি গতানুগতিক কিছু শব্দ দিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগলাম, মনে-মনে এই আশা নিয়ে ঐ শব্দগুলো শেষ হবার আগে কোন উপযুক্ত চিন্তা আমার মাথায় আসবে। যা এল তা হলো লন্ডনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষকতার স্মৃতি, যেখানে পড়ার মাঝে দুধ বিলোতে গিয়ে পড়ার ব্যাঘাত ঘটত। সুতরাং আমি বললাম যে আমাদের দেশে আমরা শিক্ষাকে এত বিশ্বাস ও মর্যাদা দিই যে সরকার একে শুধু বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিকই করেনি, বরং সারাদিনের কর্মশক্তিকে অটুট রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের দুধও দেয়া হয়। কারণ আমরা মনে করি, শিক্ষা প্রতিটি শিশুর—আমি ইতস্তত করতে লাগলাম—শিকদারের শব্দভাণ্ডারে মজুত এমন একটি শব্দ খুঁজতে লাগলাম, সে খুব উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল : (জন্মগত অধিকার) 'Birth right.' আমি পরে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ে শব্দটা পেয়েছি। সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই ও পড়াশুনা করছে। যখন বছরের শেষে ও ইংরেজিতে ফেল করে পিছিয়ে গেল, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি যে ন্যায়বিচার করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়বিচারের সাথে পরীক্ষার কী সম্পর্ক? আমরা এদের মিলাতে চাই কিন্তু আমাদের সব প্রয়াসের পরও বেশির ভাগ পরীক্ষার খাতাই লটারির মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দুবছর শিকদারের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। আমার বাংলো থেকে মাইলখানেক দূরে একটি কৃষকের বাড়িতে ও থাকত। প্রায়ই আসত। সে ছিল চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারার তরুণ, লম্বা ও বাঙালি হিসেবে বেশ শক্তসমর্থ, ঘাড়অব্দি চুল ঝুলে পড়েছে, আয়ত উজ্জ্বল কালো চোখ । সুগঠিত গতিময় চেহারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে-কোন মঞ্চ পরিবেশনার জন্য সে হয়ে উঠতে পারত একটি সম্পদবিশেষ। কিন্তু জীবনের প্রতি উচ্ছল, সক্রিয় কর্মোদ্যমসম্পন্ন এই ছেলেটির কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বলে আমার মনে হয় না। খুব ধনীও নয়, খুব দরিদ্রও নয় এমন একটি কৃষক পরিবারের ছেলে ছিল ও। ওর ছিল একটি ঐশ্বর্যশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যার সাথে কলেজে যে-ইংরেজি শিক্ষা ও পাচ্ছিল তা যেন অনেকাংশে সামঞ্জস্যহীন। গ্রাম্য লোকগীতির টুকরো টুকরো অনেক গল্প ও আমাকে বলেছে যেগুলো বেশিরভিাগই জটিল পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে তৈরি। ওর কাছ থেকে আমি জেনেছিলাম যে বিড়াল বাঘের মাসি এবং বিড়ালই বাঘকে শিকারের বেশির ভাগ কৌশল শিখিয়েছে। জেনেছিলাম সুরেলা গলার যে-পাখিটি Bo-Ke-ta-to (বউ কথা কও) বলে কাঁদে সে একসময় ছিল শাশুড়ি, যে কিনা তার তরুণী পুত্রবধূকে এমন জোরে আঘাত করেছিল যে বউটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। মুসলিম গ্রামগুলোতে তরুণী বধূদের অনেক সহ্য করতে হয়। সোনালি হরিয়াল তেমন একটি পাখি। অনুগত বধূর মতো, যে নীরবে অলখে সবার সেবা করে যায়। একদিন তেমনি তার স্বামীকে খাবার পরিবেশন করে মাত্রই সে নিজের খাবারটা রেঁধেছিল, জাফরানি রঙে রঙিন ভাত, সে-সময় কিছু অতিথি আত্মীয় এসে উপস্থিত। সুতরাং সেই ভাত সে অতিথিদের পাঠিয়ে আবার রাঁধতে গেল। মাত্রই খাবারটা রান্না হয়েছে আবার আরেকজন আত্মীয় এলেন, সে এবারও খাবারটা তাঁকে পাঠিয়ে আরও খানিকটা রাঁধল, আবারও একই ঘটনা। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। সে হাঁড়িটা নিজের মাথাতেই ভেঙে দৌড়ে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলে চলে গেল। হলুদ সেসব জিনিস ওর বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বধূটি পাখি হয়ে গেল।

আমি যদ্দুর বুঝতে পারি, এ-গল্পটা শিকদারের বানানোও হতে পারে, বানানোর একটি ক্ষমতা ওর ছিল। কিন্তু এটা যদি সত্যি সত্যিই কোন লোকগাঁথা না হয় তবে হওয়া উচিত ছিল। এইসব গল্প ছাড়াও সে অনেক পুরনো ঐতিহ্যবাহী কবিতা যেগুলো গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের ফসল তোলার, বিয়ের বা শোকের গান, সেসব জানত, ভাটিয়ালি গান—যেগুলো মাঝিরা বড় নদীতে তাদের কলাকৌশল দেখানোর সময়ে নৌকার অগ্রভাগে বিশাল বড় বৈঠা নিয়ে গাইত, সেই গানগুলো, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও ও জানত এবং মূল বাংলায় আবৃত্তি করতে ভালোবাসত। আমি সেগুলোর ইংরেজি অনুবাদই কেবল পড়তে পারতাম। আমাকে ও বলেছে যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কারণ তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু পূর্ববঙ্গে আরও একজন কবি আছেন, নজরুল ইসলাম— তাঁর গানও তরুণ মুসলিমরা একই রকম ভালোবাসে। তিনি এখনও বেঁচে কিন্তু দুরারোগ্য রোগে ভুগে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, তিনি আর লিখবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিজীবনের সর্বত্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার মধ্যে কবিতা ছিল। পৃথিবীর কোন দেশে 'কবি' এদেশের চাইতে বেশি সম্মান পান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র হয় কবি, নয় নিজেকে কবি বলে ভাবত, বা আশা করত কবি হবে। এবং ইংল্যান্ড থেকে আসা একজন সাহিত্যের শিক্ষক যাকে কবিতার পাঠ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নিতে হয়, তার কাছে কবিতাকে সৎজীবনের অপরিহার্য অংশ বলে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা বেশ নতুনত্বের ব্যাপার বইকী। এখানে কবিতা কলেজে বা খোড়ো-ঘরে সমানভাবে উপস্থিত। পরের মার্চে, বসন্তের ছুটিতে যে-সময় বসন্তের আগমনকে স্বাগত জানানো হয়, আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একদল ছেলের সাথে যোগ দিলাম, দেখলাম যে ওরা একটি তাৎক্ষণিক গানের পালা শুনছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাম্য কবির মাঝে, যাঁদের ওরা এখানে গাইবার জন্য নিয়ে এসেছে। বয়স্ক, পোড়-খাওয়া চেহারার, দবিদ্র পোশাক পরা তাঁরা। মুখোমুখি দুজন দাঁড়িয়ে হাতে বাদ্যযন্ত্র, একজন ক'টি স্তবক সুর করে গাইছেন, পরমুহূর্তেই এই ছন্দে সুর করে আরেকজন উত্তর দিচ্ছেন। আমি কথাগুলো বুঝতে পারিনি, কিন্তু তাঁদের সুরের ধরন, চেহারার অভিব্যক্তি ও দর্শকের উত্তেজনা থেকে বুঝতে পারছিলাম যে খুব সিরিয়াস ও মহিমান্বিত ভঙ্গিতেই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। যতই জমে উঠতে লাগল ততই গালাগালি বাড়তে লাগল ও ব্যক্তিগত আক্রমণ হতে লাগল।

ছাত্ররা আমায় জানাল এ-ধরনের লড়াই গ্রাম্য বিনোদনের খুব সাধারণ মাধ্যম ছিল কিছুদিন আগেও, কিন্তু এখন খুব দূর-দূরান্ত ছাড়া হারিয়েই যাচ্ছে। এমন নিশ্চয়ই সময় ছিল যে-সময় ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতেও এসব ছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম থিওক্রিটাস কি তাঁর অভিজাত আলেক্সান্দ্রিয়ান দর্শকদের জন্য তাঁর নিজস্ব ধারা সৃষ্টির আগে এসব গান শুনেছিলেন? ভার্জিলের মেটে রাখালি কবিতাগুলো শুনলে মনে হয় কবি যেন মাঠে-মাঠে না ঘুরে সাহিত্য আঙ্গিকের প্রতি বিশ্বস্ততার ওপর জোর দিয়েছেন। আসল জিনিস হয়ত মিলত তাঁর সময়ের ইতালির পাহাড়িয়া গ্রামে।

শিকদার আমাকে জসীমুদ্দীনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যিনি ঢাকার একটি মন্ত্রণালয়ে কাজ করছেন। তিনি সেইসব বিরল মানুষের একজন, যাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁকে তাঁর দেশীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনি। তাদের পিতামহদের কাছ থেকে যেভাবে তারা গান বা গাথাগুলোকে গ্রহণ করত তেমনি সহজেই জসীমুদ্দীনের গান ও গল্পগুলোকে নিরক্ষর গ্রামবাসীরা গ্রহণ করত। আমার মনে হয় বাঙালিদের মধ্যে তাঁর স্থান অনেকটা শতাব্দীর শেষে আইরিশদের কাছে ডগলাস হাইডের অবস্থানের মতোই ছিল, যদিও আমি বাংলা বা আইরিশ কোনটাই তুলনা করার মতো ভালো জানি না।

আইরিশদের মতো পণ্ডিতকুল দিয়ে বাংলার জীবন্ত সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাক্ষরতা এর মৌখিক ঐতিহ্যকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনাশ করছে এবং জসীমুদ্দীন ও পরে পশ্চিমবঙ্গের আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে জেনেছি, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগে যেসব চেষ্টা চলছে একে বাঁচিয়ে রাখার সে-সম্পর্কে। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, হস্তশিল্প, নৃত্য এইসব শিল্পে ভারতীয় গ্রামগুলোর একটি ঐশ্বর্যময় সভ্যতা আছে এবং বাংলায় নিশ্চিতভাবেই এর বীজ সাধারণ মানুষের জীবনের ভেতরে প্রোথিত। কিন্তু নিজে নিজে এটা আর বেঁচে থাকতে পারছে না, সাক্ষরতার সাথে সাথে পশ্চিম থেকে আসা শহুরে কসমোপলিটান সংস্কৃতির সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি বেড়েছে এবং আধুনিক যুগের অর্থনীতির সাথে তা বেশি সম্পৃক্ত। যে-কৃষকটি তার ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা দেবার প্রয়োজনে যতটা পারছে ততটা ইঞ্চি জমি বিক্রি করে দিচ্ছে, সে প্রত্যাশা করে যে, ছেলে শিক্ষিত হলে সরকারি অফিসে কাজ পাবে অথবা কলকাতার কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে এবং বাড়িতে সামান্য হলেও নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারবে, অন্তত, নিজেকে সে ফসল তোলার দৈব সুযোগের ওপর আর নির্ভরশীল রাখবে না। এদিকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ছেলেটি শেখে ইউরোপিয়ান সুট পরতে, হোটেলে-রেস্তোরাঁয় যে-গান বাজে তার সুর ভাঁজতে, যখনি সাধ্যে কুলায় একটি ইংরেজি ছবি দেখতে ও হলিউডি অশ্লীল বুলি আওড়াতে। যখনই সে বাড়ি আসে ইংরেজি শিক্ষার এইসব প্রমাণাদি ওকে গ্রামের লোকের কাছে প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয় করে তোলে। ওর হৃদয়ের একান্তে ও হয়ত ঠিকই জানে, —আমার মনে হয় অনেক বাঙালি তরুণেরই এতটা শিল্পবোধ আছে যে তারা জানে ও বোঝে যে, গ্রাম-ঐতিহ্যে এসবের চাইতে অনেক বেশি উঁচুমানের শিল্প আছে— কিন্তু তবু বাড়িতে, গ্রামে সে অজ্ঞদের মধ্যে একজন জ্ঞানী লোক, আর শহরে চাকরি পাবার জন্য ওকে সপ্রতিভতার ভান করতেই হয়। তা ছাড়াও শহুরে অস্থিরতা ওর রক্তের ভেতরে গেছে ঢুকে, গ্রাম্য ছন্দের সাথে আর ওর ভাব নেই, এখানে কারও সাথে বলার মতো কথা সে খুঁজে পায় না, কিছু করার মতোও খুঁজে পায় না এবং তাই প্রথম অভ্যর্থনার রেশ কেটে যেতেই যত স্বল্পতম শোভন সময়ে শহরে ফিরে আসতে পারে, বাঁচে। যখন সামাজিক মর্যাদা আর অর্থনৈতিক উন্নতি দুইই নির্ভর করে জমি থেকে দূরে সরে যাওয়ার ওপর, তখন শহুরে সংস্কৃতিকে গ্রাম্য লোকটি তার নিজের সংস্কৃতির চাইতে বড় বলে মানবেই, কেউই তা ঠেকাতে পারবে না। ব্রিটিশরাজের অধীনে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সবই ছিল, কেবল ধর্ম ছাড়া। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রাম্য লোক-ঐতিহ্যকে খোড়াই কেয়ার করত যতদিন না এ শতাব্দীর শুরুতে আইরিশদের মতো এখানেও কিছু জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বুঝতে শুরু করলেন যে এই সংস্কৃতি মৃতপ্রায়। একই প্রজন্মের ভেতরে বিশপ পার্সির সময় থেকে সিসিল সার্প-এর সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইতিহাস ও এখানে এই সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের কাহিনী একই রকম প্রায়। তরুণ হিসেবে জসীমুদ্দীন এই সমস্ত উৎসাহীদেরই একজন ছিলেন যিনি গ্রামে-গ্রামে গিয়ে লোকজনদেরকে নিয়ে লোকগীতি, গাঁথা যেসব মুখেমুখে গাওয়া হত, গাওয়াতেন। সুর রেকর্ড করতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের প্রতিলিপি তুলে নিতেন। প্রথমদিকে, তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এইসব গান-গাঁথাকে খুব হেয় চোখে দেখতেন, সাধারণ লোকের মুখের কথা বলে। হয় শব্দগুলো খুব বেশি অমার্জিত হত, আরেকটু মার্জিত করে লিখতে হত, নয় সুরটাকে খুব অশ্লীল মনে হত, ঘষেমেজে একটু ভব্য করতে হত। এই ধরনের সংশোধনের পর ধীরে ধীরে একটি রুচির সৃষ্টি হলো, একটি গতিবেগ এল এবং সেই শ্রোতারাই মূল জিনিসটির প্রতি এমন ঝুঁকল যে তারা এখন তাদেরকেই আক্রমণ করতে লাগল, একসময়ে যারা এগুলোকে ঘষেমেজে তাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে উপস্থাপন করেছিল। ১৯৪৭ সালের মধ্যে লোকসঙ্গীত খুব ফ্যাশন হয়ে উঠল। সব গ্রামোফোনের দোকানগুলো এ গানের রেকর্ড সঞ্চয় করত, কলকাতা বা ঢাকা কোন জায়গার বেতারকেন্দ্রই বেশিক্ষণ বাজালে লোকসঙ্গীত কিছু শুনতেই হত, হয় ফিলার হিসেবে নয় অনুষ্ঠান হিসেবেই।

গ্রাম্য কবিতার এই প্রসঙ্গ আমার স্মৃতিকে নিয়ে যাচ্ছে ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে, যখন জসীমুদ্দীন আমাকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে বাঁশবাগানের মাঝখানে একটি গ্রামের মিলাদ মাহফিলে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিলাদ হচ্ছে নবীর সম্মানে বাৎসরিক সমাবেশ এবং মূল ব্যাপার এটি হলেও এর সাথে আরও অনেক কিছু থাকে। স্মৃতিকে এখন সাহায্য করছে ডায়েরি যেগুলো আমি বিক্ষিপ্তভাবে রেখেছিলাম, যার অংশ থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

আমরা গাড়ি চড়ে রওনা হলাম। সাথে লাউড স্পিকারের যন্ত্রপাতি ও সহকারী চারজন ছাত্র নিয়ে। সূর্যাস্তের সময় আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম, দেখলাম সারা গ্রাম— মানে এর পুরুষ-অংশ, যেখানে একজন মহিলাকেও দেখা যায়নি, সবাই জমা হয়েছে হাইস্কুলের সবুজ মাঠে, যেখানে মঞ্চ সাজানো হয়েছে তার চারপাশে দড়ি টাঙিয়ে, মালা আর উজ্জ্বল ছাপা সুতি কাপড়ের টুকরো দিয়ে। কেউ-একজন চেয়ার নিয়ে এল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, যিনি একজন হিন্দু, ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। জসীমুদ্দীন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এরপর সহজে বহন করা যায় এমন একটি হারমোনিয়ামে ধর্মীয় গান গাওয়া হলো ; উজ্জ্বল-গোধূলি আলোয় সূর্য বিদায় নিল, জনতার সাদা পোশাক সে-আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগল। প্রচণ্ড গরম ছিল সেদিন। আঁধার নেমে এলেও গরম কমল না, কোন শীতল বাতাস বইল না, কেবল মশার উৎপাত বেড়ে গেল।

জসীমুদ্দীন বলেই যাচ্ছিলেন। থামছিলেন না। পরে আমাকে উনি জানিয়েছিলেন যে এই দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল যাতে সেখানে উপস্থিত কিছু প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবি আর কিছু বলার সুযোগ না পায়, যারা এই অনুষ্ঠানটিকেই খুব একটা অনুমোদন করতে চাইছিল না এবং যাদের কাছে তিনি বারবার মহিলাদেরকে মুক্ত করে দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কী করে ইসলাম একটি সাম্যবাদী সমাজ হয়ে উঠবে যদি এর অর্ধেক সদস্যই দাসত্বে বন্দি হয়ে থাকে? শেষ পর্যন্ত প্রার্থনার সময় হলো। হিন্দুরা ও আমি আলাদা হয়ে চা খেলাম, মুসলমানরা সারিবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিরপুর হচ্ছে কুমোরদের গ্রাম। ওরা আমাকে কুমোরপাড়ায় নিয়ে গেল, কুমোরের চাকা দেখাল, স্তূপ-করা মাটির হাঁড়ি দেখাল। নারী-পুরুষ সবাই মাটির হাঁড়িকুড়ি বানায়, মেয়েরা আমাকে দেখাল কী করে কুমোরের মাটি দিয়ে কপাটের কাঠের নকশা আঁকে তারা।

আমরা আবার মাঠে ফিরে এলাম একটি গান হবে বলে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মঞ্চের ওপরে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে। ভিড়ের ভেতরে এখানে-সেখানে একটা-দুটো হারিকেনের আলোয় সাদা কাপড় চকচক করছে, কিছু উদ্গ্রীব কালো মুখ দেখা যাচ্ছে, বাকিরা অন্ধকারে ম্লান।

মঞ্চে বাদকদল বসে। এক হাতে আছে হারমোনিয়াম, দোতারা ও একটি গোলগাল কাঠের যন্ত্রে দুটো তার বাঁধা, একটি রান্নার হাঁড়িকে এমন সুন্দর করে আকার দেয়া হয়েছে যে, ঢোলের মতো শব্দ হয়, আর একটি কাঠের লাঠির সাথে দুটো ধাতুর তার বাঁধা যাতে টোকা লেগে শব্দ হয়। একের পর এক গায়করা মাইক্রোফোনের সামনে আসতে লাগল। প্রতিবারেই তারা গাইতে লাগল হারমোনিয়াম আর দোতারা দিয়ে, অন্যরা সাথে বাজাতে লাগল। প্রথমে ছিল প্রেমের গান, পুরনো লোকগীতি বা তার চাইতে কিছু আধুনিক, এর মধ্যে কিছু জসীমুদ্দীনের নিজের— যেগুলোকে ভঙ্গির দিক থেকে পুরনোগুলো থেকে আলাদা করা কঠিন। জসীমুদ্দীনের কিছু সমবেত প্রচারসঙ্গীত ছিল যেগুলো খুবই ভালো। এর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর গানটি ছিল গ্রাম্য পানি সরবরাহ নিয়ে : কী চমৎকার সেই পানি, যা কিনা স্বর্গ থেকে এসেছে, যা কিনা পৃথিবীর মাটি থেকে তুলে নিয়ে আসা : আবার এত সুন্দর ও পরিষ্কার অবস্থায় আমরা সবসময়ে পাচ্ছি। এই আলৌকিক ঘটনায় যাঁরা চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম উচ্চারিত হতে লাগল একের পর এক, বুড়ো টম চাচা ও অন্যদের মতো— অমুক, অমুক, অমুক এবং সলিমুদ্দীন।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পর একদল নৃত্যশিল্পী এল। আমরা চলে গেলাম স্থানীয় একজন ধনী লোকের বাড়ির সামনে যিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। নাচের জন্য চমৎকার জায়গা। স্থাপত্যটা অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মতো, কিন্তু চৌকোণা একটি জায়গার তিন দিক থেকে গোল হয়ে চওড়া সাদা সিঁড়ি উঠে গেছে স্তম্ভের দিকে যেগুলো মশালের আলো থেকে তারাভরা আকাশের দিকে উঠে গেছে।

আমরা সিঁড়ির উপরে বসলাম, যারা সেখানে বসেনি, তারা নাচের জায়গার চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসল।

নাচিয়েরা সবাই পুরুষ। প্রথমে ছিল ধ্বংসের দেবতা কলির একটি একক নাচ—চূড়ার মতো মাথার সজ্জা, মুখোশ ও তলোয়ার নিয়ে। খুব ভালো হয়েছিল বলা যায় না, কিন্তু ভুতুড়ে আবহ তৈরি করতে পেরেছিল চমৎকার। এরপর হলো বেদের নাচ, একটি লোক ও তার দু স্ত্রী নিয়ে। তাকে ঘিরে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা যখন হচ্ছে, তখন সে তার পৌরুষের আনন্দে অধীর। কিন্তু ব্যবস্থাটি উল্টে গেল যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাচে যোগ দিয়ে একটি স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ দেখাল। আমি সঠিক বলতে পারব না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কি সেই শিল্পীদলের একজন, নাকি প্রদর্শনীতে আবেগআপ্লুত হয়ে উঠে-আসা কোন গ্রামবাসী। শেষে একটি ছোট ন্যাংটো ছেলে এসে এই চারজনের সাথে যোগ দিল। বোকার মতো চেহারা, কুঁজো ঘাড়, ভিক্ষা করছে হাত পেতে, পায়ের ছন্দ একেবারে নির্ভুল, ছেলেটি নাচিয়েদের পায়ে-পায়ে ঘুরতে লাগল, ওরা ওকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল। নাচটা বদলে গেল। সুর ও ছন্দ আগের মতোই পুরনো ঐতিহ্যবাহী, কিন্তু গানটি পাকিস্তানি। ভিক্ষুক ছেলেটি ও বেদের দল নাচতে নাচতে গানটি গাইতে লাগল। নতুন শব্দ, কিন্তু জীবনের মূল সুরটি অপরিবর্তিত।

কেউ আমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছিল। ছোট একটি কুঁড়েঘরের ভেতরে, গরম ধোঁয়া-ওঠা খাবার এবং তার সাথে মিশেছে পাশের পায়খানার বাতাসে ভেসে-আসা গন্ধ। জসীমুদ্দীন দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানাল, বুঝতে পেরেছিল যে সৌজন্যের চেয়ে স্বাস্থ্য বড়। ক'মিনিটের বাদানুবাদের পর আমরা গাড়িতে উঠলাম। রাত ১১টার পর বাড়িতে পৌঁছলাম। ও আমাকে দরজার কাছে নামিয়ে দিল। কটা ডিম রেঁধে, এক কাপ চা বানিয়ে খেয়ে ক্লান্ত শরীরে বিছানায় গেলাম।

গ্রামটি ছিল মুসলিমপ্রধান এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় জনসংখ্যার বেশ বড় একটি অংশ ছিল। জসীমুদ্দীন যেমন বলেছিল, তেমন যদি হয়, কট্টর কিছু মৌলবি নাচগানে সত্যিই আপত্তি করে থাকে, যেগুলো নবীকে সম্মান দেখানোর কোন প্রথা আসলে ছিল না, তবু সেই সন্ধ্যায় সেই আপত্তির কিছু বোঝা যায়নি। সবাই খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। তবুও দুবছর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে মিরপুর হিন্দুদের জন্যে খুব খারাপ জায়গা ছিল।

এগুলোই হচ্ছে প্রথম দিকের স্মরণীয় কিছু ঘটনা ও সংঘাত। বলার প্রয়োজন নেই যে এগুলোই জীবনের সব নয়, প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটি সহজেই বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। আমার সময় শুরু হতে হতে আমি আমার নিজের সুতোয় নিজের মতো করে নকশা বুনতে লাগলাম, নতুনত্বের চমক অনেকটাই তখন ফ্যাকাশে। প্রথম পর্বের শেষদিকে আমার হঠাৎ মনে হলো, এই জীবন, যার আমিও একটি অংশ বলে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, এত সহজে বাইরের কাউকে বর্ণনা করা যাবে না, কারণ আমি নিজেও যখন এ জীবন ছেড়ে যাব, হয়ত তখন অত ভালো করে মনে করতে পারব না এসব অনুভূতি। আমার টেবিল, তোমরাই এগুলো মনে রাখো যেভাবে আমি লিখে যাব। আমি ডায়েরি রাখতে শুরু করলাম। খুব নিয়মিত নয়, কিন্তু মাঝেমাঝেই, কখনও একটি পুরো দিনের সব ঘটনা বর্ণনা করে, কখনও পরপর ক'দিন। এখন যখন ওটা খুলি বেশির ভাগই খুব একঘেয়ে লাগে, একটানা রুটিনের দিনলিপি, শিক্ষক-ছাত্রদের সমস্যার সমাধান, কমিটি, সাক্ষাৎকার এই কেবল।

সর্বোপরি এ যেন একটি ঘটনার নিরন্তর আরেকটি ঘটনায় বাঁধা পড়ার বিবরণ : বারবার আমি নিজেকে দেখতে পাই, কোন স্মারকলিপি বা বেতার-কথিকা লিখতে কিংবা কোন গভীর পড়াশুনায় বসতে আর উঠে উঠে যেতে একের পর একজন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা অতিথির আগমনে। কেউ হয়ত কোন দরকারি কাজে এসেছেন, কেউ খামোখাই। ঢাকার একজন অধ্যাপকের জন্য সকাল থেকে মাঝরাতের ভেতরে নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এর মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা আছে, মতামত প্রকাশের সময় উৎসুক আলাপচারিতার মাঝে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া আছে, আছে এমন সব মুহূর্ত যখন অপ্রকাশিত দ্বন্দ্বগুলো অযৌক্তিক আর অশোভনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ত, আবার অন্যরকমও ছিল—কখনও কখনও সেগুলো হয়ত একই রকম। নিছক আনন্দের মুহূর্তও আসত। সেইসাথে মধ্যবর্তী বিরতি যখন নিরাসক্তভাবে ফিরে দেখা যেত। এটা ছিল সেই সময় যখন আমি পূর্ব পাকিস্তানকে দেখেছিলাম, এখন যেমন দেখছি স্মৃতিতে, একটি প্রাকৃতিক নিসর্গ, সবুজ ও বিস্তীর্ণ জলরাশিতে একাকার ; আর একটি মানবিক নিসর্গ, কবিতা, রাজনীতি আর দারিদ্র্যে মেশামিশি যেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

লেখাপড়ার বাইরে

এদেশ আর দেশের মানুষ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে পারছিলাম। পিছু হটেছে বর্ষার মেঘেদের উদ্দেশ্যপূর্ণ নিয়মিত মিছিল, পড়ে আছে স্বচ্ছ আকাশ, ইংল্যান্ডের আকাশের চেয়েও যেন গভীর, অতলস্পর্শী। দৈত্যের মতো বিশাল সূর্য নিজেকে অসহ্য উজ্জ্বলতায় একীভূত করে উঠতে থাকে, বিকেলের আলো চারপাশে এমন প্রভা ছড়ায় যেন সর্বত্র ছড়ানো। শরতের সব গাছের মাঝ থেকে এক দীপ্তি এসে পড়ছে। ধানক্ষেতগুলো শুকিয়ে গেছে, উঁচু পাহাড়িমতো পায়ে-চলা পথে শুকনো ধানগাছের উপর দিয়ে তাই হেঁটে যাওয়া যায়, পথ ক্রমশ কাদা থেকে ধুলোয় বদলে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে সামাজিকতা থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি কিছু বই বেঁধে নিয়ে সাইকেলে করে একটি ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পড়াশুনা করার আশায় ভাগ্যকে সাথী করে বেরিয়ে পড়ি যেখানে বিস্মিত দর্শকের দল দৃশ্যত শূন্য মাঠ থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে না। তারা দাঁড়িয়ে কেবল তাকিয়ে থাকে যেন আমি খেলার মাঠে বেশ অদ্ভুত কোন জানোয়ার, কিন্তু আমি কখনও পশুর অনুত্তেজিত ঘৃণা নিয়ে তাদের উপেক্ষা করতে পারিনি। একবার এমন একটি ভ্রমণের সময় তেজগাঁ ছাড়িয়ে টঙ্গি রোডের দিকে ঘুরে ভুলে একটি সামরিক ছাউনিতে চলে গিয়েছিলাম আর কর্তব্যরত সেন্ট্রির হাতে বন্দি হয়েছিলাম। আমাদের দুজনের জন্যই সেটা ছিল বিব্রতকর মুহূর্ত। আমি উর্দু জানি না, আর যে সামান্য ক'টি বাংলা প্রবচন আমি শিখেছি তার কোন মানেই নেই ওর কাছে। ওর কাছে যে-নির্দেশাবলী আছে তার মধ্যে সাইকেলে ঘুরে-বেড়ানো মেমসাহেবদের ব্যাপারে কিছু নেই, আর আমার দখলে যেসব কাগজ প্রমাণ হিসেবে আছে, সেগুলো প্রথম বর্ষের ছাত্রদের লেখা ওথেলো সম্পর্কিত রচনা, যা কিনা ও যতই পরীক্ষা করতে লাগল ততই ওর কাছে সন্দেহজনক হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে আমাকে বড় রাস্তায় পাঠিয়ে দেয়ার চেয়ে ভালো কিছু ও করতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার দশ মাইল দূরে টঙ্গিতে একটি নদী আছে উঁচু পাড়ঘেরা আর আছে বিশাল একটি সেতু যা বছরখানেক আগে ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে, কিন্তু মেরামত করা হয়নি ; এখন একটি পঙ্গু ফেরিতে পারাপারের কাজ চলছে আর দূরের দিকে একটি মাটির পথ দারুণ রোমাঞ্চকর ভাবে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। একবার-দুবার যখন ঢালু তীরে বসেছিলাম আমি, তখনও দুটো প্রাণীকে দেখেছি, ডলফিনের মতো দেখতে, নদীর পানিতে লাফালাফি করতে, একটি আরেকটিকে পিছু ধাওয়া করতে, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর খানিকক্ষণ পর একেবারে অন্য একটি জায়গা থেকে ভেসে উঠতে। শিকদারকে যখন সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছিলাম ও বলেছিল ওর নাম 'শিশুক'। বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ওরাই আমার দেখা সবচেয়ে বড় প্রাণী, কারণ আমি জঙ্গল জীবনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম না যে কালো চিতা বা হরিণদের দেখতে পাব। বাড়িতে কখনও একটি বেজি খাপছাড়াভাবে বাগানের এদিক- সেদিক ঘুরে বেড়াত আর ছোট্ট ছোট্ট ধূসর কাঠবেড়ালী, যেগুলোকে গেছো ইঁদুর বলা শ্রেয় মনে হয়, গাছের রোদালো দিকে রোদ পোহাত, নয়ত পথের উপর দিয়ে পাখিদের মতো আলতোভাবে চলে যেত, কখনও খোলা জানালা গলে ঘরে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিত। মাথা থেকে ধূসর লেজ পর্যন্ত তিনটা টানা কালো ডোরা ছিল ওদের গায়ে। আমার এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুর মতে, এগুলো হচ্ছে রামের আঙুলের দাগ। রাম যখন সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কা অব্দি তাঁর সেতুটি তৈরি করছিলেন তখন কাঠবেড়ালী তাঁকে সাহায্য করতে এল, ছোট দুমুঠো মাটি সেতুটির ভিত শক্ত করার জন্য ছড়িয়ে দিল, গাঢ় প্রেমময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল আর ভগবান নত হয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কাশ্মীরি ছাত্র ঘৃণার সঙ্গে এই গল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। ও বলেছিল, রাম অবশ্যই কাল দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ আর্য। শহরের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন বাঁদর ছিল না। তবে অন্যদিকে বাঁদর এত বেশি ছিল যে, রীতিমতো উৎপাত করত। একজন প্রভাষক আমাকে জানাল বাঁদরের একটি ছোট দল তার বাবার কাজের মেয়েটি যখন উঠোন দিয়ে একপাত্র ভাত নিয়ে যাচ্ছিল তখন ওঁত পেতে ছিল ওকে আক্রমণ করার জন্য ; দুটো বাঁদর ওর হাত চেপে ধরেছিল, অন্যগুলো খাবার কেড়ে নিয়েছিল। কারারক্ষীরা ওদেরকে লাফিয়ে গাছে উঠে পর্যন্ত তাড়া করেছে, যখন বাঁদরগুলো গাছের উপর খাবার ভাগ করে খাচ্ছিল।

এত রকমের পাখি ছিল যে, সবগুলোর নাম আমি শিখতেই পারিনি। চতুর ময়না আর আরও চতুর কাকদের পাশাপাশি বাগানে ছিল ছোট্ট উচ্ছল হাসিখুশি একটি পাখি। আমি যদি শূন্যে ছোট্ট এক টুকরো কেক ছুড়ে দিতাম একটি কাক উল্টোভাবে নিচু হয়ে উড়ন্ত অবস্থাতেই সেটা ধরে ফেলত। আর বেড়ালটা রেগেমেগে ব্যাপারটা দেখত, ও ভাবত কেকটা ওরই প্রাপ্য! দুজনেই তখন দুজনের দিকে তাকিয়ে একসাথে গালাগালি করত নিজেদের ভাষায় এবং ঠিকই ওরা পরস্পরের ভাষা বুঝতেও পারত। মাঠে সব ধরনের, সব আকারের জলচর পাখি ছিল, আর ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে ভেসে-যাওয়া ঈগল, বাজ, চিল আর টাকমাথা বড় শকুন। তবে সবচাইতে বীভৎস দৃশ্য সম্ভবত যখন হঠাৎ কোন পথের বাঁকে আপনি দেখতে পাবেন কোন সদ্যমৃত প্রাণীর নাড়িভুঁড়ির ওপর লোভী শকুনের দল তাদের কাঁচা লাল মাথা আর গলা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু শূন্যে ওরা উড়ে যায় দারুণ আত্মবিশ্বাসে অলস পাখায় ভর করে যেন স্বর্গের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলে যাচ্ছে অনায়াসে, অথবা কখনও স্কেট চ্যাম্পিয়নের মতো পঞ্চাশ মাইল গতিতে বা ত্রিমাত্রিক ছন্দে বৃত্তাকারে ভেসে যেতে থাকে। মনে পড়ে একবার খোলা জানালা দিয়ে ওদের একটি দলকে দেখেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়ানো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ছাদে। নিশ্চল শান্ত, স্থির হয়ে ওরা বসেছিল, কেবল মাঝে মাঝে একটি দুটি পাখা উড়ছিল বা ঘাড় ঘুরাচ্ছিল ; চূড়োর দেয়ালে বসা একটি শকুন উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রাঙ্গণের ওপর ওর বিশাল পাখাটি বিছিয়ে দিল। সেটা ছিল একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, কারণ, বলা হয় যে, ওরা আসন্ন মৃত্যুর গন্ধ বয়ে আনে আর কোন জায়গায় ওরা জড়ো হয় মৃতদেহের লোভেই।

সবচাইতে অদ্ভুত ছিল সরীসৃপের জগৎটি। সাপ আমি খুব কমই দেখেছি, আর একবার যেটি দেখেছিলাম, সেটি সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল। রাতের খাবারের পর আমরা যখন ঘরে ঢুকেছি তখন ছোট কালো নমনীয় জিনিসটি চাবুকের মত এঁকেবেঁকে চলে গেল বসার ঘর দিয়ে। যে-ছাত্রটি রাতের খাবারের জন্য রয়ে গিয়েছিল দ্রুত একটি ভারী চেয়ারের পা দিয়ে ওটাকে আঘাত করল, আর আব্দুল ওটাকে পুড়িয়ে ফেলল। আরও মজার হচ্ছে টিকটিকিগুলো ঘরের ভেতরে দেখা যেত। ছোট্ট ছোট্ট টিকটিকিগুলো খুদে ড্রাগন যেন, একটি তর্জনীর সমান লম্বা, দেয়াল আর ছাদে ধীরপায়ে মাছিগুলোকে ধরে খেত। একমাত্র ডিমের ব্যাপারটি ছাড়া নিজেদের ভেতরেও ওরা খুব অসামাজিক ছিল, কিন্তু সম্পত্তির দখলের ব্যাপারে ওরা ছিল ভয়ংকর আর কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে সম্ভব হলে ওরা দেয়ালের ওপরেই, যেখানে ওদের সম্পত্তি রাখা আছে, সেখানেই মেরে ফেলে দেবে। মাঝে মাঝে যদিও ওরা তার লেজটা কামড়ে নিত, সেটি আবার না গজানো পর্যন্ত পোকাটার চলাফেরায় ভারসাম্য রাখতে অসুবিধা হত। আর নতুন-গজানো লেজটা শরীরের বাকি অংশ থেকে আরেকটু গাঢ় রঙের হত। অনেকটা যেন উল্টো মাথায় সুন্দরভাবে বসে-যাওয়া গাধার টুপি।

বাইরে সব ধরনের সরীসৃপই দেখা যেত, কতগুলো বেশ উজ্জ্বল রঙের, কতগুলোকে যে পাথরের ওপরে ওরা রোদ পোহাত তার থেকে আলাদাই করা যেত না। সবচাইতে সুন্দর দেখতে ছিল একজোড়া আদিম চেহারার ঝুঁটিওলা দৈত্য। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, যেগুলো একটি গর্তের মধ্যে কর্কশ শব্দে গড়িয়ে যেত। ছাত্ররা আমায় বলেছে ওগুলোকে মাঝে মাঝে চামড়ার জন্য শিকার করা হয়। ওদেরকে তাড়া করলে মারাত্মক কামড় দিতে পারে কিন্তু কিছু না বললে খুবই নিরীহ, আর যেহেতু ওরা সাপের ডিম খেয়ে বাঁচে ওদেরকে অতিথির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাগতই জানানো হয়। সবচাইতে অদ্ভুত যেটি সেটিকে আমি কখনও দেখতেই পাইনি যদিও মনে হয় এক ফুটেরও কম দূরত্ব থেকে ওর গলা শোনা গেছে। পাতার ফাঁকে অথবা ছাদের নালিতে লুকিয়ে ঠিক প্রতি বিশ মিনিট পরপর সে কর্কশ একটি চিৎকার দেবে 'তক্ষক'! ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনির মতো বারবার করে কখনও তিনবার কখনও চারবার কখনও আর বেশি কিন্তু নয়বারের বেশি নয়। কোন টেলিফোনের বাজনাও এভাবে কথাবার্তার মাঝে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না এবং বিশেষত যখন লেকচার রুমের ছাদের কোথাও নিজেকে লুকিয়ে ও ডাকত, আর ঠিক সময়ানুযায়ী ওর জিবকে বিশ মিনিটের বিরতি দিত। আমি কেবল কোনরকমে সেই কটি মন্তব্যকে হজম করে যেতাম।

মানবিক সমাজের প্রাচুর্য ছিল। প্রতিবেশী শিক্ষকরা আসতেন আমার কিছু লাগবে কি না খোঁজ নিতে; পাশের বাসাতেই রেজিস্ট্রার সাহেব থাকতেন যিনি যে-কোন সমস্যায় তাঁর পরামর্শ নেয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতেন। তাঁর উপদেশের মূল কথাটি ছিল 'আমি যখন লন্ডনে পড়াশুনো করেছি তখন এটা শিখেছি।' বলতেন 'বিদেশে কিছু জিনিস তুমি সহজেই শিখতে পারো, টাকা-পয়সা, আচার-আচরণ, কীভাবে চলতে হবে, কিন্তু লোকেদেরকে সহজে জানতে পারবে না। দেশের মতো তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না, বুঝতে পারবে না তারা যা বলছে সত্যিই তা-ই বোঝাচ্ছে, নাকি এর মধ্যে কোনো ফাঁকি আছে।' কথাগুলোর ভেতরে অনেকটা সত্য আছে এবং এবারে আমি বুঝতে পারলাম লন্ডনে একজন সহজ-সরল গেঁয়ো ভারতীয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলো যে বোকা বলে বিপদে পড়েনি, পড়েছিল এ-কারণে যে ওর বুদ্ধি দিয়ে ও বুঝে উঠতে পারছিল না নীরবতার অর্থ কী, অথবা নম্র বিনয়ী কথার সঙ্গে সিরিয়াস কথাগুলোর পার্থক্য কোথায়, কীভাবে কোনটা নিতে হবে। ইংরেজ সরকারি আমলাদের কাছ থেকেও দাওয়াত আসত, যাঁরা তাঁদের জীবনের অর্ধেকটা এদেশে কাটিয়ে শিগ্‌গিরই দেশে ফিরে যাবেন। তাঁরা সবাই ফর্স্টার বা অরওয়েলের উপন্যাসের ধারার লোক নন, বরং তাঁরা তখনও সেখানে ছিলেন কারণ তাঁরা তাঁদের পাকিস্তানি সহকর্মীদের সাথে খুব ভালভাবে কাজ করেছেন, এই দেশকে সত্যি পছন্দ করেছেন, এর প্রাথমিক সংকটময় সময়ে এর সেবা করতে চান। তাঁরা আমার চাইতে অনেক বেশি জানতেন, যা আমি কখনোই জানতে পারব না। কিন্তু আমি যা জানতে শুরু করেছি, তরুণ পাকিস্তানিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পূর্বসংস্কার—এগুলো ছিল অন্য ধরনের জ্ঞানের অন্তর্গত, যা ছিল তাদের কর্মক্ষেত্রে নিতান্তই গুরুত্বহীন।

এইসব কমবেশি প্রথাগত, পদমর্যাদাসংশ্লিষ্ট সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছাড়াও আমি চারপাশে গড়ে তুলেছিলাম রকমারি লোকের একটি নিজস্ব সামাজিক বৃত্ত, যারা মাঝে মাঝে আসত আর সহজেই মন খুলে কথা বলত। শিকদার এক আত্মীয়কে নিয়ে এল, যে ম্যাট্রিক পাশ করে একটি বাণিজ্যিক স্কুলে পড়ত, আর নিবিষ্টভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার টাইপরাইটারে ওর শিক্ষার চর্চা করে যেত। সঙ্গী হিসেবে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল একেবারেই চুপচাপ, কিন্তু কোন শ্রোতা না থাকলে ওর ইংরেজিটা ঝালিয়ে নিতে পছন্দ করত। একদিন একটি সাধারণ লোককাহিনীর বই বাড়ি নিয়ে পড়বে বলে ধার চাইল। আমি অ্যানিম্যাল্ ফার্ম-এর মতো বই ছাড়া ইংল্যান্ড থেকে আর কোন লোককাহিনীর বই আনিনি। সেটাই একটু সন্দেহের সঙ্গে ওকে দিলাম। ঠিক কাজটিই করেছিলাম। সে খুব ভালোভাবেই এর ভেতরের রাজনৈতিক অর্থটা ধরতে পারল। কিন্তু তাতে গল্পটার মজা পেতে ওর কোন বাধা ছিল না, যেমন করে বাচ্চারা গালিভারস ট্রাভেলস উপভোগ করে। মুরশিদ বাংলোয় অনেকটা সময় কাটাত পড়াশুনো করে ; ওর সাথে কথা বলাটা ভারি মজার ব্যাপার ছিল এবং যখন আমরা দুজনেই ব্যস্ত সহজেই সেটাকে মানিয়েও নিতে পারত। ওর একটি ভালো ডিগ্রি ছিল আর পরিকল্পনা করছিল গবেষণা করার, কিন্তু শিগ্‌গিরই ও বিভাগের একটি শূন্য প্রভাষক পদে নিযুক্তি পেয়ে গেল। মুনীর হাসিখুশি একটি ঝোড়ো বাতাসের মতো মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হত, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করত আর সেইসব পুলিশের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত দেখা-সাক্ষাতের অদ্ভুত সব গল্প বলত যারা ইতোমধ্যেই একজন সম্ভাব্য মারাত্মক বামপন্থী হিসেবে ওর ওপরে চোখ রাখছে। এক সন্ধ্যায় শামসুল হুদা পরিচয় দিয়ে একজন তরুণ এলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, যাঁকে এম এ পরীক্ষার জন্য কিছুটা শিক্ষাদান প্রয়োজন। সেখানে উপস্থিত একজন হিন্দু প্রভাষক তাঁকে পুরনো ছাত্র বলে চিনতে পারলেন। জানালেন ওঁর মহানুভবতায় এবং দারুণ করা চালে তাঁর পরিবার দাঙ্গার সময়টা পার করতে পেরেছে।

AMARBOI.COM

এটাই পরিচয়পত্র হিসেবে যথেষ্ট ছিল, আমরা কাজে লেগে গেলাম। ঢাকায় ক'বছর আগে হুদা ইরেজিতে সম্মান নিয়েছিল কিন্তু অর্থাভাবে পড়তে পারেনি। এখন সে একটি দ্বিতীয় শ্রেণী এম এ'র জন্য চেষ্টা করছে, তা হলে বিদ্যালয় ছেড়ে কলেজের আরও উদার পরিবেশে যেতে পারবে। কিন্তু ঝুঁকিটা খুব বেশি। যে-লোক একবার ফেল করেছে দ্বিতীয়-তৃতীয়বার আবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তৃতীয় বিভাগ একটি অনপনেয় কালিমা যা কিনা তার আশাগুলোকে চিরকালের মতো শেষ করে দেয়। ও দুবার পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু দুবারই তৃতীয় বিভাগের ভীতিকর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার জন্য একটি পুরো পেপারে খারাপ করে অকৃতকার্যতা নিশ্চিত করেছে। সুতরাং ওর পুরো ভবিষ্যৎটা এবারের শেষ চেষ্টার ওপর নির্ভর করছিল। ও দ্বিতীয় বিভাগ পেল, খুব সীমিত সময়ের বীরোচিত পরিশ্রমে আর কলেজের চাকরিটাও সে পেয়ে গেল যেটা ওর কর্মের রূপরেখার মধ্যেই ছিল। সপ্তাহে দুই তিনদিন ও আসত এবং যে-ই আসত তার সঙ্গে কথা বলত অনেক রাত পর্যন্ত।

এরা এবং আরও দুএকজন ছিলেন প্রায় নিয়মিত অতিথি। আমি সচেতনভাবে তাদের পছন্দ করে বেছে নিইনি। ডজন ডজন লোক আসত, ছাত্র, পুরনো ছাত্র, তরুণ শিক্ষক, আমি তাদের মতামত শুনতে পছন্দ করতাম, খুঁজে দেখার চেষ্টা করতাম তাদের কী বিষয়ে কৌতূহল, আর যারা এটা পছন্দ করত বারবার আসত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার ঐতিহ্যের এটি একটি অংশ যে ছাত্ররা এমন সহজেই শিক্ষকের বাড়ির ভেতরে বাইরে যাবে এবং যদিও ইদানীংকালে এটি কমে গেছে, কারণ দ্রব্যের উচ্চমূল্য আতিথেয়তার মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিয়েছে কিন্তু সম্পর্কের বন্ধুভাবটা রয়ে গেছে। আমার লাভ হয়েছিল যে, দ্রুততার সঙ্গে অব্যার্থভাবে তারা আমাকে পথ বাতলে দিত, দোভাষী হিসেবে কাজ করত, শহরে কী ঘটছে জানাত,তবু তার চাইতেও বেশি, আলোচনা যখন তুঙ্গে উঠত তখন মতামতের তপ্ত বিনিময় থেকে আমি অনেক বেশি জানতে পারতাম যা কিনা প্রশাসনিক কমিটি থেকে জানা সম্ভব হত না।

এক শনিবারে, মনে হয় অক্টোবরের শেষদিকে হবে, শামসুল হুদা, আমাকে, মুরশিদকে এবং অন্য আরও দুজনকে নদীতে বনভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। স্থানসংকুলান হয় এমন কিন্তু জবরজং একটি গ্রাম্য নৌকায়, যার অগ্রভাগে একজন মাঝি বসে বিশাল একটি বৈঠা দিয়ে সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধেটা ছিল মেঘহীন, আমরা শহর ছেড়ে গেলাম, ধানক্ষেত আর তালগাছের সারি ছাড়িয়ে ভেসে গেলাম নদীতে। যেন আগুন লেগেছে, আকাশ গাঢ় কমলা রঙের ছটায় ভরে যাচ্ছে। প্রাইমাস স্টোভে যখন মুরগি রান্না হচ্ছে, আমরা তীর ঘেঁষে ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম।

তীরের একশো গজের মধ্যে একটি বাগানের ভেতরে একসারি মাটির কুটির, কিন্তু একটি মহিলা ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না ; খালিপায়ে, সময়ের ভারে কুঞ্চিত মুখ,জীর্ণ শাড়িপরা মহিলাটি থেমে খুব আগ্রহের সাথে কথা বলল ঐ গ্রামটির দিকে নির্দেশ করে। হুদা আমাকে বুঝিয়ে দিল, শহুরে পোশাকে নৌকোর কাছে আমাদের দেখে ও ভেবেছে আমরা নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আসা উদ্বাস্তু তাই যদি আমরা রাতে ওর কুটিরে থাকি আমাদের ভালো করে যত্ন নিয়ে রাখবে আশ্বাস দিচ্ছে। যখন হুদা বুঝিয়ে বলল যে, আমরা আসলে পিকনিক করতে এসেছি ঢাকা থেকে, মহিলাটি স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময় করে 'সালামালাইকুম' বলে বিদায় নিয়ে সোজা নদীর দিকে নেমে গেল, সেখানে সে কোমরপানিতে দাঁড়িয়ে মাথায় পানি ঢালতে লাগল সারাদিনের তাপ আর পরিশ্রম ধুয়ে ফেলার জন্য। সূর্যের আলোয় ওর চারপাশের ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো চিকচিক করতে লাগল।

সেটা ছিল শুক্রবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি। রোববারের বদলে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হয়েছে, আমি সারাদিন বাসায় বসে কিছু কাজ করছিলাম। মাঝে সামান্য কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে। আবদুল রাতের খাবার টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেছে। দশটার ঠিক আগে প্রতিবেশী, এবং আমার মতোই নবাগত একটি কলেজের অধ্যাপক, জনাব ও বেগম জেরনিক এলেন, নাচের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে, খবরটা নিয়ে 'মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে মারা হয়েছে।' এই পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তা হলো, চারটি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, তিনি তক্ষুনি মারা গেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (একটি চরমপন্থী হিন্দুদল) এ ব্যাপারে দায়ী বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পৃথিবীতে এর চেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটেছে বলে ভাবা যায় না। যখন এই নগ্ন সত্যটা আমার বোধে পৌঁছাল তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'তাঁকে ছাড়া আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে বাঁচতে শিখব', এর পরেরটা হলো— তাঁর এই মৃত্যু আসন্ন ভয়ংকর মহাজাগতিক কোন সর্বনাশের পূর্বলক্ষণ। এবং তারপর— যখন যুক্তি আবার ফিরে আসতে শুরু করল, তখন মনে হলো যদি আমরা শান্তির প্রতি তাঁর অনমনীয় আকাঙ্ক্ষার, যতটুকুই আমাদের ভেতরে আছে, সেইটুকুকে আহ্বান না জানিয়ে এইসব ভাবনায় নিজেদের ভাসিয়ে দিই তা হলে নিশ্চিতই সে সর্বনাশ ঘটে যাবে। এর বেশি আমি আর কিছুই জানতে পারিনি যখন মুরশিদ ও তার আর একজন বন্ধু একই খবর নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে এল। ওরা আরও বিস্তারিত জানার জন্য রেডিও শুনছিল, এবং শুনছিল, কম্পিত কণ্ঠে জওহারলাল নেহরু ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখনও আমি নিজেকে সামলে নিতে পারিনি। আমরা অনুমান করতে শুরু করলাম। মুরশিদ মনে করছিল একাত্ম আবেগের প্রথম ঝড়টা কেটে গেলে ভারতীয় কংগ্রেস নিশ্চিতই ভেঙে পড়বে। ঐসব দ্বন্দ্বপূর্ণ মতামতগুলোকে আর কেউই এমন একতাবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। আর ভালো করে বিচার-বিশ্লেষণ করে ও বলল : যদি তিনি আগস্টে মারা যেতেন, মুসলিমরা যেভাবেই হোক তাঁকেই সাম্প্রদায়িক বিবাদের জন্য দায়ী করত। কিন্তু এখন তাঁর কলকাতা অনশনের ঘটনা অনেকের মধ্যে আস্থা জমিয়েছে, তাঁর সদ্যসমাপ্ত দিল্লি অনশন বাকিদের মধ্যে আস্থা এনেছে যে, তিনি সর্বান্তকরণে ভারতকে তাদের জন্য নিরাপদ করে তুলতে চান। তিনি যেমন তাদের জন্য আমরণ অনশন করেছিলেন- তেমনি তাদেরই জন্য মারা গেলেন, কারণ তাদের ওপরে অতিসাম্প্রতিক আক্রমণগুলোর প্রতি তাঁর ঘৃণাই তাঁর হত্যাকাণ্ডকে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু আমরা কেউই এমন কোন উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে পারছিলাম না, হারানোর ব্যথায় আমরা এমন শোকাচ্ছন্ন ছিলাম যে এইসব অনুমানগুলোকে খুব তুচ্ছ মনে হতে লাগল।

সকালে আবদুলও খবরটির পুনরাবৃত্তি করল।

রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণত উদাসীন, তাকেও মনে হলো খুব গভীরভাবে আন্দোলিত; সে আবেগে একান্ত হয়ে কেবলি বলতে লাগল, 'ভালো লোক। খুব ভালো লোক।' স্বতঃস্ফূর্ত দুঃখের সাথে ঢাকা তাঁর মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল। ইউরোপীয়রা হয়ত তাঁর বাণীর ভুল বা শুদ্ধ দিকগুলো নিয়ে বিচার করবে, কিন্তু পুরো উপমহাদেশে তাঁকে এত ভালোবাসত সবাই, এত শ্রদ্ধা করত, এমনকি তাঁর বিরোধীপক্ষও, যে এখানে শোক ছাড়া কিছুই নেই। শনিবার ছিল শোকদিবস। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল, দোকান, অফিস বন্ধ ছিল, বেতার আর সংবাদপত্র সারাবিশ্বে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর খবরগুলো তুলে ধরল, ছোট ছোট দলে লোকেরা লাউড স্পীকারে অথবা শিক্ষিত লোকেদের জোরে জোরে পত্রিকা পড়া শুনছিল। কায়েদে আজম যেন একটু শীতলভাবে আর আনুষ্ঠানিকভাবে বললেন এবং পাকিস্তানে এই প্রথম আমি তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা শুনতে পেলাম মুসলিমদের কাছ থেকে : তাদের নন্দিত বীরোচিত ঔদার্য তিনি দেখাতে পারেননি। এটা কেবল শিক্ষিতদেরই প্রতিক্রিয়া ছিল না। কারণ মুনীর জানাল রাস্তার একদল লোকের কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেও সে এ ধরনের মন্তব্য ভেসে আসতে শুনেছে, 'তিনি আমার নেতা কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি মহত্ত্ব আশা করেছিলাম।'

বিকেলে হিন্দু ছাত্র সংসদের সচিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা সারাদিন উপবাস করেছে, আর সন্ধ্যায় একটি মুক্ত প্রার্থনাসভার আয়োজন করেছে। মহাত্মার নিজের রীতি অনুযায়ী সেখানে ভগবত গীতা থেকে পাঠ হবে, পাঠ হবে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মগ্রন্থ থেকেও। আমি কি গসপেল থেকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অংশটুকু পড়ব? কোন খ্রিস্টান গির্জার আমি কখনও সদস্য ছিলাম না। কিন্তু আমার মনে হলো যদিও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথেই এ অনুরোধটি করা হয়েছে, ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের বোধ থেকে, কিন্তু এটা হয়ত খ্রিস্টান সমাজকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। তাই আমি একটু পরীক্ষামূলক ভাবে বললাম যে, আমার মনে হয় মহাত্মা অন্য কারও চেয়ে নিজে মৃত্যু নিয়ে কম ভেবেছেন, বরং বেশি ভেবেছেন তাঁর বাণী নিয়ে, যেখানে খ্রিস্টের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। আমি কি মহাত্মার অনেক জানা খ্রিস্টের কিছু বাণী পড়তে পারি? আমি তাকে Sermon on the Mount দেখালাম। এটা তার কাছে নতুন ব্যাপার ছিল। সে একটু দেখে বলল, গান্ধীজি নিজে হলে এটাই পছন্দ করতেন। দয়া করে এটাই পড়ুন।

সেটি খুব মর্মস্পর্শী একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল, অল্প আলোয় হলঘরটি ভরে ছিল। কোন বক্তৃতা ছিল না, আবেগের উচ্ছ্বাস ছিল না, কেবল দীর্ঘ সংস্কৃত শ্লোক, আর চারটি ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ছিল।

* * *

ফেব্রুয়ারিতে বসন্তকাল শুরু হলো, কিন্তু পত্রহীন বৃক্ষের আর বিদায়ী গলন্ত তুষারের উত্তুরে পটভূমিতে নয়। শীত এখানে একটি ছোট ঋতু, রাতে একটি কম্বল যে-শীতে যথেষ্ট; সকালে স্যাঁতসেঁতে কুয়াশা, আর দুপুরগুলোতে ইংল্যান্ডের পূর্ণ গ্রীষ্মদিনের মতো, সূর্যালোক স্নান করার মতো অত গরম নয়, পাতার ফাঁকে বাতাসের হালকা শিরশিরানি। এখন কিছু-কিছু গাছের গুঁড়ি ঘিরে হলুদ পাতার ঘূর্ণি উড়ছে, অন্যগুলোতে বর্ণিল পুষ্পচ্ছটার ছুটোছুটি, সৌরভে আর নতুন পাখির গানে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ফেব্রুয়ারিতেই যেন ছাত্রদের সাথে সরকারের সমস্যা গজিয়ে ওঠার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা গেল, এর পর থেকে যা কিনা জীবনের একট প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সে-বিষয়ে পরে একটি অধ্যায়ে আমি লিখেছি; এখন যে-পটভূমিতে আমি ব্যাপারটিকে দেখেছি তারই বর্ণনা দেব। গ্রীষ্মের ঠিক আগে খোরশেদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এল কিছু কাগজপত্র নিয়ে যেগুলোতে অধ্যাপকের সই লাগবে। সে অর্থনীতিতে সম্মানের একজন ছাত্র যে ইংরেজিকে একটা সহায়ক বিষয় হিসেবে নিয়েছে। আমি ক্লাসে ওর চেহারা লক্ষ্য করেছিলাম, খুব বন্ধুভাবাপন্ন মুখটি, গায়ের রং হালকা, বেশ লম্বা, মুখভঙ্গিতে গভীর মনোযোগের প্রকাশের সাথে চোখেমুখে একটি কৌতুককর দীপ্তি ; কিন্তু আগে কখনও ওর সাথে কথা বলা হয়নি। আজ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব উচ্ছলতায় ভরে ছিল আর নিজের সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলল, মোটেও অহংকারের সঙ্গে নয়, বরং মনে করেছে আমি হয়ত ওর জীবনযাত্রার ধরনে কৌতূহলী হব।

নোয়াখালী জেলায় ওর বাবা একজন কৃষক, যে কিনা তার জমির যতটুকু সম্ভব তার প্রতিটি ইঞ্চি বিক্রি করেছে একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে। ওদের গ্রামে ও-ই একমাত্র ছেলে যে উচ্চবিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছে। 'আমি যদি তাদেরকে সাহায্য করতে গ্রামে ফিরে না যাই' ও বলল, 'তা হলে ওদের আরেকজন স্নাতক তৈরি করতে আরও বিশ বছর লেগে যাবে।' এবং 'আমি হয়ত শহরে একটা চমৎকার চাকরি পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু এইসব লোক সেখানেই রয়ে যাবে। তারা গ্রাম থেকে চলে যেতে পারে না, তারা অশিক্ষিত, আর তারা যদি ঢাকায় আসেও তা হলে কেবল চাকর হয়েই থাকতে হবে।' ছেলে হিসেবে সে মাঠে কাজ করেছে, মাইলের পর মাইল খালিপায়ে হেঁটে রোজ স্কুলে গেছে, ছিঁড়ে যাওয়ার ভয়ে স্যান্ডেল কাঁধে তুলে নিয়েছে যতক্ষণ না শহরে পৌঁছেছে। এখন ওর উচ্চাশা হল এম এ ডিগ্রি নেয়া, বাড়ির কাছাকাছি কোন কলেজের প্রভাষকের চাকরি নেয়া যেখানে থেকে ও গ্রামে সামাজিক ও শিক্ষা-সম্পর্কিত কাজে সাহায্য করতে পারবে। গ্রামের ক্রমবর্ধমান অভাব ও দারিদ্র্যের কথাও ও আমাকে বলল ; জানাল অল্পদিন আগে বিয়ে হয়েছে এমন এক লোক, ওর মায়ের কাছে ভাত ভেজানোর পানিটুকু চেয়ে নিয়েছিল, বলল কী করে এক বৃদ্ধা মহিলা, যার ছেলে সাগরে গেছে, চারদিন উপোস করে ছিল, এমনি আরও ঘটনা। আর বারবার আমাকে নিজের চোখে এসে এসব দেখে যেতে বলল। আমি বললাম যেতে পারলে আমি খুশি হব, তাই ও কথা দিল রোজার ছুটিতে বর্ষার সময়ে যখন নদীতে নৌকায় করে যাওয়াটা সহজ হবে তখন ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে আমাকে।

আমার রোজনামচায় লেখা আছে— "অনেক ছাত্র আজকাল আমার সঙ্গে দেখা করতে ও কথা বলতে আসে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে তাদের বিষয় তিনটি ভাগে বিভক্ত থাকে— রাজনীতি, তাদের আত্মা (ধর্মীয় ব্যাপারের চেয়ে শৈল্পিক দিক) এবং তাদের জীবিকা। এই ছেলেটি লোকদের দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলছে।" জুলাইয়ের একুশ তারিখের সন্ধ্যায় আমরা রওনা দিলাম। গ্রামে খাবারের অভাব তাই আবদুল সুটকেসে দুটো রুটি, দুধের টিন, পনির আর জ্যাম ভরে দিল। আমরা একটি আন্তদেশীয় ট্রেনের ইন্টারক্লাসে উঠলাম, খুব বেশি ভিড় ছিল না। গাড়িটা চমৎকার ছায়া-ছায়া একটা দেশের ভেতর দিয়ে চলছিল। ভাঙাভাঙা নরম মেঘ, জ্যোৎস্না-আলোকিত রাত, জায়গটা বেশির ভাগই পানির নিচে আর ভেতর থেকে ধানক্ষেত, নারকেল গাছ ভাসমান দেখা যাচ্ছে, কিছু ঠেলাগাড়ি ভেসে আছে আর কিছু ঘর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দ্বীপের মতো, অন্ধকারে সবই প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে-সেখানে রান্নার জন্য আগুন আর খোলা পানিতে জেলে নৌকায় বাতি জ্বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরবেলা আমরা সোনাইমুড়ি পৌঁছলাম। খালের পাড়ে বিরাট মাঠের মাঝে ছোট্ট একটি স্টেশন, সেখান থেকে গ্রাম্য নৌকায় আরও আট মাইল, কখনও খালের ধার দিয়ে, কখনও বন্যায় ডোবা ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে। আমি খুব ভোরের প্রশান্ত জলযাত্রার আশায় ছিলাম আর প্রশান্ত নিশ্চয়ই ছিল সেটি কারণ আমি এমন ঘুমিয়েছিলাম যে, সূর্যের আলোর ছটায় খোরশেদের বাবার বাড়ির ঘাটে পৌঁছুনোর আগে টেরই পাইনি। বোঝা গেল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার খবর দেয়া চিঠি এখনও পথে। কিন্তু ওরা সেই সংকট কাটিয়ে স্বাগত জানানোর জন্যে আমার চারপাশে ভিড় জমাল। যদিও ওরা কেউ ইংরেজি বলতে পারে না, কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগল আর আমাকে নারকেলের পানি দিয়ে আপ্যায়ন করল।

খড়ে-ছাওয়া বাঁশের বৈঠকখানা ঘরে খোরশেদ আমায় একটি আস্তানা করে দিল একটি কাঠের বিছানা, চেয়ার আর টেবিল দিয়ে। বাঁশ আর নারকেলের ঝাড়ের ভেতরে এটা একটি চমৎকার জায়গা। সামনে একটি পুকুর যেখানে রাতে জোনাকিরা জটিল নাচের জাল বোনে। পাশেই ও নিজের বিছানাটা বিছাল পাহারা দেবার জন্য আর আমি সকাল থেকে ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওখানে বসে সালিশ করে যেতে লাগলাম। গ্রামের স্মৃতিতে— প্রায় দুশো বছর ফিরে দেখলে আমিই প্রথম ইউরোপিয়ান সেখানে গিয়েছি ; এটা এত দূরে যে একজন জেলা প্রশাসকের পক্ষেও যাওয়া সম্ভব নয়। আবার যেহেতু আমি একজন মহিলা, মহিলারা তাদের চরিত্র নষ্ট না করে (ছেলেদের সময় ছাড়া অন্য সময়ে) আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারত। লোকেরা আসতেই লাগল, আসতেই লাগল, কেবল বৃষ্টির সময় আর যাদের নৌকা রাখার মতো সচ্ছলতা ছিল না, তারা ছাড়া, দশ মাইলের মধ্যে সবাই এল। খোরশেদ যখন দেখল যে ওদের আসা আর বন্ধ হচ্ছে না, তখন ও আমার বিছানাটার চারপাশে একটি পর্দা টানিয়ে দিল যাতে আমি দর্শনীয় হয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওদের পেছন দিয়ে চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো হামা দিয়ে ঘুমানোর বাক্সটায় উঠে একটু বিশ্রাম নিতে পারি। তখনও ছোট কুঁড়েঘরটি বাচ্চা আর মহিলায় ভর্তি। আমি বাইরে গেলে বাচ্চারা পিছু পিছু আসত, খোরশেদ প্রতিবাদ করায় একটি ছোট ছেলে বলেছিল, 'আমাদের তাড়িয়ে দিও না। উনি চলে গেলে একটি অচেনা পাখিও আর এই গাঁয়ে আসবে না।' আমাদের পরিকল্পনার দুটো দিন আমি খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মত কাটালাম, কিন্তু তাই যথেষ্ট হলো।

'আমি জানি না দারিদ্র্য না বন্ধুত্ব, কোনটা বেশি ছিল', আমার রোজনামচা বলছে। সরু সরু পা, পেটফোলা শিশু আর নিজেকে ঢাকার মতো যথেষ্ট কাপড় পর্যন্ত নেই এমন সব মহিলাদের দেখে খুব কষ্ট হত। একটি মেয়েকে তার স্বামী কেবল খেতে দিতে পারে না বলে ছেড়ে দিয়েছে। সে চলে গেছে, মেয়েটিকে গ্রামের লোকেদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে। তাদের কিছু না থাকলেও একজন আরেকজনকে উপোস করতে দেয় না। খোরশেদ আমাকে আরেকটি মেয়ের কথা বলেছিল বেশ আগে যার এমনটি হয়েছিল : সে একটু ধনী একটি বাড়িতে চাকরানীর কাজ করত। আট বছর পর ওর স্বামী ফিরে এলে মেয়েটি তাকে গ্রহণ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলায় একটি ভয়াবহ রকমের টিউমার নিয়ে এক বৃদ্ধা এসে এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে ধরল। সে ভেবেছে আমি কোন পবিত্র ঋষি, আর আমি যদি ওর গ্লাসের পানিতে তাকাই আমি বলতে পারব কী করে ও ভালো হবে। হয়ত এক বছর আগে হলে কোন ডাক্তার সেকথা বলতে পারত কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়।

দুজন বিধবা, পর্দায় অত কড়াকাড়িভাবে ঘেরা নয়, আট মাইল হেঁটে আমাকে দেখতে এসেছিল। তারা জানতে চাইল আমি যখন বুড়ো হব, কী হবে আমার। আমি বললাম, হয়ত আমি একা থাকব, কিন্তু আমার বন্ধুরা থাকবে, আমার অনেক বন্ধুর বাচ্চাও থাকবে।

('আর আপনার ছাত্ররা আপনার সবচাইতে বড় বন্ধু হবে', খোরশেদ বলল, 'শিক্ষক হওয়ার সেটাই সবচাইতে ভাল দিক')। তারা ব্যাপারটায় খুশি হলো না। স্বামী ও সন্তান ছাড়া, আমি পৃথিবীতে আমার দায়িত্ব পুরো করছি না, ঈশ্বরের প্রতিও নয়।

গ্রামে একজন বৃদ্ধ ছিলেন—খোরশেদের চাচা, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন। যিনি ইংরেজি বলতে পারেন না, তবু বলা যায় এই পার্থিববোধ সম্পন্ন একজন লোক। আমার প্রতি তাঁর আচরণ এটুকু পরিষ্কার করে দিল যে তিনি আমাকে একজন মানুষ হিসেবে ভেবেছেন, কোন আশ্চর্য অদ্ভুত অপচ্ছায়া নয়। একজন নাবিক ছিলেন, যিনি নিউইয়র্ক ও লন্ডনে গেছেন : তিনিও ইংরেজি বলতে পারেন না, কিন্তু আমার কথার উত্তর দিতে পারতেন, যেমন, ইংল্যান্ডে লোকেরা বিদ্যুতের সাহায্যে দ্রুত রান্না করতে পারে... । আর একজন ছিলেন যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মায় যুদ্ধ করেছেন, আর একজন বৃদ্ধ হাজী ছিলেন যিনি সে-বছর গ্রীষ্মে মক্কায় তীর্থ করে এসেছেন। এছাড়া কেউ আর কখনও বাইরের পৃথিবীর কিছু জানতে পারেনি।

গ্রামটি পুরোপুরি মুসলিম—ভূস্বামীটি একজন অনুপস্থিত হিন্দু— যিনি অন্তত আরও একটি গ্রামের মালিক এবং কোনরকম সাহায্য না করে বছরে তাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। তার দালাল খাজনার ব্যাপারে খুবই কঠিন। বছরখানেক বা দুবছর আগে, খোরশেদ জানাল যে, যাদের খাজনা বাকি পড়েছিল তাদেরকে শীতের রাতে থুতনি পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। ওর নিজের পরিবারকে রাতের পর রাত তাদের গবাদিপশু পাহারা দিতে হয়েছে যাতে খোঁয়াড়ে ভরে না দেয়।

একটি বিদ্যালয় আছে যেটি মাত্র ম্যাট্রিকের মানে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। একটি ছেলে এ-বছর ম্যাট্রিক দিয়েছে। জন আগামীবারে দেবে বলে পড়াশুনা করছে। কিন্তু কারওই আর বেশিদুর যাবার সুযোগ নেই। কী সুন্দর জায়গাটা, বিস্মৃতি, দারিদ্র্য সব নিয়েও। আমি সূর্যাস্তের ঠিক পরে ঐ পুকুরের পাড়ে বসেছিলাম, খোরশেদ এবং আরও চারজন লোক একসারিতে দাঁড়িয়ে তাদের সান্ধ্য প্রার্থনা করছিল সুর করে, জোনাকিরা নেচে বেড়াচ্ছিল। কোন পাথরের বাড়িও এই মাটি আর বাঁশের তৈরি কুটিরগুলোর পার্থিব শান্তি স্নিগ্ধতায় পূর্ণ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ফিরতি যাত্রাটা ছিল দুই গ্রাম ঘুরে নৌকায় চড়ে একটি আনুষ্ঠানিক মিছিল। আমরা নামলাম আর আমাদের একটি কুঁড়েঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে অ-শে-ষ নারী আর শিশুরা ভেসে আসতেই লাগল যতক্ষণ না আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম এরা কী করে এতজন ঢুকতে পারছে। প্রতিটি পরিবারই একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত, আর খোরশেদ যদি কাউকে ঢুকতে না দেয়, তা হলে তাদেরকে খুব অপমান করা হবে। যদিও ওরা রমযানের উপোস করছিল, আমাকে জোর করে— চা, ওমলেট আর নারকেল খেতে দিল আর চলে আসার সময় আমাকে দাঁড়িয়ে জোরে সালাম জানাতে হলো, যখন মহিলারা নৌকোটা শেষবার দেখার জন্য কাদার মধ্য দিয়েই ছুটছিলেন। আমার উপস্থিতিটুকুই গ্রামে একটি আলোড়ন ছিল, তবু এর ভেতর থেকেও গ্রামের স্বাভাবিক সাধারণ কিছু ব্যাপার আমার নজরে এল। আমার কাছে ভাবতেও অসম্ভব মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে এত দূরে একটি জায়গায় জন্মানো আর বড় হওয়া, অথবা সেই তরুণটিকে দায়ী করা মনেপ্রাণে, যে এখান থেকে চলে যেতে চায়। সেইসঙ্গে এর মাঝেই শহুরে সংস্কৃতিতে হারিয়ে যাওয়া একটা সজীব প্রাণবন্ত সৌন্দর্যকে দেখতে পাওয়াও সস্তা ভাবাবেগ বলে মনে হল না।

কিন্তু সমস্ত কবি ও দার্শনিকদের প্রশংসা সত্ত্বেও এবং তাড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো এমন প্রচণ্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও মানবসমাজ যখনই পেরেছে গ্রাম থেকে শহরে ছুটে গেছে কোন এক অমোঘ চুম্বকাকর্ষণে। সুতরাং তারা নিশ্চয়ই সেই অনুপম করুণা ছাড়াও আরও অন্য কিছুর অন্বেষণে রয়েছে।

যদিও খোরশেদের সাহায্য ছাড়া আমি খোরশেদের মা-বাবার সাথে কথা বলতে পারতাম না, আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি। তাঁদের আচরণ ও উপস্থিতি একটি সরল সোজা ভালোত্বের প্রকাশ ঘটাত, যা অতি দরিদ্রদের মধ্যে দুর্লভ, যা আয় ও জ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্যকে অর্থহীন করে তোলে। তারা তাদের বাড়িতে আমার নিয়মিত গ্রামীণ আবাস গড়ে তোলার আমন্ত্রণ জানালেন। এবং আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি যে আমি আমার অন্য ছুটিগুলোতে যা করেছি কোনটাই কি এই অভিজ্ঞতার সাথে বিনিময়যোগ্য? কোন মূল্যেই কি এই অভিজ্ঞতাকে হারানো যেত? এর সমস্ত নগ্ন দারিদ্র্য নিয়েও জায়গাটি ছিল হৃদয়তাড়িত সৌন্দর্য ও শান্তিতে পূর্ণ এবং সেই গ্রামের জীবনে উষ্ণতা হচ্ছে প্রকৃতির একটি দান। আমি মনে করি এখানে আমি সভ্যতার অন্যান্য উপকরণ ছাড়াও সপ্তাহের পর সপ্তাহ মনের তৃপ্তিতে বাস করতে পারব। পার্থিব দিক থেকে এমন কিছু পাব যা ওদের চাইতে উঁচুতে আমায় নিয়ে যাবে, তবে তাদেরকে অপমানিত করার মতো এত উঁচুতে নয়। বারবার এখানে আসার কথা ভেবেছি যাতে আমি আর ওদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকব না। ভাষাশিক্ষা ও এই জীবনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন সব ভাবনা যা কিনা পৃথিবী থেকে সরিয়েই দেয়া হয়েছে— ভাবতেই খুব লোভনীয় ছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হওয়ার মানে বারবার বা নিয়মিত এখানে আসা। আর ছুটিতো আরও নানাভাবে কাটানোর উপায় আছে : আমি চেয়েছিলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট টাকা জমাতে পারলে আমি নিউজিল্যান্ডে মাকে দেখতে যাব, আবার ইংল্যান্ডে বেড়াতে যাব, হিমালয়, অজন্তা আর দক্ষিণের মন্দিরগুলো দেখতে যাব। নিজেই নিজেকে এসব সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সত্যগুলো বললাম। যাহোক, তার চাইতেও বেশি, আমি এমন দুর্বিষহ অভাবের মধ্যে বাস করতে খুব ভয় পেতাম, যথেষ্ট আভিজাত্যের এই জ্ঞানটুকু নিয়ে, যে, এর অনেকটাই হয়ত বিমোচন করা যায়, কিন্তু সেই বিমোচনের যোগ্যতা আমার নেই। এর জাজ্বল্যমান উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওষুধ বা চিকিৎসার জ্ঞান, অথবা সেই সহজাত বাস্তববোধ ও ক্ষমতা যা নিয়ে অনেকে জন্মায়। আমি একটি কাজ ভালো করে পারি— তা হলো ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো এবং আমি ওটাই করে যেতে চাই, মাঝে মাঝে একথা মনে পড়িয়ে না দিয়ে যে এটা আমাদের এই পৃথিবীতে এমনই একটি আত্মতুষ্টি দেখানো পেশা যা কিনা একজন পোশাকহীন ব্যক্তিকে লেসের কলার বানিয়ে দেয়ার মতো।

খোরশেদ যেমন বলেছিল, সেখানকার একজন কেউ যদি শহরে ভাল চাকরি পেয়ে চলেও যায়, বাকি ঐসব লোক সেখানেই রয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে কিংবা অন্যখানেও, যারা, যে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এবং যদি তাদের দারিদ্র্যকে ভাগ করে নেয়া কোন প্রতিকার না হয়ে থাকে তা হলে এর দৃষ্টিসীমার বাইরে বাস করাও শ্রেয় কিছু নয়। আমি দেখলাম পৃথিবীর সমস্যাগুলো সমাধান করার মতো একক মানসিক ক্ষমতা আমার নেই।

এই বেড়ানোটা খোরশেদের সাথে একটি স্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা করল। পরে সে আমাকে বলেছে যে, তার বাবা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের জিজ্ঞেস করে গ্রামের একটি ইতিহাস সে দাড় করাতে চেয়েছিল। ওর প্র-প্র-প্রপিতামহ কয়েক মাইল দূরের এক হিন্দু গ্রাম থেকে এখানে এসেছিলেন, তাদের সহধর্মীদের সাথে থাকতে। তখন এখানে মাত্র চারটি পরিবার ছিল, যাদের তুলো, ধান এবং চারণভূমি করার মতো যথেষ্ট জমি ছিল। ওর প্রপ্রপিতামহ ও প্রপিতামহের খাবার জন্য যথেষ্ট খাবার ছিল, তারা কেবলমাত্র একটি কটিবস্ত্র পরতেন এবং একটি শাল, যাকে চাদর বলা হয়, শীতে নিজেদের তা-ই দিয়ে জড়াতেন এবং ওর প্রপিতামহী নিজের ও পরিবারের সবার জন্য কাপড় বুনতে পারতেন। এখন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধানের জন্যই সমস্ত জমি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এবং তারা নিজেদের খাবার ও খাজনা দেয়ার মতো পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করতে পারছে না। একটি শার্ট ও লুঙ্গি ছাড়া লোকেরা নিজেদের সম্মানজনকভাবে আচ্ছাদিত মনে করে না, কিন্তু সুতো পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, দেশ-বিভাগের পর যেন কঠিনতর। রাস্তার পাশে ঘুরে গবাদিপশুকে নিজের খাবার জোগাড় করতে হয়। গল্পটা খুবই চিরাচরিত নমুনার, কারণ এর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে গত শতবর্ষের বাংলার অনেক দুঃখ-দুদর্শার চিত্র। আমার কাছে এ যেন প্রিলিউডের নবম স্বর্গের বিস্তৃত ও হুবহু ব্যাখ্যা রচনা করে দিল, যেখানে হতোদ্যম এক বালিকা একটি ফরাসি গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যার কবজির সাথে একটি হাড়জিরজিরে গরু বাঁধা, যার সম্পর্কে বিউপাই বলছেন, 'এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধেই আমরা যুদ্ধ করছি।' পল্লীজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক দৃষ্টিপাতেই ছবিটা পড়ে ফেলেছিলেন; তাঁর কাছে ফরাসি বিপ্লব অর্থহীন মনে হয়েছিল যদি না তা হয়ে থাকে কৃষকের দ্বারা এবং কৃষকের জন্য।

যে-মুহূর্তে এমএ পরীক্ষা শেষ হলো, শামসুল হুদা আমাকে ওর সাথে কিছু পুরনো মুসলিম কবির কবিতা অনুবাদ করার জন্য রাজি করাল। বহুদিন ধরে ওর মাথায় এই ধারণাটা ছিল, ইসলামি জাতীয়তাবাদী বোধ থেকে নয়, বরং শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বসবাসরত দুই সম্প্রদায়ের ভেতরে পারস্পরিক সংস্কৃতির লেনদেন প্রমাণের উদ্দেশ্যে। হুদা বাংলায় একজন সুপণ্ডিত এবং সাধারণ কাজের জন্যে যথেষ্ট ভালো ইংরেজিজ্ঞানও তার আছে, কিন্তু তা কবিতার অনুবাদের জন্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও সঠিক নয়। ইংরেজি কবিতার ব্যাপারে আমার নিশ্চিত কিছু সুবিধা আছে কিন্তু আমি বাংলা ব্যাকরণ জানি না। সুতরাং আমরা দুজনের মিলিত সম্পদই কাজে লাগালাম। প্রথমে ও নিজের পছন্দের একটি কবিতা জোরে পড়ত, মূল বাংলায়, যাতে আমি এর ছন্দ বা সুরটা অনুভব করতে পারি, তারপর আঙ্গিক বা স্টাইল নির্বিশেষে আক্ষরিক অনুবাদ বলে যেত। আমি সেটাকে ছন্দায়িত করতাম, ও তখন টেনে নিয়ে ফলাফলটা দেখত। "এই জায়গায় আপনি একটি ভুল করেছেন।" "এখানে শব্দটি ভুল অনুভূতি প্রকাশ করছে— আরও রোমান্টিক কোন শব্দ কি পাওয়া যাবে?" — এভাবে বাগ্‌বিতণ্ডার ভেতর দিয়ে আমরা এগুতাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর মানে সঠিক আর আমার মানে রুচিসম্মত একটি ভাষ্য তৈরি হতো। ছন্দের ব্যাপারে আমরা কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতাম না, কখনও মুক্ত ছন্দ ব্যবহার করতাম। কখনও আমি মূল ছন্দের কাছাকাছি একটি সম্ভাব্য ছন্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে ইংরেজি উচ্চারণনির্ভর ছন্দে পরিবর্তন করার ফলে বাংলা সুরে একটি ঝাঁকুনি লাগে অথবা কখনও তা স্থূল একটি ব্যাঙ্গাত্মক অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি ঘটবে হোমারের দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিগুলোকে ইংরেজি ষষ্ঠপদীতে রূপান্তরের চেষ্টা করলে। চোদ্দ লাইনের স্তবকে বিভক্ত কিছু ভারতীয় গাঁথা আছে (Ballad), অনেকটা যেন টিউডর পদ্যকারদের মুরগি তাড়ানো ধপ ধপ শব্দের ছন্দের মত। কিন্তু শামসুল হুদা যখন সেটি বাংলায় পড়ল, আমি একটি নমনীয় পক্তির মতো সেটি যেন শুনতে পেলাম, অনুভূতির পরিবর্তনশীলতা সেখানে ক্রিয়াশীল, এবং দ্বিমাত্রিক ছন্দ থেকে গাথার ললিত সুরে রূপান্তর করে আমি ইংরেজিতে সেটিকে একটি ছন্দময় জীবন দেয়ার চেষ্টা করলাম। এটি হচ্ছে 'দিওয়ানে মদিনা' নামক গাঁথাকাব্য থেকে নেয়া, সেই কৃষক মেয়েটির বিলাপ তার স্বামীর জন্যে, যে তাকে ছেড়ে তালাক দিয়ে চলে গেছে অভিজাত জীবনের উপযোগী এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে।

হায় আমার পতি, নিঠুর হৃদয় অতি,
দূরে বসে কাঁদি তোমার তরে
ভেবে দেখ কি করে আনব জল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন তুমি কাটবে বসে খড়ে
দু'জনে একসাথে কাজ করেছি
কিন্তু আমি অভাগিনী নারী
এমন ভাল মানুষ মিথ্যা হয়ে গেল
এ জীবন কেমনে দেব পাড়ি?
Oh husband mine, O pitiless heart
I cry for you so far away
And think how I would draw the water
While you would mow the hay
We were mates together,
But I am a luckless wife.
So good a man fake to me
And how shall I live my life?

উত্তরের নিসর্গ, তার মূলভূমি— সেই উষ্ণ, মসৃণ জলাভূমির যতটা কাছাকাছি এ-ও যেন মূলের অতটাই কাছাকাছি। কিন্তু আর কী করেই বা একজনের আবেগ অন্যের ভাষায় প্রকাশ করা যায়? ছন্দের মধ্যে একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায় বটে, যেন কখনও বহুদিন আগে ভুলে-যাওয়া কোন অতীতে এই ভাষা দুটোর একই সঙ্গীত ও ছন্দ ছিল যা দিয়ে এদের চেনা যেত। কখনও কখনও শামসুল হুদার বলা গীতিকবিতার কোন প্রবচন হয়ত স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি সুরের তালের সাথে মিলে যেত, তার মূল বাংলা কবিতার তালে নয়, যদিও সুরটা আমার কানে লাগত এবং সেটাকে ধরে রাখাও যেত। আমি জানি না এমন এলোমেলোভাবে করা ভাষ্যগুলো কী করে মূলের বিশ্বস্ত অনুবাদ হয়ে উঠবে। বৈষম্যের বিস্তৃতি মাপতে পারার মতো এমন বাঙালি পণ্ডিত আমি কখনোই হতে পারিনি এবং পাঠকেরাও কখনও কখনও খুব রূঢ়ভাবে এইসব ত্রুটি তুলে ধরেছেন। আমার জন্যে ব্যাপারটা ছিল ব্যাকরণের ক্লান্তিকর নিয়মকানুনগুলো না শিখে বাংলা কবিতাকে আবিষ্কার করার এক গৌরবময় পন্থা।

আমরা শুরু করলাম পঞ্চদশ শতাব্দীর এক অজানা কবির সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনের ওপর গভীর উপলব্ধির উচ্চারণ দিয়ে আর শেষ করলাম নজরুল ইসলামের দুটো কবিতা দিয়ে, যে-কবি এখনও জীবিত শারীরিকভাবে, কিন্তু যাঁকে এখন মৃত মহৎ কবিদের হিসেবের মধ্যেই ধরা যায়। আমরা জীবিতদের নিয়ে কাজ করার সাহস পাইনি।

১৯৫১ সালে আমি ঢাকা ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত আমরা সামান্য বিরতি দিয়ে কাজটি করে যাচ্ছিলাম যদিও ব্যাপারটি তখন কঠিন হয়ে উঠছিল কারণ যার ওপরে এমন পরিশ্রমসাধ্য কাজটির আসল ভারটি পড়েছিল সেই শামসুল হুদা তখন দূরে এক কলেজে চাকরি করছে আর খুব ব্যস্তও ছিল। আমি ভারতে পাড়ি দেয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন ভারী পর্দা পড়ে গেল দু'দেশের মাঝখানে, যে, এক দেশ থেকে আরেকটি দেশ যেন ইংল্যান্ডের মতোই দূরে চলে গেল।

যে-মাটির গভীরে খুঁড়তে হবে আমরা যেন সে-মাটির ওপরে আঁচড় কাটছিলাম মাত্র। আমার মনে হলো গাঁথাগুলো (কেবল দুটো থেকে অংশবিশেষ আমরা নিয়েছিলাম) সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য উভয় দিক থেকেই স্কটিশ সীমান্ত-গাঁথার সাথে তুলনীয়। একই ধরনের বিষয়বস্তু, বিপর্যয়ের স্মৃতি, করুণ প্রেমের কাহিনী, তবে বাঙালি কবি তাঁর স্কটিশ সাথির মতো মিতভাষীর সংযম না দেখিয়ে নিজেকে দুঃখের উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে দেন। এক বাঙালি সহকর্মী একবার বলেছিলেন, স্কটিশ সীমান্ত-গাঁথায়, তাঁর ভাষায়, আবেগের যে দীনতা আছে তা তাঁকে হতাশ করেছে। বিপরীতে সেই কাব্যের পৌরুষদীপ্ত কাঠিন্যে অভ্যস্ত শ্রবণেন্দ্রীয় বাংলা গাঁথাকাব্যকে প্রকাশের আতিশয্যে অতি পল্লবিতও ভাবতে পারেন। কিন্তু আগে উদ্ধৃত আমার একটি চরণ 'So good a man fake to me' (এত ভালো মানুষটি আমার কাছে মিথ্যা হয়ে গেল) নিশ্চিত এর ভেতরেই ধারণ করছে প্রতিশোধ-নিস্পৃহ করুণ এক অনুমোদন যাকে বলা যায় দুর্বলতার বীরত্ব।

আরেকটি ধারা ছিল, আরেকটু রূঢ় বা অমার্জিত ধরনের লোকগাঁথা, যা এখনও খুব সক্রিয় ও সতেজ, যাকে বলা হয় 'পুঁথিসাহিত্য'। এই গোষ্ঠীকে পাকিস্তানী পণ্ডিতরাও এখন আর খুঁজে বের করতে পারবেন কি-না সন্দেহ। আমি এর অস্তিত্বের কথা জানতামই না। পুঁথিগুলো হচ্ছে গল্প, সাধারণ স্থূল ভাষায় পদ্যে রচিত গ্রাম্য মুসলিম-হৃদয়ের অবচেতন আত্মপ্রকাশ। হুদা আমাকে যেটা পড়ে শুনিয়েছিল, তা ছিল এক কফিনচোরের গল্প, ভক্তি ও পাপের এক আকর্ষণীয় মিশ্রণ যা কিনা 'Everlasting Mercy'-র চেয়েও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু অনুবাদ আমাকে পরাস্ত করল : জবরজং অপটু কাব্য থেকে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতা প্রায় অবিচ্ছেদ্য ছিল, এ দুটোকে একটি ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরের জন্য একজন বড় মাপের শিল্পী দরকার।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন একেবারে ভিন্ন ধরনের। তাঁরা খেলা করতেন হিন্দু গল্পের রাধাকে নিয়ে, যে ছিল একজন নববিবাহিত রানী। তার স্বামীর গবাদিপশুর পাল বাঁশি বাজিয়ে চরাত যে-কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধা মুগ্ধ ও মোহিত। মাঝে মাঝে নামগুলো ব্যবহার হত ইংরেজি Pseudo pastoral বা ছদ্ম চারণ কবিতার ঢঙে। যার মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সভাষদ-বন্দনাকে আড়াল করা, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নয়। আবার প্রায় সব মরমি গানে বা কাব্যে প্রেমিকের জন্যে প্রেমিকার আকুলতা আসলে ঈশ্বরের জন্য ভক্তের, এবং একই গল্প ব্যবহার হয় ধর্মীয় পরমানন্দের চরম প্রকাশের জন্য। ভাবের বিস্তার, কখনওবা চিত্রকল্পের প্রকৃত ধরন আশ্চর্যজনকভাবে ইংরেজি Metaphysicals-দের কবিতার সাথে মিলে যায়, যাঁরা তাঁদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু একই রকমভাবে প্রচণ্ড বৈপরীত্যও ছিল তাঁদের মধ্যে। আমার কাছে এই নতুন ধারণাটি একটি আঘাতের মতো ছিল যেখানে ঈশ্বরের জন্যে আত্মার আকুলতাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে একটি অস্বস্তিকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক— যদিও একটু লঘু অপরাধের ভেতর দিয়ে। আর রাধাও তার স্বামীর পরিবারের মহিলাদের মাঝে, যারা তার এই প্রেমকে অনুমোদন করে না, লজ্জায় নীরব কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশির সুরে অব্যক্ত যন্ত্রণায় পাগলপ্রায়। আর তখন কবি হয়ত রাধার হয়ে কথা বলেন, সেই বাঁশিটিই যেন সুর হয়ে ত্রিভুবনকে কখনও আন্দোলিত করছে, কখনও স্থির ধরে রাখছে। যেমন খ্রিস্টান প্রতীকবাদের জটিল সম্পর্কের মধ্যে একটি চিত্রকল্পের নিপুণ বুনন দেখতে পাওয়া যায় তেমনি এখানেও প্রাথমিক বাস্তবতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এখানে জালের বুননটা অন্যরকম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গল্পের উপস্থাপনায় মুসলিম কবিরা হিন্দু কবিদের থেকে কতটা ভিন্ন তা আমি সঠিক জানি না। এ ধারাটা মূলত হিন্দুদেরই সৃষ্টি। অবশ্যই এইসব তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনা এত সামান্য জ্ঞান থেকে উদ্ভূত যাকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। তবে এখানে একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র অপেক্ষা করছে এমন কারও জন্যে যে বাংলা ভাষার পাণ্ডিত্যের সাথে ইংরেজি কবিতার জ্ঞানকে বাদ্যযন্ত্রের নিপুণতায় মেলাতে পারবে।

আমাদের কিছু-কিছু প্রচেষ্টা ছাপা হয়েছিল, বেশির ভাগই New Values বা নতুন মূল্যবোধ বলে একটি জার্নালে। সেগুলো খুব সমাদৃত হয়েছিল যেমন হয়ে থাকে, একই সাথে বাংলা আবার ইসলামিক বলে। দেশ-বিভাগের পর যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল, প্রথম ক'মাসে যেমন হয়ে থাকে, তার ফলে। আমি জানতাম না যে সেই স্রোতে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমি খুব সরল মনেই এই অনুবাদের কাজে যোগ দিয়েছিলাম কারণ কাজটা আমি পছন্দ করেছিলাম। এমন নতুন এবং এমন চমৎকার কবিতাকে খুঁজে পাওয়া বা আবিষ্কার করা এবং সেটাকে ইংরেজি কবিতায় রূপান্তর করা দারুণ আনন্দদায়ক একটি বিনোদনের মতো ছিল, প্রশাসনিক সভাগুলোয় যাওয়া বা খাতা দেখার ক্লান্তিকর কাজের মাঝে। সেইসাথে বাংলা ভাষা আর বাংলা কবিতায় আগ্রহ দেখিয়ে আমি নিজেকে একটি তর্কের বিদ্রোহী দিকটায় ঠেলে দিচ্ছিলাম। আমি যদি ইকবাল পড়তে শুরু করতাম, আর উর্দু শিখতে চাইতাম, আমি নিশ্চিত যে সবার চোখে আমি শাসকগোষ্ঠীর মিত্র হিসেবেই ধরা দিতাম, সংঘর্ষটা কী নিয়ে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা করার আগেই। কোন ভবিষ্যৎচিন্তা না করে আমি আমার পছন্দ বেছে নিয়েছিলাম কিন্তু কোন প্রতিরোধও ছিল না। এটা উঠে এসেছিল একটি দেশের ও জনগণের সাথে সহমর্মিতার বোধ থেকে এবং এটা আমাকে বাঙালি ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে দেখতে শেখাল পূর্ব পাকিস্তানের ওপর যে বিপর্যয় নেমে আসছে সেটাকে। না, পাকিস্তানকে সংহত করতে চাইছিল যে-করাচি সরকার তার দৃষ্টি দিয়েও নয়, যে-ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এখানে বছরের পর বছর কাজ করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি দিয়েও নয়। এখানে আমি একজন দর্শক, অভিনেতা নই, কিন্তু তাই বলে এটাও অসম্ভব যে যুদ্ধরত লোকদের মাঝখানে কাজ করব অথচ কোন একটি দিকে সহানুভূতি বা সমর্থন থাকবে না।

'New Values' বা নতুন মূল্যবোধ পুরোটাই বলতে গেলে মুরশিদের সৃষ্টি : একটি ইংরেজি জার্নাল, প্রায় পাক্ষিক, যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে যে নতুন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটছে সেগুলোকে তুলে ধরা। আমার কাছে এখনও যেসব পুরনো সংখ্যা আছে তা থেকে আমার মনে হয় প্রথম থেকে পত্রিকাটির একটি উল্লেখযোগ্য ও সাহসী অভিযান ছিল। সময়টি একটি গুরুগম্ভীর সাময়িকী বের করার জন্য খুবই সঠিক ছিল কারণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বিদ্যমান পার্থক্যের কারণে হঠাৎ করেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে যেন নিজের পরিচয় ও নিজেকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার একটি পথ খোঁজা প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে পড়ল। তার মানে হলো ইংরেজিতে লেখা, যার অর্থ বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষ ভাষায়, ল্যাটিন ভাষা যেমন ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। কিন্তু একটি স্বতন্ত্র ধারার জার্নাল বের করার জন্যে একটি মন ও একটি উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন এবং মুরশিদ যদিও ভালো সহযোগী খুঁজে পেয়েছিল, বেশির ভাগ কাজ সে নিজেই করত। আমার মনে হলো 'New Values'-এ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত রেখেছিল, নির্ভুলভাবে সরকারের সমালোচনা করত, কিন্তু দলীয় অঙ্গীকার থেকে দূরে থাকত, এবং নিপীড়ন এড়ানোর মতো বিচক্ষণতার সাথে বিশেষ বিশেষ মন্তব্যগুলোও সাধারণ ও সার্বিকভাবে করত, যাতে কোনমতেই উস্কানিমূলক মনে না হয়। লেখার মান খুবই উন্নত ছিল। সেটাকে সে বজায় রাখত শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপারে; এবং পারস্পরিক প্রশংসার স্তর থেকে ওপরে থাকার চেষ্টা করত যা না হলে হয়ত পত্রিকাটি 'লিটল ম্যাগাজিন'-এ পরিণত হত। কোন বড় সৃষ্টিশীল ও বিশিষ্ট প্রতিভা হয়ত তারা লালন করার সুযোগ পায়নি কিন্তু সেখানে মেধা ছিল। 'New Values' একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার মান চালু করেছিল এবং সমুদ্রপারের ভালো কথিকাগুলোকে এদেশের বাঙালি চিন্তাভাবনার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছিল এবং অন্যান্য ইসলামি দেশ থেকেও ভালো লেখার অনুবাদ, আধুনিক লেখার সমালোচনা, আলোচনা, এগুলো তুলে ধরেছিল। বিশের কোঠায় যার বয়স এমন একজনের জন্যে এই অর্জন রীতিমতো উল্লেখযোগ্য এবং এই পত্রিকা সে-সময়কার ঢাকায় যে উদার মানসিক পরিবেশ ছিল তারও সাক্ষ্য দেয়। সেখানে হয়ত খুব বেশি বাঁধাধরা ছকবাঁধা কাজ ছিল, বেশির ভাগই হয়ত অর্থহীন ; প্রশাসন এমন হৃদয়হীনভাবে কাজ করছিল যাতে মাঝে মাঝে মনে হত অমঙ্গলজনক ; হয়ত বাতাসে নানা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য অশুভ গুজব ভেসে বেড়াত, আমার ডায়েরি সেইসব কথা ও আরও কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এমন কোন কিছুই বাঙালি-হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতাকে তৃপ্ত করতে পারেনি।

আমি সংক্ষেপে এই দেশ ও এর লোকদের আবিষ্কার করার ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছি যাতে বিবরণটায় মাঝে মাঝে বিরতি না পড়ে, কিন্তু আসলে এটা ছিল একটি চলমান প্রক্রিয়া, ক্রমবর্ধমান একটি আবহ, যেখানে অসম্ভব সব সমস্যার অসন্তোষজনক সমাধান হত, আর একটির পর একটি সংকট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে এলোমেলো করে দিত। কখনও কখনও আমার প্রতিক্রিয়া ছিল একটি দীর্ঘ অসহিষ্ণু আর্তনাদ। কিন্তু ছবিটাই মিথ্যে হয়ে যাবে যদি এই আর্তনাদের পেছনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অদম্য মোহনীয় মুগ্ধতা আছে সেকথা না বলি। মানবাকৃতিপূর্ণ বিচিত্র এক নিসর্গ থেকে ক্রমশ ছবিটা একটি দেশে রূপ নিচ্ছিল এক বিদেশির হৃদয়হরণ করার লক্ষ্যে। যতই আমি তাদেরকে বুঝতে পারছিলাম ততই অসম্ভব সব বাঙালি মূল্যবোধের জন্যে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল, এবং যত হতাশাই বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিক-না কেন, এটা জানতেই একটি আনন্দ ছিল যে সেখানে ছাত্ররা আছে আলো জ্বালাতে আর সহকর্মীরা আছেন যাঁদের সাথে কাজ করে আনন্দ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

প্রসঙ্গ : পরীক্ষা

তাত্ত্বিক দিক বিচার করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের দিকগুলোর উন্নতি সাধন করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশির ভাগ সময় ও কাজকর্ম পরিচালিত হয় পরীক্ষাগুলোকে সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে।

একজন ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। সেখানে সে তিন বছরের অনার্স অথবা দুই বছরের বি এ পাস কোর্সে ভর্তি হয়। তারপর অনার্স-পরবর্তী এক বছরের এম এ কোর্সে অথবা বি এ পাসের ছাত্ররা দুই বছরের এম এ কোর্স করে।

কোন একটি প্রশাসনিক কারণে, যদিও সেটা মনে করতে পারছি না, নভেম্বরের শুরুতে এম এ প্রথম পর্বের, জুলাইয়ে এম এ দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। লিখিত পরীক্ষার খাতাও দেখা হয়ে গিয়েছিল। উদ্বিগ্ন ছাত্ররা তখন মৌখিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার মতো আনকোরা নতুন অধ্যাপকের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা হলো তখনই, যখন দেখলাম এক সেট খাতা হারিয়ে গেছে। কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। খাতাগুলো পাঠানো হয়েছিল একজন পরীক্ষকের কাছে। তিনি তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে চীনে চলে গেছেন। খাতাগুলো যদি কূটনৈতিক ব্যাগে ঢুকে যায় তবে তাদের ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ বলে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীর ধারণা। আর আমরা যদি পরীক্ষার্থীদের আবার নতুন করে পরীক্ষা নিতে চাই, তারা নির্ঘাত বিদ্রোহ করে বসবে। আবার যদি এই পত্রের নম্বর ছাড়াই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করি তবে আইনের দিক থেকে অপরাধী হয়ে যাই, যে-কোন পরীক্ষার্থী সেজন্য চাইলে আদালতে কেস করতে পারবে। এখন একটিমাত্র বিকল্প খোলা রইল। সেটা একধরনের জালিয়াতিও বলা যায়—অন্য পত্রের নম্বর দেখে সব পরীক্ষার্থীকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি গড় নম্বর দেয়া এবং সেই বিরাট অপরাধটি আমাকেই করতে হবে দেখলাম। কারণ একদিন-না-একদিন একথা জানাজানি হবেই এবং তখন এমন একটি অপরাধ করার কারণে অন্য যে-কারও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমিই এদিক থেকে সবচাইতে নিরাপদ, অন্তত পালিয়ে চলে যাওয়ার মতো একটি জায়গা আমার রয়েছে। যাই হোক, যখন ঐ খাতগুলো ফিরে পওয়ার সব আশা জলাঞ্জলি দিয়েছি— সেই মুহূর্তে খাতাগুলো ফিরে এল।

পরবর্তী একজন সহকর্মী সেগুলো তাঁর পুরনো ড্রয়ার খুঁজে বের করলেন। হয়তো তিনি খাতাগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। অবশ্য খাতাগুলো দেখা হয়নি তখনও। এরপর থেকে আমরা সাবধান হয়ে গেলাম।

প্রতিটি পরীক্ষার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস থেকে বিভিন্ন জায়গায় খাতাগুলো চলে যায়। পোস্ট অফিসের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট, পরীক্ষকদের ভুলো মন—এগুলোর কি খবর ছিল তখন? নিশ্চয়ই সেগুলো একেবারেই উঠে যায়নি দেশ থেকে, মিলিয়ে যায়নি হাওয়ায়? জানি না সে-ধরনের ঘটনা ঘটলে আমি কী করতাম। আল্লাহ্‌র অসীম দয়া, আমার দায়িত্বে যে-পত্রটি ছিল, সেটির ব্যাপারে কখনও এমন হয়নি। কিন্তু আমার এক কলকাতার সহকর্মী আমাকে এ-ব্যাপারে দারুণ মজার একটি ঘটনা বলেছিলেন। তিনি যখন একবার পার্কের একটি গাছের নিচে বসে খাতা দেখছিলেন, তখন ২/১ মুহূর্তের জন্য খাতাটি গাছের নিচে রেখে তিনি চলে যান। দুই কি তিন মিনিট পরে ফিরে এসে দেখেন খাতাটি একটি গরু গলাধঃকরণ করে ফেলেছে। খাতাটিতে তখনও নম্বর দেয়া বাকি ছিল। ভদ্রলোক ছিলেন অত্যন্ত সৎ। তিনি সোজা গিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে ব্যাপারটি জানালেন, নিজের দোষও স্বীকার করলেন। তখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ-ধরনের দৈব দুর্বিপাকে পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রের নম্বরের একটি গড় নম্বর এই পত্রে সে পাবে। গরুটির এই দুষ্কর্ম অবশ্যই গোপন করা হয়েছিল, সেইসাথে পরীক্ষকটিরও। অবশ্য গরুটি তাঁকে ইতিমধ্যেই কর্তব্যে অবহেলার জন্য যথেষ্ট শাস্তি দিয়ে দিয়েছে।

সে-বছরে নভেম্বরের শুরুতে পরীক্ষার্থীরা একযোগে পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি জানাল। এরা এম এ প্রথম পর্বের পরীক্ষার্থী। তাদের যুক্তি ছিল, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলনের জন্য তাদের মন বিক্ষিপ্ত ছিল, তার ওপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য গ্রীষ্মে কিছুদিন ক্লাস স্থগিত ছিল, তাদের পরীক্ষা-প্রস্তুতির জন্য আরও সময় দরকার। হয়তো ওদের কিছু যুক্তি ঠিক ছিল, কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর তাদের দাবি মানতে রাজি ছিলেন না। একটি পরীক্ষা স্থগিত রাখা খুব একটি সহজ ব্যাপার নয় বটে। একটি কারণ হচ্ছে, সারা বছরই কোন-না-কোন পরীক্ষা চলতে থাকে। আরেকটি কারণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে দেরি হলে পরবর্তী কার্যক্রমেও বাধা পড়ে যায়। এমনি সময়ে একদিন সকালে ভাইস চ্যান্সেলর ও কালেক্টর (ইনি একজন ইংরেজ, যাঁর অবসর নেয়ার সময় খুব কাছেই) যখন কোন একটি বিষয় আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, কাউন্সিল-রুমে ছাত্ররা হঠাৎ তাঁদের ঘিরে ফেলে। ওঁরা প্রথমে টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাননি। পরে ওঁদেরকে তালাবন্ধ করে জানায় যে ওদের দাবি না মেনে নিলে তাঁদেরকে ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে তাঁরা ছাড়া পান। এই অভিনব পন্থায় আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। এমন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করা আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল। পরে ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ হাসান আমায় বুঝিয়েছিলেন, 'আমরা যদি পরীক্ষা নিতাম, বেশির ভাগ হয়ত পরীক্ষা বয়কট করত, কিন্তু কিছু ছাত্র দিত। পরীক্ষার হলে পুলিশ পাহারা দিয়ে হয়ত পরীক্ষা নেয়া যেত। কিন্তু ঢাকা শহরের পথেঘাটে আমরা নিশ্চয়ই তাদের নিরাপত্তা দিতে পারতাম না।'

কথাটি সত্যি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রক্তপাতও ঘটতে পারে আমি এ-ধরনের ভাবনায় অভ্যস্ত নই। সেইসাথে এও সত্য যে প্রথমবারের বিজয়ই শেষ নয়, আগামী বছরও এই একই দাবি উঠতে পারে। সত্যি বলতে কি দুবছরের মধ্যেই স্থগিত পরীক্ষাগুলো এমন এক ট্রাফিক জটের সৃষ্টি করল যে আমরা ভাবতে শুরু করলাম এক বছর কি সব পরীক্ষাই বাতিল করে দেব অথবা নতুন করে শুরু করার কিংবা গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড গরমেও ছুটি বাতিল করে ক্লাস নিয়ে সময়ের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেব। কিন্তু ততদিনে ডঃ হাসান তাঁর উত্তরসূরিকে সমস্যাটির ভার দিয়ে চলে গেছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়েরও ততদিনে শিক্ষার অগ্রগতির ভাবনা ছাড়া আরও কাজ, আরও ভাবনা জুটে গেছে।

দেশ-বিভাগের পর কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছোট্ট একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, নিজেই সে ডিগ্রি প্রদান করতে পারত। ঘনিষ্ঠ সংঘবদ্ধ জীবনধারা, ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকের সাথে ছাত্রের টিউটোরিয়াল কাজ, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহজ মধুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক—এই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও গর্ব। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল মাইল পাঁচেকের মধ্যে অবস্থিত ক'টি উচ্চমাধ্যমিক কলেজ। পূর্ববঙ্গের বেশির ভাগ শহরে কলেজগুলোতে বিএ ও বিএসসি পর্যায়ে পাঠ্যক্রম চালু ছিল। কিন্তু এ্যাদ্দিন যাবৎ সেগুলো ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কাজগুলো পরিচালিত হত। দেশ-বিভাগের পর স্বাভাবিকভাবেই এপারের সবগুলো কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে এল যার অর্থ গিয়ে দাঁড়াল যে, আমাদের নিজেদের ছাত্রদের ছাড়াও আমাদেরকে প্রায় কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষা নিতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ অন্য পাঠ্যসূচিতে। এসব পরীক্ষার কেন্দ্র থাকবে সারাদেশ জুড়ে।

এই বিশাল কাজ আমাদের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। আমাদের না আছে অত প্রশাসনিক কর্মচারী, না আছে অত জায়গা, না আছে অত কাগজপত্র রাখার মতো ব্যবস্থা। অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমাদের সংখ্যা তো খুব সীমিত। আবার অনেক ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পরীক্ষক নিযুক্ত হতেন, তাঁরা হয় দেশ ছেড়ে চলে গেছেন অথবা চলে যাবার ব্যবস্থা করছেন। তার ওপর দুটো পরীক্ষার মধ্যে মানের একটি সমতা রক্ষা করা খুব জরুরি। দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজ্যের এই ভাগাভাগির সাথে যেন আরও একটি অভিযোগ যোগ না হয়, সেদিকটাও দেখতে হবে খুব খেয়াল করে। (আর মান? একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক হয়ত ভাববেন, জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছানোর মান—কিন্তু একজন পরীক্ষার্থীর কাছে ও তার প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকের কাছেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর পাওয়াই 'মান'—সুতরাং দুটো কখনওই এক নয়)। বিজ্ঞান ও মানবিক, দুই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদেরকেই উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি নিতে হত। আর এটাই ছিল ওদের কাছে সবচাইতে কঠিন বিষয়। অন্য বিষয়গুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট কর্মশক্তি নিয়ে এই সমস্যাকে দেখতে ও তার সমাধান করতে হয়েছে।

প্রথমে প্রতিটি পত্রের জন্য প্রশ্নকর্তা ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে। মানের সমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কোর্স কমিটি আমাকে ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক ইংরেজির প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করেন। এই অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক শিখিয়েছে। তবে সবচাইতে বড় শিক্ষা বোধহয়—একাজ আর কোনদিন না করা। প্রশ্ন তৈরি করার জন্য দরকার আরও অভিজ্ঞ লোকের। ছাত্রদের যা শেখানো ও পড়ানো হয়েছে তারই ভিত্তিতে তাদের প্রশ্ন তৈরি করা উচিত। ইতোমধ্যেই ঢাকা বোর্ডের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা আমি করতে পেরেছি কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ও প্রশ্নপত্র থেকে ওঁরা যে ছাত্রদের কাছ থেকে কী ধরনের উত্তর আশা করেন তা ধারণাই করতে পারছিলাম না।

তারপর আসে প্রশ্নপত্র ছাপানোর সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন প্রেস নেই। আগে নির্ভর করত কলকাতার ওপর। এখন তা সম্ভব নয়। ঢাকার কোন ছাপাখানায় যদি ছাপানো হয় এবং যদি কেউ কোনক্রমে তা জেনে ফেলে, তবে অগ্রিম সেই প্রশ্ন বেচে দিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিতে পারে। অতএব একমাত্র বিকল্প রইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে সেগুলোকে সাইক্লোস্টাইল করা। আমিই ছিলাম একমাত্র বিভাগীয় প্রধান যে কিনা টাইপরাইটারও ব্যবহার করতে পারি আবার স্টেনসিলও কাটতে পারি। আমার সময়ও ছিল। সুতরাং আমি পুরোটা গ্রীষ্মের ছুটিতে ইংরেজি সব প্রশ্নপত্র টাইপ করতে রাজি হলাম। আরবি, দেবনাগরী, বাংলা, উচ্চতর গণিত—যেগুলো আমার পক্ষে বা মেশিনের পক্ষে কপি করা সম্ভব নয়, হাতে লিখে করতে হলো। মে মাসে কিপলিং-এর 'সাম্রাজ্যের স্তম্ভ'রা তাদের মেমসাহেবদের পাঠান পাহাড়ে আর নিজেরা ডেস্কে বসে ঘামতে থাকেন, গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকেন। আমি রোজ সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত রেজিস্ট্রার অফিসে কাজ করি। তাপমাত্রা তখন ১০৫° ফাঃ। ফ্যান চলে বলে প্রতিটি কাগজ ডেস্কে খুব ভালো করে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। শুধু তা-ই নয়, স্টেনসিল যাতে মুছে না যায়, তাই যথেষ্ট কায়দা করে মুখের ও হাতের ঘাম মুছতে হয়। নয়তো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ে এত কষ্টের কাজ নষ্ট করে দেবে। যখন রসায়নের ডাচ অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যে দ্বিতীয় ইউরোপিয়ান নাগরিকদ্বয় ছিলেন—দার্জিলিং রওনা হলেন, আমি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, আমি নিজেকে এই নতুন জলবায়ুতে অভ্যস্ত করে নিচ্ছি এবং সত্যিই হয়ত তা-ই। তাঁরা খুব সতেজ ও সজীব হয়ে ফিরে এলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়টা খুবই কষ্টে গেল। ঘামাচি, পেটের গোলমাল লেগেই রইল। আমার দুএকটি ফুসকুড়ি মতো উঠেই সেরে গেল। সারা গরমকালে আমি টুপি পরিনি, এক ফোঁটা কুইনিনও খাইনি এবং যতদিন ভারতবর্ষে ছিলাম এগুলোর প্রয়োজন পড়েনি। এবং যদিও হিমালয় পর্বতমালাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে, তারা আমার জন্য অপেক্ষা করতে কিছু মনে করেনি। আমার খুব খারাপ লাগত যদি আগের অধ্যায়ে বর্ণনা-করা সেই ঘটনাটির জায়গায়, মিরপুরে সেই সঙ্গীত উৎসবে জসীমুদ্দীনের সাথে না যেতে পারতাম।

আমি যদি পরিশ্রম করে থাকি তবে রেজিস্ট্রার সাহেব কঠোর পরিশ্রম করছিলেন। গোপনীয়তার স্বার্থে একেবারে অশিক্ষিত লোকদের দিয়ে স্টেনসিলের কাজ চালানো হত। দিনের পর দিন সে এই ডুপ্লিকেটর মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, নিশ্চিত করতে যে প্রতিটি কপির ১ম পৃষ্ঠার ঠিক ডানদিকেই ২য় পৃষ্ঠাটা যুক্ত হয়েছে। তারপর সেগুলো গুনে প্যাকেট করে, সিল করে এমনভাবে পাঠানো হত যাতে ঠিক সময়মতো সারা পূর্ব পাকিস্তানের কলেজগুলোতে চলে যায় অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে বাহকের মাধ্যমে। সে-বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন ঘটনাই ঘটেনি, কোন ভুল ছাপা হয়নি, কোন জায়গায় ছাত্রদের হাতে ভুল প্রশ্নপত্র বিলির ঘটনাও ঘটেনি।

এরপর আসে সহ-পরীক্ষকের নিযুক্তি, ঢাকা ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজির কলকাতার পত্রটির প্রতিটির জন্য ছিল তেত্রিশ জন পরীক্ষক। আমার জন্য যদিও সময়ের অপচয় হত তবু ব্যাপারটি শিক্ষণীয় ছিল কারণ বেশির ভাগ আবেদনকারীই, বিশেষ করে যারা তরুণ সবাই আমার সাথে দেখা করতে আসত। তাদের প্রত্যেকেরই আবেদনপত্র ফাইলে ছিল এবং কঠোরভাবে নিয়ম মেনে যোগ্যতা ও কর্মজীবনের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিযুক্তি হত, তবুও তারা এমন একটি ভাসাভাসা ধারণা নিয়ে আসত যে, হয়ত আমার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথোপকথন তাদের নিযুক্তির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে। ঘাম-ঝরানো পরিশ্রম যদিও ছিল, পরীক্ষা নেয়ার কাজটা লোভনীয় সুযোগের ছিল, সম্মান আর প্রধানত অর্থের কারণে। এক, দুই বা তিনশো টাকা অনেকের মাসিক বেতনের বেশি, হয়ত পরিবার নিয়ে বেড়িয়ে আসা যাবে, মেয়ে বা বোনের বিয়েতেও কিছু সাহায্য হবে, অথবা সচ্ছলতা ও ধারকর্জের মধ্যে পার্থক্য এনে দেবে। সুতরাং তালিকা তৈরি হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে থেকেই তারা ভোর ৬টা থেকে মধ্যরাতের যে-কোন সময়ে আসতে থাকলেন ; আর সাধারণত যাঁরা নিযুক্তি পেতেন তাঁরা খাতা জমা দিতে আসতেন, যদি পারতেন কথা বলে যেতেন। পূর্ববঙ্গে আমার ইংরেজি শিক্ষকতার ছবিটি তাঁরাই পূর্ণ করে দিয়েছিলেন এবং সেইসাথে ভারতের বাকি অংশেরও। এদের বেশির ভাগই ছিল খুব চমৎকার তরুণ যারা হতাশাব্যঞ্জক উদ্দীপনায় ভুগছিল। সাহিত্যের প্রতি প্রেমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে তারা ইংরেজিতে স্নাতক হওয়াকেই বেছে নিয়েছিল আর এম এ-তে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছিল যা ছিল কলেজে প্রভাষকের কাজ পাবার পাসপোর্ট কিন্তু তাদের কর্মজীবনের স্বপ্নরাজ্যের নয়। জ্যাকোবিয়ান নাট্যকারদের প্রতি তাদের নিষ্ঠা, বড় রোম্যান্টিক বা ইয়েটস ও এলিয়টের কবিতার প্রতি তাদের ভালোবাসার পদায়ন হবে কোন সুদূর স্থানে যেখানে একটি প্রাণীও তাদের আগ্রহ বা কৌতূহলের অংশীদার হবে না এবং তারা মুখোমুখি হবে জনসভার মতো প্রায় একশো'/ দেড়শো' ছাত্রের যারা আসলে কোন ইংরেজিই জানে না। কিন্তু নিজেদের গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হলে তাদেরকে জানাতেই হবে যে তারা ইংরেজি জানে।

ইংরেজি শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা কারওই দোষ নয়, গত বিশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ভারতে যা ঘটেছে এ হচ্ছে তারই উপজাত। তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে একটি ছেলে উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা রপ্ত করবে এবং ম্যাট্রিক পাশের সময়ে সে এই ভাষায় লিখতে, বলতে ও চিন্তা করতে শিখবে। হয়ত শতাব্দীর শুরুতে ব্যাপারটা সত্যিই ছিল যখন উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম ছিল এবং শিক্ষকেরা ছিলেন বেশির ভাগ ইংরেজ এবং যেসব ছেলে ছাত্র হয়ে আসত তাদের ঘরেই ইংরেজিশিক্ষার ঐতিহ্য ছিল ; ১৯৪৭-৪৮ সালে শহরের কিছু উচ্চ বিদ্যালয় ও কিছু মিশনস্কুলে যেখানে ভাষার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেখানে ইংরেজিই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম কিন্তু গণতন্ত্রের অংশ হলো শিক্ষার প্রসার এবং আজকাল উচ্চ বিদ্যালয় এমন সব জায়গাতেও আছে যেখানে শ্রেণীকক্ষের বাইরে ইংরেজি কোনদিন কেউ বলে না, ছাপার অক্ষরে দেখে না, শিক্ষকেরাও এত কম বেতনে চলতে বাধ্য হন যে, তাঁরা জাদুমন্ত্রের মতো করে অদ্ভুত সব ইংরেজি ব্যাকরণ বই থেকে ইংরেজি শেখান যার কোন মানে হয়ত লর্ড ম্যাকাওয়েই করতে পারবেন। অলৌকিক গূঢ় কোন রহস্যের কারণে (হাজার হোক, দেশটিকে তো কিছু ম্যাট্রিক পাশ লোক পেতেই হবে— কিছু ছেলেমেয়ের বেলায় এই মন্ত্রোচ্চারণ কাজ করে থাকে) তারা উচ্চমাধ্যমিক পড়ার ছাড়পত্র পায় এবং যেহেতু এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে স্নাতক কোর্স এবং যেহেতু সেখানে ইংরেজি পাঠ্যবই ছাড়া কোন বিষয়েই পড়া দুরূহ হয়ে পড়ে, ঐ পর্যায়ে যেতে যেতে ইংরেজি ভাষা তাদের কিছুটা আয়ত্তে আসে। প্রত্যেকেই জানে যে তারা আসলে তা করতে পারেনি, কিন্তু ছাপার অক্ষরে কেউই সে-কথা বলেনি, কিংবা পরীক্ষা নেয়ার সময় ব্যাপারটিকে আমল দেয়নি। পাঠ যাচাইয়ের একটি 'মান' ছিল এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই মানটি নামিয়ে আনার ব্যাপারে প্রথম হতে চায়নি। এসব তরুণকে পরবর্তী জাদুবিদ্যাটা রপ্ত করতে হয়। সঙ্গত কারণেই তারা তাদের পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে আর আমার সাথে তাদের কবি হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা সাহিত্য সমালোচক হবার উচ্চাশা নিয়েই কথা বলে।

প্রায় একশো বছরের পুরনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার শতবর্ষী রক্ষণশীলতা নিয়ে পাণ্ডিত্যের সেইসব নীতিমালাকে আঁকড়ে ধরেছিল যেগুলো তার যৌবনেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমান সমাদৃত ছিল। উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা ভাষা ও সাহিত্যের ওপরে প্রশ্নের উত্তর দিত। ভাষার পত্রটিতে, যেটার ভার সেই বছরে ছিল আমার ওপরে, একটি রচনা লেখা ছাড়াও একটি সারাংশ ও ইংরেজিতে অসম্ভব একটি চিঠি লিখতে হত। তার ওপর ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্রের রহস্য তাদেরকে উন্মোচন করতে হত। সাহিত্যে তারা পড়ত শেক্সপীয়রের একটি রচনা, কিছু কবিতার সংকলন, গদ্যের কিছু নমুনা যার মধ্যে থাকতে পারে একাঙ্কিকা, কিছু আধুনিক ছোটগল্প, ল্যাম্ব থেকে রবার্টলিন্ড পর্যন্ত লেখকদের রচনা। প্রশ্ন পত্রটাকে মনে হত জ্ঞানের যুদ্ধের জন্যে সাজানো সৈন্যরাজি। পাশ নম্বর ছিল একশোতে চল্লিশ। আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ ছাত্র এই নম্বর না পায় তা হলে স্নাতক কোর্সে ভর্তিযোগ্য ছাত্রের অভাবে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় থমকে দাঁড়াবে। সুতরাং যদি পরীক্ষকরা খুব সচেতনভাবে নম্বর দেন, যেমনটি সাধারণত ঘটে, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বিপর্যয় এড়াতেন বিশেষ সভা ডেকে, পাশ নম্বরের কাছাকাছি মাত্রায় নম্বর পাওয়া সবাইকে ' গ্রেস নম্বর' দিয়ে। এটা অনেক সুলভ ও সহজ ছিল। অন্তত আরও শিক্ষক নিয়োগ করে ও তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অসম্ভব কিছু করানোর চেয়ে এবং ছাত্ররা যা শিখছে সত্যি সত্যি, তার চাইতে কম যোগ্যতা চাইবার চেয়ে এটাই কম লজ্জাজনক ব্যবস্থা।

আগস্টে, বর্ষার ছুটিতে, নম্বর দেয়ার ভয়াবহ কাজটি শুরু হলো। উচ্চমাধ্যমিকের সাধারণ ইংরেজির মতো বহুলপঠিত বিষয়টির জন্য একটি মানসম্মত ব্যবস্থা ছিল যেটা আমরা অনুসরণ করতাম। প্রথমত যেইমাত্র সব কেন্দ্র থেকে খাতা আসা শেষ হত এবং তিনশো খাতার এক-একটি প্যাকেটে সেগুলোকে বাঁধা হত, সব শিক্ষকদের একটি সভা ডাকা হত। এখানে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল যদিও পূর্ব পাকিস্তানের মতো বিশাল এলাকায় কারো কারো জন্য ২ দিনের পর্যন্ত পথযাত্রা হত বাসে, নৌকায় বা ট্রেনে। প্রধান পরীক্ষকের সভাপতিত্বে প্রশ্নের প্রতিটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হত, সম্ভাব্য ভুল- বোঝাবুঝির দুষ্কর্মের কথা চিন্তা করে শাস্তিও নির্ধারণ করা হত। কখনও কখনও যুক্তি তর্ক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হত, সভাপতিকে খুব কৌশলী ও দৃঢ় হতে হত একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের ভেতরে সর্বসম্মত নীতি নির্ধারণ করতে। তারপর প্রতি পরীক্ষককে তাঁর খাতার বাণ্ডিল দেয়া হত, তিনি তক্ষুনি পাঁচটি খাতা দেখে এবং দেখিয়ে বাকিগুলো বাড়ি নিয়ে যেতেন।

প্রধান পরীক্ষককে দ্রুততম গতিতে এইসব নমুনাপত্রগুলো দেখতে হত, মান মিলিয়ে নিতে হত, এবং তাঁর দলের প্রত্যেককে আলাদা করে লিখতে হত— 'দয়া করে আরও একটু উদার' বা 'আরও কঠোর হন' '৪(a) নং প্রশ্নে', বা মনে রাখবেন `X' নম্বরের বেশি সংশোধন -অযোগ্য বানান ভুলের জন্য কাটবেন না, 'ঠিক আছে, দেখে যান'। তাঁরা দেখে যেতে থাকেন এবং খাতা ফেরত দিয়ে যান, সপ্তাহে একশোটার মতো সম্ভাব্য হারে, সেইসাথে তাঁর সমস্যা-সম্পর্কিত নোট দিয়ে, পাশের প্রান্তসীমায় নম্বর পাওয়া বা প্রথম বিভাগের উল্লেখসহ। প্রধান পরীক্ষক প্রতি পরীক্ষকের খাতার অন্তত ৫% ভাগ পড়তেন বা আরও বেশি, যদি তিনি নম্বরবণ্টনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি না হন, এভাবে পুরো দলটিকে একটি মানে রাখবেন। নম্বর-দেয়া খাতাগুলো তিনি নিযুক্ত নীরিক্ষকের কাছে পাঠাবেন, ভালো করে দেখার জন্য, হিসাবে ভুল বা দেখার ভুল হয়েছে কি না। কখনও পরীক্ষার্থীরা একটা প্রশ্নের লেজটা হয়ত লেখে মাঝখানে, কয়েকটা উত্তর লেখার পর আবার মনে করে, বা দুটো বিকল্প প্রশ্নের উত্তর দেয় যখন একটি দেয়ার কথা, অথবা কয়েকটি পৃষ্ঠা ছেড়ে শেষের আগের পৃষ্ঠায় একটি উত্তর লিখে বসে। এই ধরনের যে-কোন ভুল, যা হয়ত ঝিমুনি-ধরা পরীক্ষকের নজর এড়িয়ে গেছে নীরিক্ষা করে দেখা হত এবং পুনর্মূল্যায়নের জন্য তার কাছে পাঠানো হত। যদি পরীক্ষক পাগল হয়ে যান, মারা যান বা নিখোঁজ হয়ে যান সীমান্তে, বা অন্য কোনভাবে নিজেকে নিষ্কর্ম করে রাখেন, প্রধান পরীক্ষক তক্ষুনি পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে (এক্ষেত্রে আমি ছিলাম দুইই) জানাবেন, যিনি তাঁর বিকল্প একজনকে খুঁজে বের করবেন।

পদ্ধতিটি দুটো মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চালিত হত— ত্বরিতগতি ও ন্যায়পরায়ণতা। নতুন শিক্ষাবর্ষ চালু করতে হলে ত্বরিতগতির প্রয়োজন হবে। কারণ উচ্চ মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট ছাড়া একজন ছাত্র স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। ন্যায়পরায়ণতা ছাত্রদের জন্য সব জায়গাতেই প্রয়োজন। বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে, যেখানে শিক্ষা হচ্ছে অনেক লোকের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক চাকরির জন্য প্রতিযোগিতা। তারা তাদের শিক্ষার অন্তর্নিহিত মূল্যের কথা ভাবতে পারে না, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ একটি পরীক্ষাব্যবস্থা যেখানে নম্বরের জন্যে কোনো দুর্নীতি চলবে না— এমন কিছুর জন্য খুবই আগ্রহী থাকে। সুতরাং ব্যাপার যতটা যান্ত্রিক করা সম্ভব তা-ই করা হয় এবং একজন পরীক্ষক আরেকজন পরীক্ষক থেকে আলাদা না হতে পারেন এমন ব্যক্তিগত মূল্যায়নকে যত কম প্রশ্রয় দেয়া যায়, দেয়া হয়। তার ফলে যদি বুদ্ধি ও মেধার যেসব গুণের মূল্যায়ন ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন, তা এই যন্ত্রের ফাঁক গলে হারিয়ে যায়, তার জন্য কিছুই করার থাকে না।

এই কাজের পদক্ষেপটিই একটি চাপ। আমার নিজের জন্য বলতে পারি, অন্য কোন কাজ না থাকলে আমি সপ্তাহে একশো উচ্চমাধ্যমিক খাতা দেখতে পারব, কিন্তু তারপর মনোযোগ অখণ্ড রাখা খুব কঠিন। যেমন ঘটে মাঝে মাঝে, খাতাগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখতে হয়, তার মানে দিন শুরু করতে হয়, পড়ানোর জন্য ছেদ দিতে হয়, বিকেলে আবার দেখতে বসে রাতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়া পর্যন্ত দেখতে হয়। স্নায়ুগুলো অবসন্ন হয়ে আসে, মেজাজ একেবারে প্রান্তসীমায় এবং শেষ পর্যন্ত বানান আর ব্যাকরণ ছাড়া কোন দিকে চোখ রাখাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। এভাবে পরীক্ষা যত বড় হয়, ততই চিন্তান্বিত মনে ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দেয়া কঠিন হয়ে ওঠে। এমনকি একজন স্ব-ভাষীলোকও মুখস্থ করা উত্তরসহ খাতা যত সহজে কম ভুল করে দেখেন, সতেজ ও নিজস্ব চিন্তাধারা প্রতিফলিত খাতা তত সহজে পারেন না এবং একটি ছাত্র বা ছাত্রী অন্য একটি ভাষায় নিজের চিন্তা প্রকাশে দুঃসাহসী হলে ব্যর্থ হবার ঝুঁকিও বেশিই নিয়ে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়মতো নম্বর পাঠানোর জন্য প্রধান পরীক্ষক রেজিস্ট্রারের কাছে দায়ী থাকেন। বুদ্ধি ও মেধার বিচারে ন্যায়পরায়ণতা বা সততার জন্য তিনি নিজে নিজের কাছে দায়ী থাকেন। যখনি তিনি কোন খাতাকে পুনর্মূল্যায়নের জন্য ফেরত দেন তার সময় নষ্ট হয়। যেহেতু কাজগুলো সব সময়মতো তাঁর কাছে আসে না, এ-ধরনের ছোটখাটো সংকট লেগেই থাকে, তিন বা চার সপ্তাহ পরে তাঁর মাথা-খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়।

গাদাগাদা খাতা যন্ত্রণাদায়কভাবে স্তূপাকার করে একটা তালাবদ্ধ ঘরে রাখতে হবে। আমি ছাড়া একমাত্র যে-ব্যক্তিটি সেখানে ঢুকতে পারত সে হচ্ছে বেড়ালটি যার মাত্র বাচ্চা হয়েছে আর শিকওলা জানালা গলে যাবার মতো যথেষ্ট তন্বি ছিল সে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে ওর পরিবারের জন্য উচ্চমাধ্যমিকের প্রয়োজন যা কিনা পৃথিবীর আঘাত থেকে ওকে বাঁচতে সাহায্য করবে। স্তূপীকৃত খাতার ব্যারিকেডের পেছনে ও নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে আমি দেখলাম। আর বের করে দিলাম সবগুলোকে। ও আবার ফিরে এল, আমি আবার সরিয়ে দিলাম। এভাবে চলল প্রায় সপ্তাহখানেক। মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর ছিল, পিছু হটে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। আর ওর দিক থেকে ও ঠিকই ছিল। বাজপাখি, সাপ আর শিকারি কুকুরে ভর্তি এ-পৃথিবী খুঁজে নবজাত বিল্লি-বাচ্চাদের জন্য খুবই ভয়াবহ ছিল এবং এর চাইতে নিরিবিলি ও নিরাপদ আশ্রয় আমি ওকে দিতেও পারতাম না। শেষ পর্যন্ত আমিই হার মানলাম। খাতার মাঝখানে গর্তে খবরের কাগজ দিয়ে পুরু করে ঘিরে একটি ঘর বানিয়ে দিলাম। এবং কালিপদ যখন এল আরও খাতার বাণ্ডিল নিয়ে, এমন আদর্শ ঘরোয়া পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে ওর জানা স্বল্প ক'টি ইংরেজির একটি শব্দ উচ্চারণ করল, 'Beau-ti-ful', আমি ভাবলাম রেজিস্ট্রার সাহেবও একমত হবেন তো! এসব হাজার হাজার উত্তরপত্রের একটি আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তাদের ভেতরের মিল। 'Transphered Epitaph' বোঝাতে সবাই গ্রের Elegy থেকে একটি পঙক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তিরস্কারের সুরে লিখেছে 'The way is not weary the phoughman is wear, weary.' রচনাগুলো বেশ মার্জিত ও সুন্দর, বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিভিন্ন স্থানে নেয়া পরীক্ষায় যেখানে নকল করার সুযোগ নেই কিন্তু হুবহু একই রকম। প্রিয় বিষয় হচ্ছে 'Travel as a Means of Education'(আমরা ব্যবসার জন্য বেড়াই, আমরা আনন্দের জন্য বেড়াই, দার্জিলিংয়ে যাই কোন আত্মীয়কে দেখতে বা সুউচ্চ হিমালয়কে দেখতে, কিন্তু শেখার জন্য বেড়ায় কে?) এবং 'The Amusing side of college life' (স্কুলের অত্যাচার আর স্বৈরাচার আমার বুকে ব্যথা ধরিয়ে দিত)। বানানে নিজস্ব স্বকীয়তা ছিল, কখনও কখনও যতিচিহ্ন দেয়ার চেষ্টা হত, কখনও একটি পংক্তি বা পুরো একটি অনুচ্ছেদ বাদ পড়ে যেত, যার ফলে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হত। একটি ব্যাপারে কোন প্রস্তুত-করা উত্তর জোগাড় করা কঠিন ছিল এবং সেটাই ওদের বোঝার ক্ষমতার এক-ধরনের পরীক্ষা ছিল। আর সেটা হলো সারাংশ রচনা। কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন কেন্দ্রের উত্তরপত্র দেখে মনে হত বুঝি ছাত্ররা একটি উত্তরপত্রের নমুনা দেখে সব-ই তুলেছে যেটা চুপিচুপি সারা পরীক্ষার হলে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ওদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দিলে শ'তে একটি ছাত্রের পক্ষেও সম্ভব নয় আধুনিক ইংরেজি একটি পৃষ্ঠার কোন অর্থ করতে পারা অথবা সাধারণ একটি ইংরেজি বাক্য রচনা করা। কিন্তু যেহেতু এখানে হারানো নম্বরগুলো তারা পুষিয়ে নিতে পারত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে, তাই এর ফলে পরীক্ষার ফলাফলে খুব কমই হেরফের হত।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, সম্ভাব্য প্রশ্নের নমুনা-উত্তরের বই প্রায় সব স্টেশনারি দোকানেই পাওয়া যেত। নির্ধারিত সাহিত্যের পাঠ্যবইয়েরও সেগুলো ছিল সহায়িকা বই। এমনকি 'প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর' এই ধরনের প্রশ্নের জন্য যেসব অনুচ্ছেদ বেছে নেয়া হত বা হতে পারে সেগুলোর প্রতিটির বেশ সহজ ব্যাখ্যা দেয়া থাকত এসব বইয়ে। ভালো স্মরণশক্তির অধিকারী একজন পরীক্ষার্থীর নিজস্ব বিচার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজনই হত না, এমনকি নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকটিও না পড়লে চলত। সে ঐ সহায়িকা বইটি মুখস্ত করত এই বিশ্বাসে যে এর উত্তরগুলো সব প্রশ্নের জন্যই চলবে। অলৌকিকভাবে কিছু-কিছু সব সময়ে মিলেও যেত। প্রশ্নকারীরা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রভাষকেরা যাঁদের মন দীর্ঘদিনের জীবনরীতিতে অভ্যস্ত। তাঁরা হয়ত খুব সঙ্গত কারণেই ভাবতেন যে ছাত্ররা যা শিখেছে তার ভিত্তিতেই তাদেরকে বিচার করা উচিত এবং এটা নিশ্চিত যে তাঁরা যদি এই প্রথার বাইরে কিছু করতে যেতেন তা হলে ফলাফলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা তাদেরকে আবার পরীক্ষক নিযুক্ত হতে বাধা দেবে। সম্ভবত তাঁদের কেউ-কেউ ছদ্মনামে সহায়িকা বইও লিখেছেন। এসব বইয়ে ভালো অর্থ আছে যাতে সৌভাগ্যক্রমে সুখ্যাতিও অর্জন করা যায়।

পরীক্ষার হলে বই অথবা নোট পাচারের সাধারণত খুব কড়া শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই রিপোর্ট করা হয়। আমার সহকর্মীরা আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, এর কারণ এই নয় যে, এরা সংখ্যায় কম ছিল, কারণ রিপোর্ট করাটা একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। পরিদর্শকেরা বেশির ভাগই স্থানীয় শিক্ষক যাঁরা রাতের আঁধারে আক্রান্ত হতে পারেন বা মার খেতে পারেন। এমনকি ছুরিকাহতও হতে পারেন। (পরের বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকেরা স্বেচ্ছায় বেশি খারাপ কেন্দ্রগুলোতে গিয়েছিলেন পরিদর্শনের কাজে এবং পরীক্ষা পরিচালনার কাজেও বেশ উন্নতি দেখা দিয়েছিল)। কিন্তু না-ধরতে-পারা নকল কিছুটা প্রশ্রয় পেয়ে গেলেও আসল ভাণ্ডার বা সম্পদ ছিল স্মৃতিশক্তি।

প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়তো আগের চেয়ে স্মৃতিশক্তির অপরিহার্যতা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু একটি ভালো স্মৃতিশক্তি থাকা ও তাকে ব্যবহার করার মধ্যে কোন দোষ নেই। একথাও মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা ব্রিটিশরাজের ভারতবর্ষকে দেয়া কোন আশীর্বাদ নয়। ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার শিক্ষা পুরনো এবং অনাদিকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে এখানে শিক্ষা অর্থবহ, এমনকি আজকের ইউরোপের চেয়ে এখানে এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও মুনিঋষিদের একই রকম পবিত্র ভাষ্যগুলো এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল ঋষিদের কাছে হস্তান্তর-প্রক্রিয়া। যেসব ছাত্র মুখস্থবিদ্যার চর্চা করছিল তারা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন সম্মানজনক ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করছিল। তার পরও তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও প্রশাসক হবার, আর যদি তাদেরকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে হয়, তা হলে ভাষাটি ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে এমন ছাত্রদের বেছে নেয়া জরুরি, যারা একটি চিন্তাধারাকে ঐ ভাষায় বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারবে যেমন পারবে, একটি তত্ত্বকে পুনঃউপস্থাপন করতে। এই পরীক্ষা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যথেষ্ট নয়। অনেক ভালো এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক সেটা জানতেন এবং ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণায় ভুগতেন কিন্তু তাঁরা একটি প্রথার জালে আটকে পড়েছেন। সারা পৃথিবীতেই ছাত্রদের প্রধান কাজ হলো তাঁদের পরীক্ষায় উতরে যাওয়া ; শিক্ষকের কাজ হলো উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছাত্রদের শেখানো,পরীক্ষকের কাজ হলো ছাত্র শিখেছে কি-না তা দেখা। লব্ধজ্ঞান যে একেবারেই অর্থহীন নয় এটা দেখবার দায়িত্ব এঁদের কারওই নয় এবং এটা কেউ দেখেও না, যে, জ্ঞান লাভ করার সবচাইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে বুদ্ধি বা মেধা। বিশ্ববিদ্যালয় নিজে যদি এ কাজটা না করে তবে এটা কারওই কাজ নয়। এই প্রাথমিক যুক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন এবং শিক্ষক, ছাত্র, পরীক্ষক সবারই একটি যৌক্তিক লক্ষ্যে একযোগে কাজ করা দরকার এবং আমারই এ-ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

রোগ-নিরূপণের জন্য এ-সবই খুব ভালো কথা। কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কেবলমাত্র একটি ঘোষণা দিয়ে দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হয়, এমন একটি ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনা যায় না, যেখানে তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে, সারাদেশের শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভ্যাস মিশে আছে। প্রথমে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা লাগবে এবং সকল বিপরীত মেরুর দলগুলো বা লোকেরা যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে ব্যাপারটা বুঝে একমত হতে হবে। ছাত্রদের বুঝতে হবে তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হয়। শিক্ষকদেরকে এটা ভালো করে বুঝতে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিতে হবে এবং কি করে শেখানো যায় তা শিখতে হবে আর তার অর্থ হচ্ছে নতুন পদ্ধতিগুলো জানা, যে-সম্পর্কে সেই সময়ে আমি বা তৎকালীন উপমহাদেশের কেউই স্পষ্টভাবে অবগত ছিলাম না। তার ওপর নতুন রীতির এই প্রশ্ন যা কিনা একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে সেই ব্যাপারে প্রশ্নকারী ও পরীক্ষক উভয়েরই খুব স্পষ্ট সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও। বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত শিক্ষকগণ যাঁরা প্রধান পরীক্ষক হতে পারাটাকে তাঁদের উপযুক্ত যোগ্যতা বলে মনে করতেন সহজে এ-ধরনের ব্যাখ্যা মেনেও নেবেন না আবার সরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াবেন না। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগই বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করে না, তারা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেও তাদের পক্ষে এ-ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়াটা সহজ নয়। আমরা যে-কোনো প্রস্তাবই দিই না কেন তাতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সম্মতি লাগবে, উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সম্মতি লাগবে; যাঁরা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞ নন, যাঁরা মনে করেন না যে তাঁদের নিজেদের মাথার ঢাকনিতে বসা মৌমাছিটির মতোই আমাদেরগুলোও একই রকম সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। এসব শক্তিগুলো কোনটিই স্থির ছিল না ; বছর পার হতে তারা পঠনপ্রকৃতি বদলাত এবং আবার নতুন করে প্রয়াস শুরু করতে হত তাদের বোঝাতে, সম্মত করতে এবং প্রতি পদে আমাদের যুক্তিগুলো বিচিত্র সব বাধার মুখোমুখি হত, যেমন, ঝিমিয়ে-পড়া অলসতা, ঈর্ষাকাতরতা, প্রকাশকদের চাপ এবং অর্থ বা সাহায্যকারী বইয়ের কায়েমি স্বার্থবাদীদের অথবা আরও সচেতনভাবে যারা কোন মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়, এমন লোকদের। ভূখণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমন একজন যোগ্য জেনারেলের জন্য এটি একটি কৌশলগত সমস্যা, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি শিক্ষায়তনিক রাজনীতি সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং ভাসাভাসা ধারণা নিয়ে। অন্যরাও একইভাবে ভাবছিলাম কিন্তু ১৯৫১ সালে আমার ঢাকা ত্যাগের আগে আমরা কয়েকটি নিষ্ফলা ও অনিশ্চিত চেষ্টার বাইরে কিছুই করতে পারিনি।

১৯৪৮ সালের আগস্টের শেষ নাগাদ আমার জম্ভিস-আক্রান্ত কল্পনায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটি প্রকট এবং বিশাল বাস্তব রঙের এক তামাশায় পরিণত হলো যা কিনা মানবসমাজ নিজেই নিজেকে নিয়ে করছে। ফলত আমরা এই প্রজন্মের প্রায় দশ হাজার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মেধাবী ছেলেমেয়ের পরীক্ষা নিতে যাচ্ছি। দুবছরের নিবিড় প্রশিক্ষণে তারা শিখেছে নিজেদের সত্যিকারের ভাবনাচিন্তাগুলো প্রকাশ না করে বরং তাদের চেয়ে ক্ষমতাশীল কেউ তাদেরকে যা ভাবতে বা বলতে শেখায় এমন কিছু প্রকাশ করতে। অসংখ্য কাগজের পাতা ভরানোর চিন্তায় আমরা তাদেরকে প্রায় স্নায়বিক উন্মত্ততায় পৌঁছে দিই—আর অর্থহীন যা-কিছু ওরা লিখবে সেগুলোকে মূল্যায়ন করার জন্য তাদের জনা তিরিশেক বয়োজ্যেষ্ঠ, আবার উন্মাদ হয়ে উঠবেন, যাতে সমস্ত অর্থহীনতার মাঝেও একটি অর্থের মানদণ্ড খুঁজে বের করা যায়। তামাশার চরমটা এই যে, এটা হচ্ছে দায়িত্বশীল বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগের একটি প্রাথমিক পর্যায়। কারণ যারা টিকে থাকবে এই পরীক্ষায়, তারা কিছুদিন পরপর এমন পরীক্ষা দিতেই থাকবে এবং চূড়ান্ত পর্বে যা পৌঁছাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সর্বোচ্চ স্তরে। মুক্তচিন্তার ও মুক্ত ভাষণের ভেতরে যে-বিপদের বীজ লুকিয়ে আছে তাতে আঘাত করার জন্য হয়ত আধুনিক গণতন্ত্র এর চাইতে ভালো কোন রক্ষাকবচ খুঁজে পায়নি ; কারণ, প্রচণ্ড অসাধারণ কোন মেধা না হলে দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে এমন একটি পদ্ধতির ভেতরে থেকেও প্রথাগত চিন্তাভাবনার বাইরে ভাবার মতো ক্ষমতা অবশিষ্ট রাখা অসম্ভব। তবুও কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও এমন ঘটে। মানবপ্রকৃতির স্থিতিস্থাপকতাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আলোর সেই সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গকে যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রবাহিত। ভবিষ্যদ্বাণীর অতীত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কোন প্রথাই সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারেনি।

সন্দেহ নেই যে এই বিশেষ পরীক্ষাটি, সেখানে ভুলভাবে লেখা ভাষাটিই ব্যবহৃত হচ্ছে সমস্ত যৌক্তিক চিন্তাভাবনার মাধ্যম হিসেবে, যেন সেই পদ্ধতিটিরই একটি ব্যঙ্গ রূপ। কিন্তু সেই ব্যঙ্গটি যেন এর অঙ্গব্যবচ্ছেদ করে বের করে নিয়ে আসে এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে। আমি কোথাও একটি আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে পড়েছিলাম যারা তাদের নিজেদের ভাষায় কখনওই মিথ্যে বলতে শেখেনি কিন্তু যখন মিশনারিরা তাদেরকে ইংরেজি বলতে শেখাল তারা আর সত্যই বলতে পারত না। যাহোক— এসব কথা এভাবে না ভাবাই ভালো তা হলে আমরা পাগল হয়ে যাব।

আর উচ্চমাধ্যমিকের এই পার্শ্বচিন্তা ছাড়াও ভাবার অনেক বিষয় আছে।

আমি এ-বিষয়ে আমার এক প্রথম বর্ষের ছাত্রের একট মন্তব্য মনে না করে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারছি না। মন্তব্যটি সে করেছিল রচনা ক্লাসে। এই ক্লাসগুলো ছিল ইংরেজিতে বহুবিস্তৃত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াস। স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজি নেই এমন প্রতিটি ছাত্রকে এই ক্লাসগুলো করতে হত, আর স্নাতক ডিগ্রি নেয়ার আগে তাকে একটি রচনা পরীক্ষায় পাস করতে হত, ক্লাসটা হত প্রথম বর্ষে, কিন্তু পরীক্ষা পুরনো সেই Oxford Divinity Moderations-এর মতো স্নাতক পরীক্ষার পরও এক বছর পর্যন্ত বারবার দেয়া যেত। যখন আমরা দেখতাম যে কোন প্রথম শ্রেণী পাওয়া শিক্ষার্থী ধরা যাক আরবি অথবা পারসিতে, ইংরেজি লেখার অক্ষমতার জন্য স্বীকৃতি পাচ্ছে না, আমরা হার মেনে নিতাম এবং ওকে পাশ করিয়ে দিতাম, সুতরাং মান ক্রমশ নিচের দিকে যেতে যেতে এমন জায়গায় পৌঁছল যখন ফেল করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তবুও এই ক্লাসগুলো ছিল, আর বিভাগীয় সব শিক্ষকই ভাগাভাগি করে ক্লাসগুলো নিতাম।

সে-বছর আমার ছাত্রদের মধ্যে একেবারে অজ্ঞ যেমন ছিল তেমনি এমন একজন অসমীয় ধর্মযাজক ছিলেন যাঁর ইংরেজি আমার মতোই, কিন্তু যিনি বিবেকের তাড়নায় নিয়মিত ক্লাস করতেন, আর তার ফলে শিক্ষকতায় একটি সমস্যা দেখা দিল। আমরা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টায় একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করতে লাগলাম যেটায় প্রত্যেকেই তার ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু-না-কিছু লিখত। যখন বিজ্ঞাপনের কপি-লেখক নিজেকে সংবাদদাতার কলামে উন্নীত করল আমার মনে হলো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। একজন তরুণ ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক একটি আমগাছের সাক্ষাৎকার লিখে পাঠাল। নিচে তার সারমর্মটা দেয়া হল :

এ বছর আমদেরকে ফলনের ব্যর্থতার জন্য তিরস্কার করে সে শুরু করেছে যদিও তাদের বিহারের জ্ঞাতি ভাইয়েরা বিশেষ ভালো ফলন দিয়েছে।

'হে আমার প্রিয় বন্ধু' আম বললে, 'আমি খুশি যে তোমরা এই প্রসঙ্গটা তুলেছ কারণ তার ফলে আমরা একটি খোলামেলা আলোচনার সুযোগ পেলাম। বলো তো, তুমি এবং তোমার বন্ধুরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ করেছি।'

'এবং তোমাদেরকে ইংরেজিতেও পাশ করতে হয়েছে?'

'হ্যাঁ'।

'কিন্তু তোমরা কি মোটেও ইংরেজি পার?'

'কী করে পারব? আমাদেরকে ইংরেজি শেখানোর জন্য কোন ইংরেজ লোক এখানে নেই।'

'তা হলে তোমরা কী কর? আমার মনে হয় তোমরা কেউ-কেউ সব উত্তর আছে এমন কোন বই কিনে নাও, লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলো পরীক্ষার হলে নিয়ে যাও আর নকল কর। কখনও কখনও ওরা কেউ-কেউ এভাবে প্রথম বিভাগও পায়।'

'ঠিক তা-ই বটে।'

'কিন্তু তারা কোন ইংরেজি জানে না, সুতরাং এটা একধরনের গুণ্ডামি (আইনভঙ্গ বা সন্ত্রাস)।'

'সত্যিই তা-ই।'

'অন্য যারা এমন করতে ভয় পায় তারা উত্তরটা মুখস্থ করে আসে, পরীক্ষার হলে যতটা মনে করতে পারে বমি করে উগরে দেয় পরীক্ষার খাতায়। এরা ভাগ্যবান হলে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিভাগে পাশ করে যায়।'

'তোমার কথাই ঠিক বন্ধু। দেখছি তুমি আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ।'

'কিন্তু এটাও তো দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণ্ডাগিরি, কারণ তারা কোন ইংরেজি শিখছে না।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত।'

'আবার অন্য অনেকে বই কিনতে বা ধার করতে পারে না। তাদের কী হয়?'

'তারা পরীক্ষা দেয় কিন্তু অকৃতকার্য হয়, কারণ তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।'

'ঠিক তা-ই। মনে হয় তুমি আমার বক্তব্য বুঝতে পারছ?'

'মনে হয় পারছি। আমাদেরকে যদি ইংরেজি শিখতেই হয়, তবে আমাদের কাছে ইংরেজ লোকদের পাঠাতে হবে শেখাতে। যদি তোমাদের কাছ থেকে ভালো আম চাই, বিহারের ভালো গাছ থেকেই তোমাদের জন্য কলম করতে হবে।'

'ধন্যবাদ বন্ধু, আমার ভালো লাগছে যে এই বিষয়টা এত স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।'

দুর্ভাগ্যজনক যে, মূলটির কোন কপি নেই, তাই আমি সেই ভঙ্গিতেই বক্তব্যের সারমর্মটি তুলে ধরলাম। এটা ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ কিছু নয়, এমন একটি বাক্য ছিল না যেখানে রচয়িতা বানান, কাল, সর্বনাম ব্যবহারে অথবা নির্দিষ্ট আর্টিকেল বসাতে গিয়ে হোঁচট খায়নি। আমার মনে হয়েছিল 'বমি' শব্দটির দক্ষ ব্যবহারে (আমার নয়, ওর প্রাসঙ্গিক শব্দটি) যেন শব্দভাণ্ডারের প্রতি ওর অনুভূতিই প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সেটা আমার ভুল ধারণা ছিল। কিছুদিন পরে কীটস-এর ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সনাতনী ধারায় একটি সাহিত্য সমালোচনা লিখতে গিয়ে ও লিখল কীটস তাঁর 'ওড টু নাইটিঙ্গেল' কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের জন্য তাঁর আবেগ বমি করেছেন এবং আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন সরল বিস্ময়ে ও উত্তর দিল, "কিন্তু আমি তো প্রায়ই পাকিস্তান অবজারভারে লেখা চিঠিতে পড়ি, জনাব অমুক এই ব্যাপারে তাঁর অভিমত এই কলামে বমি করেছেন?" এভাবে যখন আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করা হলো, আমি লক্ষ করলাম যে, ভারতীয় ইংরেজি প্রয়োগবিধিতে 'Express' প্রকাশ শব্দটির সমার্থক হিসেবে 'বমি' শব্দটির ব্যবহার হয়, বিরাগ বা বিস্বাদময় কোনকিছু বোঝাতে নয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে ওর অন্য আরও কিছু অনুশীলন বিচার করলে বোঝা যায় যে, সে ছিল তার নিজের ঐতিহ্যে বেশ অভিজাত এক সাহিত্যশিল্পী যে কিনা চসারিয়ান প্রত্যয়ের সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতিকে মৌলিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। ইংরেজি ব্যবহার করাই বরং ওর মনকে বিস্তৃত করার চেয়ে যেন ওর স্টাইলকে আরও দুর্বোধ্য করল। এই ভাষাসমস্যা, আরও অনেকভাবে ছাপ ফেলতে লাগল, এবং জটিলতার সৃষ্টি করল তা সে যেভাবেই আমরা দেখি না কেন ব্যাপারটিকে।

মাধ্যমিক শিক্ষাটি ছিল খুবই অপ্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনার বিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এর কমিটিগুলোর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক প্রকাশ্যে এখানে ইসলামের আদর্শগুলোর বাস্তব রূপ দেয়া হত, কারণ যে-জাতি একটি ধর্মীয় আদর্শকে মূর্ত করতে চায় সে স্কুলের শিক্ষাক্রমে এ-ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। বোর্ড তার দায়িত্ব খুব গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল কিন্তু বিশাল হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও সচেতন ছিল যাদের স্পর্শকাতরতাকে সম্মান করতেই হবে, এবং ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সংখ্যালঘুরা বেশ প্রভাবশালী ছিল কারণ তারা সবচেয়ে ভালো স্কুলগুলোর কয়েকটি পরিচালনা করত। বোর্ড এদের কথা বিবেচনায় রাখতে প্রস্তুত ছিল কারণ ইসলামের বাংলা ব্যাখ্যায় যদিও কোন শৈথিল্য ছিল না, বরং তা উদার ও সহনশীল ছিল, কিন্তু সেখানে সরকারের শক্তিশালী প্রধান সচিবও ছিলেন যাঁর মতামতের পেছনে ছিল করাচির কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন, সংখ্যালঘুদের প্রতি যাদের সহানুভূতি ছিল খুব সামান্যই। অনিবার্যভাবে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ব্যাপারটি ছিল ইতিহাস। বিদ্যালয়ের ইতিহাসের মৌলিক শিক্ষাক্রম কী হবে? পাকিস্তানের সাম্প্রতিকতম ইতিহাস খুবই অপ্রতুল ছিল (যদিও একজন ইতোমধ্যেই একটি বই বের করে ফেলেছে যার উৎসাহী শিরোনাম হলো 'পাকিস্তানের পাঁচ হাজার বছর')। ইংরেজি সূত্রে শেখানো অবিভক্ত ভারতের ইতিহাস নতুন দুটি রাষ্ট্রের কোনটির কাছেই আর সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসবিদদের পুনঃরচিত ইতিহাস পাকিস্তানের ব্যাপারে ভুলভাবে একপেশে ছিল। প্রচণ্ড সদিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি পক্ষপাতহীন ইতিহাস বই লেখা একেবারেই অসম্ভব ছিল। এটা ছোট হতে হবে, কোন ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষপাত মানেই ছাঁটকাট ও সংক্ষিপ্ততা। আকবরের ধর্মীয় উদারতা বা আওরঙ্গজেবের প্রচণ্ড রক্ষণশীলতার মতো এমন সব ব্যাপারে একজন পাকিস্তানি বা একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ একই রকম লিখবেন না, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে বাধ্য যেহেতু তাঁরা দেশ-বিভাগকে দেখবেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিজয় হিসেবে।

একটি প্রস্তাব ছিল ইসলামের ইতিহাসের ওপর একটি কোর্সের, কিন্তু হিন্দু ও খ্রিস্টানরা নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি জানাবে। আরেকটি ছিল বিশ্ব-ইতিহাসের। এই ধারণাটি ভালো আর প্রগতিশীল ছিল কিন্তু সমস্যা হলো সেটাকে স্কুলের মাপে ছোট করে আনা। বোর্ড আসলে বিশ্ব-ইতিহাসের একটি শিক্ষাক্রমের কথা বলেছিল যা শুরু হবে আদম ও হাওয়াকে দিয়ে কিন্তু মনে হয় সত্যিই খুব হতাশ হলো যখন সব ধর্মের ইতিহাস-শিক্ষকরাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আমার প্রথম বর্ষ রচনা ক্লাস এইসব বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে খুব সহানুভূতি ও উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করল। তারা খুব প্রাণবন্ত প্রবন্ধ রচনা করল এবং সেইসাথে আমাকেও কৃতজ্ঞ করে রাখল কারণ ইতিহাসের শিক্ষাক্রম ঠিক করা আমার কাজ ছিল না।

ইংরেজি উপ-কমিটির নিজস্ব সমস্যা ছিল। প্রথমত একে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে এবং জাতিগঠনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত এই মুহূর্তে এটা ছিল যেন নবপ্রজন্মের চরিত্র গঠনের আমন্ত্রণ। বইগুলো হবে যথা সম্ভব ভালো ইংরেজিতে, ছাত্রছাত্রীদের বোঝার মতো যথেষ্ট প্রাথমিক, কিন্তু বিষয়ে হতে হবে ষোলো বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী। কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নৈতিক আদর্শের সঠিক ধারাকে প্রকাশ করা। আমি যখন বললাম রবিনহুড ব্যালাডের গল্পগুলো সহজ আধুনিক ইংরেজিতে পুনর্লিখনের জন্য আদর্শ, সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলো। আইন-অনুগত ইংল্যান্ডে ডাকাত বা সমাজ-বহিষ্কৃত কোন ব্যক্তিকে গৌরবান্বিত করা যায়, কিন্তু এখানে যেখানে বাস্তব জীবনে তাদের সংখ্যা খুব বেশি, এদের কথা শিশুদের মাথায় ভ্রান্ত ধারণা ঢুকিয়ে দেবে। বইগুলোতে গার্হস্থ্য ভক্তি ও নাগরিক গুণাবলীকে আদর্শায়িত করতে হবে। আধুনিক ইংরেজিতে এমন বইয়ের সংখ্যা খুবই কম যেখানে এসব আছে এবং তার পরও সেসব বই ছোটদের কাছে কল্পনাপ্রবণ আবেদন রাখে।

বোর্ডের একটি অনুপ্রেরণা ছিল। সে নিজে তার ছাপাখানা চালাবে, ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে, আর তার লাভ থেকে সে খরচ তুলবে। নষ্ট করার মতো সময় মোটেই নেই, খ্রীস্টমাসের পরপরই ইংরেজি বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হলো বিপজ্জনক গতিতে পাঠ্যপুস্তক লিখবার। আমাদের ভাবতে হয়েছিল যে এটা একটি জনকল্যাণমূলক কাজ : আমাদেরকে টাইপের কাগজ (সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে খুব দুর্লভ ছিল) সরবরাহ করা হবে এবং এই কাজের জন্য যেটি হবে বোর্ডেরই সম্পত্তি, একটি সম্মানী দেয়া হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান যিনি এসব প্রস্তাব করেছিলেন, অত্যন্ত সদয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাড়িওয়ালা, বিজয়ীর হাসিমুখ এক ভদ্রলোক। এবং যদিও কর্মসূচির গতি আমাদের প্রায় মূক করে দিচ্ছিল, আমাদের সাথে সহযোগিতার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও তাঁর মিষ্টি ব্যবহারের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর কাজ সেরে নিলেন।

আমার কাজ ছিল একটি ইংরেজি ক্লাসিক ফিকশনকে ম্যাট্রিকের উপযোগী সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে দেয়া এবং অবিভক্ত ভারতের পাঁচজন বীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করা। এঁরা হলেন— গান্ধী, গোখলে, দাদাভাই নওরোজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দ। এঁদের মধ্যে শেষের দুজন কেবল বাঙালি এবং সবাই অমুসলিম : এদেরকে একটি সংকলনে মুসলিম দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে স্থান দেয়া হবে যেটা তাদের সহধর্মীরাও পাঠ করবে। যদিও কেউ খুব স্পষ্ট করে বলেনি, আমাদেরকে কাজটা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল কিছু জটিলতাকে পাশ কাটানো। যদি কোন হিন্দু এটা লিখতেন কিছু উৎসাহী মুসলিম বিশ্বাসঘাতকতামূলক চক্রান্তের অভিযোগ আনতেন এবং সেগুলো ভিত্তিহীন হলেও লেখকের জন্য ক্ষতিকর হত ; আবার কোন মুসলিমকে কাজটা দিলে সেটা হত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অপমান যেন নিতান্তই মন পাওয়ার জন্য এই অন্তর্ভুক্তি। আমি যেমন ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে নিরপেক্ষ তেমনি ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও যোগ্য। একই আবেগে গ্রন্থিত আরেকটি বই হলো, ছোট ছোট বইয়ের সংকলন—মূল ইংরেজিতে বা প্রতিটি স্কুলের জানা উচিত এমন মানসম্পন্ন ভাষায় রচিত, যেখানে উপমহাদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চ আধ্যাত্মিক বা নৈতিক আদর্শকে সমুন্নত করা হয়েছে। দুটোই ছিল দ্রুতপঠন—ভাষা চর্চা করার ও বোঝার জন্য, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝার ও পড়ার জন্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে হয়ত ইংরেজির পাঠকদের আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইংরেজি বাগ্‌ধারা ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করতে চাইতাম, এ-ধরনের উৎকর্ষসাধন মাতৃভাষায় করার কথাই ভাবতাম, কিন্তু যদি উৎকর্ষসাধন নিতান্তই করতে হয় তবে আমি এই বইগুলোর উদার অন্তর্ভুক্তির সজীব সাহসিকতাকে পছন্দ করেছিলাম। অবশ্যই জীবনী গ্রন্থনার কাজটি কমিটিতে বসে খাতা দেখার চেয়ে সুবিধাজনক ছিল এমনকি এসব কাজের জন্য পাওয়া সময়ের স্বল্পতার মধ্যেও। যেভাবেই হোক কাজটি করা হলো আর বইও ছাপা হয়ে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হল। এক বছরের মধ্যেই বইটি খুব নীরবে বাদ পড়ে গেল আর যদ্দুর জানি কখনওই আর ছাপা হলো না। আমার সন্দেহ হয়, বোর্ড অপছন্দ করেছিল বলে নয়, বরং প্রধান সচিব অনুমোদন করেননি বলে। একটি ইসলামি রাষ্ট্রের শিশুরা কেন ভুল ধর্মের বীরদের সম্পর্কে জেনে সময় নষ্ট করবে?

তাতেও কিছু হত না, কিন্তু আরেকটি সংকলনের ব্যাপারে তাদের আচরণ আমাকে প্রতিবাদের আহ্বান জানাল। এই বইটি থেকে যে-ছ'টি রচনা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সেগুলোর চারটির ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করল সরকার এবং আরও পরে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে, স্কুলগুলোতে তালিকা প্রচারিত হওয়ার অনেক পরে, বোর্ডকে সে-তালিকা প্রত্যাহার করে নিতে বলল। এগুলো হলো সম্রাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশোকের যিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সনের একজন মহান বৌদ্ধ, অহিংসবাদী রাজা, তাঁর আইন থেকে একটি পরিচ্ছেদ; গান্ধীর একটি প্রার্থনার ওপর আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবনের একটি বিবরণ, আর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যক্ত কিছু আশা, দেশবিভাগের অনেক আগে যা রচিত হয়েছিল একজন ইংরেজ দ্বারা যিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। আপত্তিটা স্পষ্ট খুবই, তাঁদের ইংরেজি একেবারেই খাঁটি কিন্তু তাঁরা সবাই প্রায় অমুসলিম চিন্তাধারার প্রশস্তি গেয়েছেন।

প্রথমত অন্য ধরনের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে যা-ই ঘটুক-না কেন, একবার নির্ধারিত করে তারপর এইসব রচনাগুলো বাতিল করা অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক, ভুল তো বটেই, এবং বেশ ভালোসংখ্যক হিন্দু শিক্ষকের জন্য বিরক্তির ব্যাপার। আমি যেমনভাবে বুঝেছি, ততটা জোরের সাথে এসব বললাম, এবং বোর্ডের অন্য দুজন কর্মকর্তা নন এমন সদস্য, খুব সতর্কতার সাথে যদিও, একমত হলেন। স্পষ্টতই মনে-মনে চেয়ারম্যান সাহেবও, কিন্তু একটি পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করতে তিনি চাইছিলেন না। তাঁকে একটি অস্বস্তিকর সন্ধ্যা উপহার দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিবাদ একটি পৃথক স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ করলাম, যেটা কখনও যদি গন্তব্যে পৌঁছেও থাকে, উপেক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু একজন স্বাক্ষরকারী পরে আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে, আমি এ-ধরনের প্রতিবাদ ঝুঁকিহীনভাবে করতে পারি, তিনি আমাকে সমর্থন করে কিছুটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

আমার জার্নালে দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারটিতে এবং ইংরেজি সাব-কমিটির সাথে এমনি আরও ছোটখাটো দ্বন্দ্বে আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম : যেগুলোকে মনে হত বিভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, সেসবের দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে অসুখী হয়ে উঠেছিলাম, আবার সেগুলোকেই পদত্যাগ করার মতো বড় ব্যাপার করে তুলতেও অনিচ্ছুক ছিলাম। পেছনে ফিরে তাকিয়ে আমি এখন নিজের অন্ধত্বেই অবাক হয়ে যাই, কেন আমি তখন দেখতে পাইনি যে এগুলো সবই পূর্ব-পশ্চিম টানাপোড়েনের সাথেই যুক্ত ছিল যা কিনা ১৯৪৮ সালে অন্য ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। বোর্ড খুব সরল সোজাভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে পাকিস্তান বলে একটি আদর্শকে রূপায়িত করতে চাইছিল। বাঙালিদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা স্বাভাবিকভাবেই আসে না, এবং একটি হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিবেচনায় রেখে তারা চেষ্টা করছিল সম্প্রদায়গুলোকে একই উচ্চাশার উচ্চলক্ষ্যে পৌঁছাতে, এবং এজন্যে ইংরেজিকে কাজে লাগাতে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব পাকিস্তান সরকার যার প্রতিধ্বনি মাত্র, সংখ্যালঘু স্পর্শকাতরতার বিষয়টিকে গ্রাহ্যই করল না। পশ্চিম পাকিস্তানে তারা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘুদের নির্মূল করেছে এবং এই ধারণা নিয়েই শুরু করেছে যে, পাকিস্তানের অস্তিত্বই নির্ভর করছে ভারতের প্রতি অপ্রকাশ্য ঘৃণার ওপর। প্রথমে তারা বাংলা স্কুলগুলোতে যে ইংরেজি বই পড়ানো হচ্ছিল সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করেনি। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন (ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত) যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যের শক্তি প্রকাশ করেছিল, যে-শক্তিকে তারা বুঝতে পারেনি, তখনই তারা মনোভাব পাল্টাল। পূর্ববাংলায় প্রতিটি অসন্তোষের, উত্তেজনার পেছনে তারা হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের হাত দেখতে পেল, এবং এরই ফলে তারা বিদ্যালয়ের বইগুলোকে অবিশ্বাস করতে শুরু করল, যেগুলো আবেগের ঐক্যকে উৎসাহিত করত, যেমন অবিশ্বাস করতে লাগল দুই বাংলার একই ভাষাকে। আমার মনে হয় না বোর্ডের অন্য সদস্যরা দিগন্তের এই সংকোচনকে পছন্দ করল, কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির ব্যাপারে আরও সক্রিয় হবার কারণে, আমার যেটার দরকারই পড়েনি, তারা এর ভেতরের আপত্তিকে বুঝতে পারল ; বুঝতে পারল যে আপত্তি এখানে অনাদর হিসেবে ভাবা হবে এবং নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

উপন্যাসের ব্যাপারটি সোজাসুজি হাসির নাটকের চেয়েও বেশি কিছু ছিল। কপি-রাইটের জটিলতার কারণে আমাদেরকে একটি পুরনো বই পছন্দ করতে হলো। The Talisman নামে একটি বইয়ের নাম প্রস্তাব করা হলো ইসলামি আগ্রহের কারণে। কিন্তু স্কটের অলঙ্কারবহুল ইংরেজিকে সংক্ষিপ্ত করার চেয়ে পুনর্লিখন করাই দরকার হবে মনে হল। হাতের কাছে সবচেয়ে সহজবোধ্য ক্ল্যাসিক বলে Vicar of Wakefield-কেই মনে হল, এবং এক সপ্তাহের মধ্যরাত পর্যন্ত পরিশ্রমের ফলে আমি বইটির একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করতে পারলাম যা যথাসময়ে বোর্ড নির্ধারিত করল পাঠ্য হিসেবে। আমি কাজটি নিয়ে খুশি হয়েছিলাম কিন্তু কিছু-কিছু স্কুল খুশি হতে পারেনি। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা অভিযোগ করায় বোর্ড একটি সভা ডেকেছিল, যেটাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। সভার সিদ্ধান্ত হলো : অধ্যাপক স্টক Vicar of Wakefield বইটির প্রেমের দৃশ্যগুলো বাদ দেয়ার জন্য বইটি পুনর্লিখন করবেন।

ক্ল্যাসিক গুলোকে রূপান্তর করারও একটি সীমা আছে যার বাইরে যাওয়া যায় না। আমাকে রবিনসন ক্রুসো ধরতে হলো, কিন্তু এর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য আমার Vicar-এর চেয়ে কয়েক পাতা বেড়ে গেল এবং পরবর্তী ছাত্রের দল এই কষ্টটা পেলে নিশ্চয় ক্ষেপে যাবে (ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্নে মুরুব্বিরা তাদের পাশে আছে, এমন ধারণা সবসময়ে মনে রাখতে হবে)। ঠিক এমনি সময়ে বম্বের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস জিম করবেটের কুমায়ুনের মানুষখেকো বইটা বের করল এবং এটাকেই মনে হলো খাঁটি উত্তর। বাংলা না হলেও বেশ ভালো ভারতীয় আঞ্চলিক আবহ আছে এবং করবেটের বাঘগুলো ঈশ্বরের আশীর্বাদে বিতর্কিত ধর্মীয় মতামত বা সন্দেহজনক যৌন উত্তেজনা দুই থেকেই মুক্ত। সবকিছু সুবিধা বিবেচনা করে, এই একবারের মতো বোর্ড তার নিজস্ব ছাপাখানার লাভের ভাবনা বাদ দিল।

এই সিদ্ধান্তের পরদিন কোন ব্যঙ্গপ্রবণ শয়তান আরেকটি প্রকাশনার প্রধানের দালালের মাথায় ঢাকা ভ্রমণের চিন্তা ঢুকিয়ে দিল। সে দেখা করল বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে যিনি দুটো প্রতিষ্ঠানকে গুলিয়ে ফেললেন ও উদারভাবে বললেন, "ও হ্যাঁ আমরা তো মাত্রই আপনাদের 'মানুষখেকো' বইটি নির্ধারিত করেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠ্যপুস্তক হিসেবে।" ঘটনাটি এমন যে তাদের প্রতিষ্ঠান মাত্রই মধ্য আফ্রিকার সিংহশিকারের ওপর একটি পুরনো বইয়ের স্কুল-সংস্করণ বের করেছে যদিও তারা আমাদের বোর্ডের কাছে বইটি জমা দেয়নি। সেই দালাল লোকটি ওর ভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না, সে একটি ছুতো করে বেরিয়ে এসে প্রধান কার্যালয়ে ফোন করে তক্ষুনি ৭০ হাজার কপি পোপারব্যাক ছাপাতে বলল 'জাভার মানুষখেকো' বইটির। তার পরবর্তী যাত্রা ছিল আমার কাছে এবং খুব হালকাভাবে ও আমার কাছে জানতে চাইল বোর্ড কী করে ঐ বইটির কথা জানতে পেরেছে। সৌভাগ্যবশত কিশোর বয়সে বইটি পড়েছিলাম বলে আমি তার ভুলটা ভালোভাবে ভাঙিয়ে দিতে পারলাম এবং এখনও ওর মুখে সেই আঘাতের ছাপটা দেখতে পাই যখন ও ছুটে ফোনের কাছে গেল আগের ভুলটা শোধরাবার জন্য যা হয়ত মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারত। গল্পের এখানেই পুরো শেষ নয়। পরের বছর আবার যখন প্রস্তাব আসতে লাগল এই নির্ধারণের, চেয়ারম্যান খুব হালকাভাবে আমাকে বললেন, "আমাদের দুজনের মধ্যে কেবল কথাটা অধ্যাপক, আপনার কি মনে হয় না, কুমায়ুনের মানুষখেকোর চেয়ে আপনার 'ভিকার' আরও ভালো বই ছিল?" "আমাদের মধ্যেই কথাটা, আমার তা মনে হয় না।" আমি বললাম, "যেহেতু গ্রন্থের স্বত্বের সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে সত্য বলায় খুব নায়কোচিত কিছু নেই।" কিন্তু মনে হলো উত্তরটা তাঁকে যেন আঘাত দিল।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "সত্যি কথা এই যে, আমরা যখন নির্ধারিত গ্রন্থ পরিবর্তন করলাম, বিক্রেতাদের কাছে ভিকারের একটি বিরাট সংখ্যা অবিক্রিত রয়ে গেল। তারা কিছুতেই আমাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হচ্ছে না।" আমি প্রস্তাব করলাম, "আমরা দুটো বইকেই বিকল্প হিসেবে রাখতে পারি।" "সেটা বোধহয় ভালো ধারণা।" তিনি স্বীকার করলেন, "শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে বেছে নিতে পারলে খুশি হন।" সুতরাং চূড়ান্ত নির্ধারণসভায় যখন বোর্ড বসল, একজন সদস্য বাহ্যত বিনা প্ররোচনায় বলে উঠলেন, "আচ্ছা Vicar of Wakefield-এর ব্যাপারে আপত্তিটা কী ছিল?' 'কোন কোন শিক্ষক ভেবেছেন প্রেমের দৃশ্যগুলো উপযুক্ত নয় সত্যিই কি? "কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, মেয়েদের একটি বড় সংখ্যা আজকাল মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাদের প্রেম সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। আমি প্রস্তাব করছি দুটো বইই বিকল্প হিসেবে রাখতে।" এভাবেই ছাত্ররা, কিংবা বলা যায় তাদের শিক্ষকরা প্রলোভনের বেদনা বা বাঘ শিকারের রোমাঞ্চের মধ্যে বেছে নেয়ার সুযোগ পেলেন, আর বই বিক্রেতারাও তাকের ওপর Vicar of Wakefield প্রদর্শনের সুযোগ পেল।

স্কুলের ভেতরের ব্যাপারে কিছুই এরপর আর আমি দেখতে পাইনি। ছাত্ররা সব সময়েই আশ্বস্ত করেছে যে, বেশির ভাগই ছিল খুব ভয়াবহ অবস্থায়। শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করলে তাদের তো সেখানে থাকারই কথা নয়। কিন্তু শামসুল হুদার কাছ থেকে আমি শিক্ষকতার বিপদের কথাও কিছু জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিলাম। একটি বাংলা কবিতা পড়ানোর কারণে একটি স্কুলের চাকরি থেকে ওকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গীতাঞ্জলির একটি কবিতা যেটি কবির নিজের ইংরেজি রূপান্তরে এমনভাবে শুরু হয়—

Where the mind is without fear and the
head held high,
Where knowledge is free,
Where words come out of the depth of truth
and ends
Into the heaven of freedom, O my father,
My country awaken.

চোদ্দ বছরের ছেলেদের জন্য বেশি বিমূর্ত মনে করে, ও চেষ্টা করল ছবির সাহায্যে অর্থটা সহজ করে তুলতে। Where the mind is without fear.' আমাদের জন্য কি একথা সত্য? আমরা অনেক ধার্মিক লোকেদের চিনি যাঁরা জরুরি কাজে বাইরে যাওয়ার সময় হাঁচি এলে সেটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করেন, যাত্রা আরেক দিনের জন্য স্থগিত রাখেন। তাঁরা কি ভয়শূন্য? Where knowledge is free. পূর্ব পাকিস্তানে কি এমন একটিও কারিগরি মহাবিদ্যালয় আছে যেখানে আমরা বিনামূল্যে বা অর্থমূল্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে পারি? এভাবে প্রতিটি ছত্র হিন্দু-মুসলিম জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা থেকে উদাহরণ নিয়ে ও বুঝিয়েছে। ক্লাসের পর কিছু ছাত্র প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ জানাল যে সে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে। ওকে অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নিতে বলা হলো। আমি বলতে পারছি না যে, এই ঘটনাটি একটি নমুনা বা আদর্শ, কিন্তু এর উপাদানগুলো, যেমন শিক্ষকের এই বোধ, যে, কবিতার একটি জীবন্ত আবেদন আছে, আবার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আহত সচেতনতা, অধ্যক্ষের নার্ভাস বা উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া, সবই স্থান ও কালের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বন্দ্বও উত্তেজনা

একজন প্রতিবেদককে যদি এদেশের জন্মের সময়টিতে একটি তথ্যনিষ্ঠ ছবি উপস্থাপন করার কাজ দেয়া হত, নিশ্চিতভাবেই তিনি শুরু করতেন কৃষকদের প্রচণ্ড দারিদ্র্য দিয়ে যে কৃষকরা এদেশের জনসংখ্যার প্রায় পুরোটা ; তিনি দেখতে পেতেন যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের রেখে-যাওয়া চিহ্ন, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা যাকে গ্রামে দুর্ভিক্ষ বলে না, ঘনঘন ঘটে-যাওয়া বন্যার ফলে মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি এবং তাদের যানবাহনের ক্ষয়ক্ষতি। এগুলো ধর্মের উপজাত কিছু নয়। পূর্ববঙ্গ দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটি, কিন্তু দেশ-বিভাগ তাকে আরও দরিদ্র করেছে। উদাহরণস্বরূপ সেখানে যে পাট উৎপাদিত হয় সবই পশ্চিমের কারখানায় চলে যায়। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে প্রতিটি পরিবারই আংশিকভাবে কলকাতা বা তার কাছাকাছি কোন কারখানায় কর্মরত সদস্যদের পাঠানো অর্থের ওপর নির্ভরশীল ; সে-টাকাও খুব নিয়মিত আসে না, এবং পুরোপুরি থেমে যায় যখন সম্পর্ক খারাপ হয়ে ওঠে এবং দুই দেশের ভেতরে মুদ্রা-বিনিময় প্রথা ভেঙে পড়ে। এর সাথে আছে বিহার ও বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুর স্রোত, অন্যরা বেশির ভাগই পাঞ্জাব থেকে সাথে করে টাকা নিয়ে এসেছে এবং এনেছে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দক্ষতা কিন্তু সেইসাথে এনেছে একটি অপরিচিত ভাষা এবং দেশজ জীবনপ্রণালীর প্রতি ঘৃণা। একই রকম অভিনিষ্ক্রমণও ঘটছিল। কিন্তু দুই ধরনের অভিবাসীরাই পরস্পরের পরিবর্তিত জায়গায় খুব মানিয়ে গুছিয়ে বসতে পারছিল না, তারা দুদিকেই বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তাকে তিক্ত বা তীব্র করে তুলছিল। পূর্ব পাকিস্তানে এমন অবস্থাও হয়েছিল যে মরিয়া হয়ে-ওঠা মুসলিম গ্রামবাসীরা, হয়তবা হিন্দুদেরকে গোপনে ঈর্ষাই করছিল তাদের একটি পালিয়ে যাবার জায়গা আছে ভেবে। যদি ওদেরও তাই থাকত তবে ওরা হয়ত কলকাতার শিয়ালদা স্টেশনটি একবার দেখে আর একবার ভেবে নিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাড্ডিসার শরীর আর হতাশ দৃষ্টি নিয়ে পরিবার-পরিজনসুদ্ধ কার্পেটের মতো পুরু হয়ে শুয়ে থাকা মানবকুণ্ডলীর গায়ে পা না ফেলে যেখানে চলাই দুষ্কর :

"রেলস্টেশনের হলঘরে রাস্তার পাশে ফুটপাতে, তারা ভিক্ষে করছে,
শূন্যদৃষ্টি তাদের চোখকে আরো বড় করে তুলেছে,
শূন্য একটি ঘড়ির মতো কেবল সময় গুনছে।"

আমি যখন স্টিফেন স্পেনডারের এই পঙ্‌ক্তিগুলো পড়ছিলাম, তখন আমি এবং যে-ছাত্রদের পড়াচ্ছিলাম তারা সবাই ভেবেছি কেবলমাত্র শিয়ালদাকে নিয়েই এমন পংক্তি লেখা যায়, যতক্ষণ না কবিতাটির রচনাকাল আমাদের জানিয়ে দিল যে অন্য সময়, অন্য স্থানেও মানুষ একই উদাসীনতা নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা করেছে ; যেন এটা আমাদের চরিত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। যে-কেউ দেশটিকে তার প্রেক্ষাপটে দেখতে চাইবে তাকেই এই দুর্দশার গভীর থেকে শুরু করতে হবে, এবং প্রশ্ন করতে হবে, রাজনীতিবিদরা যেসব আদর্শের কথা বলে ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন তার সাথে এসবের কী সম্পর্ক? প্রাথমিক দৃষ্টিতে কিছু না : কী করতে হবে রাজনীতিবিদরা তা যেমন জানতেন না, সেটা জানা জরুরিও মনে করলেন না। কারণ সাধারণত নতুন কিছু না হলেও, এ-ধরনের দারিদ্র্য, আক্রান্তদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে না।

কিন্তু আমি সেখানে ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে যার কাজ ছিল যেভাবে পরিস্থিতিটাকে দেখতে পেরেছি সেভাবেই মেনে নেয়া এবং আমার কাজের অংশটুকু সম্পন্ন করা, যার প্রান্তিক কার্যক্রম হচ্ছে—এইসব ছাত্রদেরকে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো যারা এসব ঘটনাবলীর সাথে আমার চাইতে গভীরভাবে জড়িত। আমি ঘনঘন গ্রামে যেতাম না। নিজের কানে শুনতে পেতাম না ঢাকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকেরা কী বলাবলি করছে ; তাই কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিফলিত ঘটনাবলী দিয়েই দেশের সমস্যাকে বর্ণনা করতে পারি। এমনকি আমার বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে, ছাত্রদের অতীত পটভূমির অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে মূল্যবোধগুলোকে অদ্ভুতভাবে পাল্টে দিত। যেমন আমার মনে পড়ছে, সীমান্ত অঞ্চলের কোন জেলা থেকে আসা দাড়িঅলা ছাত্রটির কথা, যে এম এ পরীক্ষার জন্য ভাইভা বোর্ডের মুখোমুখি বসেছিল। যদিও খুব মেধাবী ছাত্র সে ছিল না, সে খুব সৎ ছিল। বহিঃস্থ পরীক্ষকের প্রশ্ন : "কোন্ নাটকটি তোমার সব চাইতে ভালো লেগেছে এবং কেন?" জবাবে সে বলল : কীডের Spanish Tragedy, কারণ এটা খুবই জীবনঘনিষ্ঠ। যখন পরীক্ষক এমন উদার মূল্যায়নে বিস্মিত হয়ে তাকে ব্যাখ্যা করতে বললেন, সে খুব সরল আন্তরিকতার সাথে বলল, এইসব হত্যা, আত্মহত্যা, প্রতিশোধ—এগুলো আমার কাছে বাস্তবজীবনের মতোই মনে হয়। আমি খুব অবাক হয়ে ভাবছিলাম এলিজাবেথীয় দর্শকরাও হয়ত এগুলোকে তাদের অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবেই শনাক্ত করেছিল এবং তারা 'প্রতিশোধের ট্র্যাজেডি'কে আধুনিক সমালোচকরা যেমন ভেবেছিলেন তার চাইতে কম গ্রন্থগত সেনেকান ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে দেখেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি আরও অনেক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছিল। কিন্তু দেশের সমস্যাগুলো এত জরুরি ছিল যে তাকে সাহিত্যের পার্শ্বপ্রদীপে আলোচনা করা হয়ত সঠিক নয়। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ উদ্দামতা একটি নষ্ট আয়না, কিন্তু তাতে সেসব প্রতিফলিত হচ্ছিল এবং আমি চেষ্টা করব এইসব বিপরীত স্রোতের উৎস খুঁজতে, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা স্পষ্টভাবে দেখতে পারি, সেভাবে। যদি আমি ভুল করি তা হলে প্রশিক্ষণের অভাবে নয়, কারণ ছাত্র ও সহকর্মীরা সবসময়ে বিভিন্ন ধরনের মতামতকে ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন। সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বিশেষ করে বাংলা, বাক্‌স্বাধীনতাকে ফলপ্রসূভাবে দমন করার জন্য সর্বশেষ স্থান। সেখানে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল, দেশবিভাগের কারণ ও ফলাফল হিসেবে এবং আরও একটি সমস্যা ছিল, যার সমাধান কখনওই হবার নয়—তা হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা। তারা ভিন্ন ছিল কিন্তু বিচ্ছিন্ন হবার মতো নয়।

ইতিমধ্যেই বাংলা তার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভাগ পেয়েছে। ছিল কলকাতায় পথযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দুটো দিন যেগুলো ভারতের অন্যান্য স্থানেও সন্ত্রাসের স্পর্শ দিয়েছিল,, এবং নোয়াখালীতে, পূর্ববঙ্গের একটি দরিদ্র ও দূরবর্তী কৃষিপ্রধান জেলাতে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে প্রতিটি স্থানে মহাত্মা গান্ধী পায়ে হেঁটে গেছেন, এবং দরিদ্রদের কুটিরে, মাটির ওপর বসেছিলেন যতক্ষণ না শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুরশিদ, যে তখন কলকাতায় ছিল, আমাকে বলল যে, সেই অভিজ্ঞতা অবর্ণনীয় ও অবিস্মরণীয়। ও মহাত্মাকে দেখতে পায়নি কিন্তু অনুভব করতে পারছিল যে তার চারপাশে ক্রমশ ঘৃণার ঢেউ মিলিয়ে যাচ্ছিল যতক্ষণ না হঠাৎ পথে পথে ভয়ের বদলে দেখা দিল বন্ধুত্ব। (মুসলমানরাই প্রথমে এটা শুরু করেছিল, কিন্তু তার সাথে দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের কী সম্পর্ক যারা মারতে বা মরতে, কোনটাই চায়নি?) ঢাকাতেও দাঙ্গা হয়েছিল এবং আমি আসার খুব বেশি দিন আগে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও রক্তপাত ঘটেছে। অন্যান্য জায়গার মতো ছড়িয়েও পড়েছিল ছাত্রীদের একটি অনুষ্ঠানে।

আমি যখন এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, সবাই নিরুত্তর থেকেছে। কিন্তু আমি জানতে পেরেছিলাম যে উস্কানিটা এসেছিল একটি নাটক থেকে যেখানে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের ক'টি পঙ্‌ক্তি গাওয়া হয়েছিল। এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এমন ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত করে যে, ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহখানেক মহিলারা এবং হিন্দু ছাত্ররা প্রকাশ্যে বের হতে পারেনি। সে-সময় দেশ-বিভাগ একটি জ্বলন্ত সমস্যা, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সত্য নয় এবং মুসলিম ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে পথে বেরিয়ে দিনের পর দিন চিৎকার করছে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। হিন্দুরা দ্রুত এবং অবিরাম সীমান্ত পার হচ্ছিল এবং যারা রয়ে যাচ্ছিল তাদের বিচলিত বোধ স্পষ্টতই বোধগম্য যেমন বোধগম্য, নীতিগতভাবেই হোক, বা প্রয়োজনেই হোক, যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদের শঙ্কা ও আতঙ্ক। ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে আরও একটি বহুবিস্তৃত দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, যে-প্রসঙ্গে আমি পরে লিখব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিল, দেশ-বিভাগের আগে পর্যন্ত তারা ছিল প্রভাবশালী সচ্ছল সংখ্যালঘু। এখন, উঁচুশ্রেণীর যারা এদেশে থাকাটা বেছে নিলেন, তাঁদের জন্যে এটা ছিল নিজেদেরকে জনজীবনের খুবই নগণ্য ভূমিকায় দেখার দণ্ড দেয়া। কেউ কেউ তা-ই করলেন। তাঁরা যদিও ভালো ছিলেন না, গোলযোগ পাঞ্জাবের মতো অতি ভয়ঙ্কর ও ব্যাপকও ছিল না এবং চিন্তা করা সম্ভব ছিল যে উন্মত্ততাটা শেষ হয়েছে। তা ছাড়া একটি দেশে যারা বাস করে তাদের জন্য সরকারই একমাত্র বিষয় যা গুরুত্বপুর্ণ। তাঁরা রয়ে গেলেন কারণ এটা তাঁদের দেশ, বাড়ি-ঘর, যেখানে তাঁরা বিদেশীদের মতো অনুভব করেন না। কয়েকজন, যাঁদের মধ্যে বেশ ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মফস্বল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁরা ভেবেছেন এখানে তাঁদের কাজ আছে এবং এখানে থেকে তাঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কেউ-কেউ রয়ে গেলেন হয়তবা এই ভেবে যে অন্তত বাংলায় দেশ-বিভাগ টিকবে না। স্বেচ্ছায় থাকতে ইচ্ছুক এমন কাউকে কাউকে ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, নীতির কারণে চলে যেতে হলো। যেমন ঢাকায়, সবসময়ে যেন হিন্দুদের বাড়িগুলোই আগত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য দখল করা হত। সেগুলোই ছিল সবচাইতে বড় ও সুবিধাজনক বাড়ি আর সেগুলোর মালিকদের তা প্রতিরোধ করার মতো অবস্থা ছিল না।

কিন্তু দেশান্তরির সংখ্যা ছিল বিরাট এবং যেহেতু হিন্দুরাই ছিল সবচাইতে শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়কেই ব্যাপারটা আঘাত করল সবচাইতে বেশি। অনেক অধ্যাপক রয়ে গেলেন এই কারণে যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাঁদের জন্য শূন্য পদ নেই, কিন্তু তাঁরা অস্বস্তির সাথে রয়ে গেলেন, সিনেট অথবা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভায় তাঁদের কণ্ঠ জোরালো করে তুলতে ভীত। প্রভাষকরা এর চাইতে সহজে স্থান করে নিলেন। ইংরেজি বিভাগে নয়জনের মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম ছিলেন। অন্যদের মধ্যে চারজন ক্রিশমাসের মধ্যে সীমান্ত পাড়ি দিলেন এবং পঞ্চম জন পরের বছরের শুরুতে। বোধগম্যভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় তার অভিজ্ঞ কর্মচারীদের এই মিলিয়ে যাওয়া দেখতে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু তাদেরকে আশ্বস্ত করার বদলে—যা হয়ত সত্যিই সে করতে পারত না সরকারি নীতির অনিশ্চয়তার কারণে— সে তাদেরকে প্রায় দমনমূলক পদ্ধতি দিয়ে বেঁধে রাখতে চাইল, যেমন পেনশন স্কীমের বদলে পাওয়া যায় যে-প্রভিডেন্ট ফান্ড সেই টাকা দিতে অস্বীকার করে। বেশির ভাগ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হত পিতৃতান্ত্রিকভাবে : বিভাগীয় প্রধানের ব্যক্তিগত পত্র ছাড়া একজন প্রভাষক নির্ধারিত সময় এসে গেলেও তার বেতনের নিয়মিত বৃদ্ধির টাকা পাবে না, তুলতে পারবে না প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিজস্ব জমা দেয়া টাকাও—এমনকি প্রচণ্ড ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। শুরুতেই, তাই, আমার সামনে একটি অস্বস্তিকর কাজ ছিল—আমার কর্মচারীর চলে যাওয়ার অধিকারকে রক্ষা করা, যা কিনা ন্যায়ত আমি বাধা দিতে পারি না, যখন তাদের এই চর্চার ফলে বিভাগ প্রায় পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে তখনও। কোনরকমে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা সামাল দিলাম, যারা যেতে চেয়েছে প্রত্যেকে চলে গেল। এবং ১৯৪৮ সালে আমরা বেশ মিশ্র একটি দল পেলাম— চারজন হিন্দু, যাদের যাবার কোন ইচ্ছে নেই, তিনজন মুসলিম, একজন ভারতীয় ক্যাথলিক এবং আমি।

ছাত্রদের বিন্যাসও বদলে যাচ্ছিল। হিন্দু ছাত্রদের হোস্টেল জগন্নাথ হল ১৯৪৭ সালে কোনভাবেই শূন্য ছিল বলা যায় না। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা সংকুচিত হচ্ছিল। মহিলা ছাত্রীবাসের তত্ত্বাবধায়ক, একজন হিন্দু মহিলা, আমাদের বিভাগের প্রভাষক ছিলেন এবং তাঁর পদে চুপচাপ রয়ে গেলেন, কিন্তু আবাসিক ছাত্রীরা বেশির ভাগই উচ্চ ও অভিজাত বংশীয়া মুসলিম যেহেতু নারীশিক্ষা এখনও একটি অভিজাত শ্রেণীগত ধারনা যা ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচিত। মুসলিম ছাত্রাবাস গুলো ছাত্রদের দ্বারা পরিপূর্ণ। অনেকেই খোরশেদের মতো একেবারেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রাম থেকে আসছিল, কখনও কখনও তাদের বাবা-মার প্রচণ্ড আত্মত্যাগের ফলে, কেউ-কেউ বাচ্চাদের পড়িয়ে খরচের টাকা জোগাড় করত বা অন্য যে-কোন ধরনের অর্থকরী কাজ করে। তারা নিজেদেরকে জনপ্রশাসনের উচ্চতর ক্ষেত্রের পদের জন্য যোগ্য করে তুলছিল অথবা উচ্চতর শিক্ষকতার ক্ষেত্রে, আগে যেগুলো বেশির ভাগই হিন্দুরা পেত। এই অর্থে পাকিস্তানের সৃষ্টি ছিল একটি সামাজিক বিপ্লব যদিও এ-রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখার আদর্শটি সামাজিক ছিল না, ছিল ধর্মীয়।

একথা বলা অসম্ভব, এবং ইতিহাসেও গুরুত্বহীন যে, ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য দাবিটি কিছু ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদের একটি অজুহাত ছিল। নেতাদের একটি আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল আর আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল উদ্বুদ্ধ করার মতো আদর্শের এবং যদি সাধারণ মুসলিমরা এটিকে বাস্তবায়িত করার যোগ্য আদর্শ হিসেবে না দেখত তবে তারা যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে ও উচ্চকণ্ঠে দাবি তুলছে তা করত না। তখন আবার কথা হত, তাদের দাবি কিছুটা এই সচেতনতা থেকে যে তারা একটু হতাশাগ্রস্ত সম্প্রদায়, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হিন্দুদের উত্থানের ফলে—অই আশায় তারা মিলিত যে অবিভক্ত ভারতে যা পাওয়া সম্ভব নয়, একটি নতুন পৃথক রাষ্ট্রে তা-ই পাবে? বেশ জটিল প্রশ্ন, উত্তর খোঁজার জন্য। অবিভক্ত ভারতে একটি সার্বজনীন বিষয় ভেবে পাওয়া বেশ কঠিন ; গরুজবাই ছাড়া—যেখানে মুসলিমরা মুসলিম হিসেবে একদিকে থাকবে, হিন্দুরা হিন্দু হিসেবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে তাত্ত্বিকের দেখার ভঙ্গি। জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত মুহূর্তগুলো ছাড়া প্রতিদিনের রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে পারিবারিক, বর্ণগত ও সাম্প্রদায়িকভাবে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত সংশ্রব যা কিনা যে-কারও কোন সরকারি পদে নিয়োগকে ধরে নিতো কিছু বেতনভোগী পদে বা লাভজনক ঠিকাদারিত্বে তার সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্ব। একটি সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে 'স্ব-শাসনের' জন্য প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইংরেজ পরিকল্পনার এটাই স্বাভাবিক ফল। এতে ভারতীয়রা সংসদে আসন পাবে এবং কিছু মন্ত্রীর পদ, কিন্তু সরকারের হাতেই ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকবে যাতে প্রয়োজনে তাদের সিদ্ধান্ত খারিজ করা যায়। নীতি প্রণয়নের দায়িত্বের চাইতে পদগুলোর মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য আরও আকর্ষক করে তোলা নিশ্চিত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। 'যদি মুসলিমরা সব ভালো পদগুলো না পায় তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে কী লাভ?' কথাটা আপাতত শুনতে খুব সরল মনে হলেও যদ্দুর মনে হয় খুব গুরুত্বপুর্ণও বটে, কেবল মানব-প্রকৃতিতে নেই সেখানেই থেমে থাকা। 'যদি ইসলামের নীতিগুলোকেই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা না যায় ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে লাভ কী?' একজন বিশ্বাসীর জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন। তার মানে কি, একটি ধর্মরাষ্ট্র, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে পিউরিটানরা যা করতে চেয়েছিল? কোরানের অক্ষর অনুযায়ী চলার দৃঢ়সংকল্প, মোল্লাদের আধ্যাত্মিক স্বৈরতন্ত্র, অবিশ্বাসীদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব? হয়ত অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম বিশেষ করে... অ-অভিজাতদের মধ্যে, বলবেন, হ্যাঁ, কিন্তু আরও অনেকে আছেন, যাঁরা কম ধর্মপ্রাণ নন, যেমন আছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যাঁদের কাছে অসহিষ্ণুতার অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা। পাকিস্তানে বহুলপ্রচলিত একটি গল্প যেটি মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের বইয়েও গ্রন্থিত হয়, জানায় কী করে একটি অতি বৃদ্ধ লোক আব্রাহামের কাছে রাতের জন্য আশ্রয় চাইতে আসে। আব্রাহাম আতিথেয়তার সাথে তাকে গ্রহণ করেন যতক্ষণ না খাবার টেবিলে লোকটি জানায় যে সে অবিশ্বাসী। ক্রোধোন্মত্ত গৃহকর্তা হয়ত তক্ষুনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতেন যদিনা আল্লাহ তাঁকে নিবৃত্ত করতেন, 'আব্রাহাম, আমি এই লোকটিকে একশো বছর সহ্য করেছি, তুমি একরাত করতে পারবে না!'

তাই হিন্দুদের প্রতি মনোভাবকে সহজে বোঝানো যাবে না। যে-সত্যগুলো প্রকাশ হয়েছে সেগুলো মিথ্যে মনে হবে যদি আমি বলি বাংলায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঘৃণা খুব গভীরে প্রবেশ করেনি, তবু সেই ধারণাই আমার হয়েছে, কারণ সেটাই আমি খুঁজে ফিরছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলিমদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোন চাপ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি ছিল একজন হিন্দু ছাত্র। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সবাই তাকে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত, এমনকি পরে যখন একটি ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সে বহিষ্কৃত হয় তখনও। যখন হিন্দু শিক্ষকরা থাকার জন্য প্রস্তুতি নিলেন, ছাত্ররা সহকর্মীরা কেউই বিন্দুমাত্র বৈরিতা প্রদর্শন করেননি। প্রশাসন করেছিল, হয়তবা সরকারও করেছিল এবং প্রতিবাদের এমন প্রাণবন্ত মুহূর্তও ছিল যখন ছাত্ররা দেখত বা মনে করত যে তারা দেখতে পেত, যেসব শিক্ষককে তারা শ্রদ্ধা করে, তাঁদের ওপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমাকে কমই যেতে হত। কিন্তু যদিও নোয়াখালীর ট্র্যাজেডির প্রতি সারা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন গান্ধীজি, যখন সেখানে তিনি শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন ; নোয়াখালী জেলার ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য গ্রাম কখনওই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি কারণ সেখানে এখনও হিন্দু ও মুসলমানেরা শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছে পাশাপাশি। ঢাকায় ১৯৪৭-এর শরৎকালে সম্পর্কগুলো বেশ সুখী মনে হচ্ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে ঢাকায় বৃহৎ হিন্দু উৎসব হচ্ছে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে জন্মাষ্টমী উৎসব এবং আমার একজন হিন্দু সহকর্মী আমাকে এই উপলক্ষে মিছিল দেখার আমন্ত্রণ জানালেন প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তার পাশে একটি দোকান থেকে যেখানে তিনি বসার ব্যবস্থাও করেছেন। সারা শহর যেন এটা দেখতে বেরিয়ে পড়েছে এবং ব্যাপারটাও দেখার মতো ছিল। ইউরোপে আজকাল আর দেখা যায় না, যে-মিরাকল নাটকগুলো, অনেকটা যেন সেই নাটক মঞ্চায়নের মতো ব্যাপারই। ব্যতিক্রম এই যে, মঞ্চায়িত নাটকের দৃশ্যের বদলে গাড়িতে জীবন্ত চিত্র ও প্রতীকী চিত্র বহন করা হচ্ছিল। কিছু ছিল মোটরগাড়ি, কিছু ষাঁড়ে-টানা, কিছু মানুষের দল বাহিত, ঠিক মনে পড়েছে, সত্যিকারের হাতিও ছিল একটি, একটি নকল হাতি এবং একটি হাতির সাজে মহিষ। শহরের বিভিন্ন সংঘ নিশ্চয়ই মঞ্চগুলো সাজানোর ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করেছে। সেগুলো জাঁকজমকপূর্ণ সাজে সজ্জিত, রঙিন কাপড়, বিজলিবাতি আর ফুলের মালার পাহাড়। বেশির ভাগেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা দেখানো হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ও স্বাধীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন- কোনটায় স্বাধীনতার জয় দেখানো হয়েছে। একটি দেখাল, নিশ্চয়ই সেটি কোন তাঁতি গোষ্ঠীর তৈরি, দেখাল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকদের দ্বারা দেশীয় কুটিরশিল্পী তাঁতিদের পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। ইতিহাস যেমন বলে, তারা এটি করেছিল ব্যবসায়িক ঈর্ষা থেকে। সবচাইতে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দদায়ক প্রদর্শনীটি দেখায় একদল দুর্বল সন্ন্যাসী, তারা একটি ব্যানার নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যাতে ঘোষণা করা হচ্ছে; 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই না'। আমার মনে হয় এই শোভাযাত্রা সঙ্গীতের শব্দের সাথে প্রায় ঘণ্টাখানেকের ওপর চলল। হঠাৎ কী যেন ঘটল। সেটা কী আমি কখনওই নিশ্চিত করে জানব না কারণ দূরে একটি গোলমেলে চিৎকারের শব্দে দোকানদার দ্রুত ঝাঁপ টেনে দিল, সবাই উত্তেজিত হয়ে বাংলায় কথা বলতে লাগল, কেউ বুদ্ধি করে চা পরিবেশন করল। আমরা যখন আবার ঝাঁপ খুললাম, রাস্তা নীরব এবং প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে। যত গোলমালই থাকুক, শান্তি বিঘ্নিত হবার আগেই তা দমন করা হয়েছিল, কোথাও সংঘর্ষের বা ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি ; কিন্তু আপাত ও দৃশ্যত নির্লিপ্ততার আড়ালে হিন্দু স্নায়ুতন্ত্র উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিল, কোন বিপদের ভয়ে। পরে আমি এই কিছু না-ঘটার ব্যাপারেও প্রচুর গুজব শুনেছি। তার মধ্যে সবচাইতে দৃশ্যমান গুজবটি হলো, মিছিলটি ভেঙে দেয়ার একটি ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন, সদয় ও সহানুভূতিশীল একজন মানুষ, যিনি একটি তাসের প্যাকেটের হরতনের রাজার মতো চেহারা নিয়ে বিরাজ করেন, ঐ চেষ্টাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন গান্ধীজির কৌশল অবলম্বনে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ে। যদি এমনটি না-ও ঘটে থাকে, এটা নিশ্চিতভাবেই সঠিক বানানো গল্প। সত্য হোক বা না-হোক, তাঁর শান্তিকামনার সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছে এটি। কিন্তু সর্বশেষবারের মতোই ঢাকা জন্মাষ্টমীতে এবার আনন্দ করেছিল। ১৯৪৮ সালের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি একে দখল করে নিল। তার পরও হিন্দু ছুটিগুলোকে সম্মান করা হত— যেমন আমি যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে এম এ মৌখিক পরীক্ষার জন্য একটি দিনের কথা বলেছিলাম কমিটির সবাই জানাল সেদিনটি বিদ্যার দেবীর পুজোর দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হয়, একথা সঠিকভাবে বলা যায় যে, পাকিস্তান অর্জনে গর্বিত, তরুণ বাঙালি মুসলমানরা, যে-সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গিয়েছিল তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জয়ীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অতীতের সবকিছুকে ভুলে যেতে ও ক্ষমা করতে উদারভাবে প্রস্তুত ছিল। এখন, যখন, হিন্দুরা তাঁদের মাথার উপর চেপে নেই, তারা মনে করতে পারল যে, তারাও বাঙালি, একই সভ্যতা ও ভাষার অংশীদার, একই মনের অধিকারী এবং যাঁরা স্বেচ্ছায় রয়ে গেলেন তাদের দেশপ্রেমকে সম্মান করতে পারছিল। সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে চিন্তা করতে হবে, চাইলে কেউ কলকাতার সাথে বিচ্ছিন্নতার বেদনাকে অবশ করা ব্যাথার চাইতে মুক্তির আস্বাদ হিসেবেও ভাবতে পারে। এমন যুক্তিও আমি শুনেছিলাম যে, পূর্ববঙ্গ কখনওই বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে তার পূর্ণ অবদান রাখতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গীয় লেখক ও কলকাতার অধিবাসীদের প্রবল প্রভাবের কারণে। কিন্তু পূর্বের নিজস্ব সত্তা ছিল, ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং লোক ঐতিহ্যের অনাবিষ্কৃত সম্পদসম্ভার ছিল, যেন কেবলমাত্র এক বলিষ্ঠ রেনেসাঁর উপাদানে পরিণত হবার জন্যে কোন সৃজনশীল মেধার প্রতীক্ষায়। এবং এখানে যেমন, সন্দেহ নেই পশ্চিম পাকিস্তানেও গভীর ও উদার চিন্তাধারা বয়ে যাচ্ছিল, ইসলামের মূলভিত্তির ব্যাপারে, আধুনিক নিয়মনীতির মাঝে কীভাবে সেসব বাস্তবায়ন করা যায় সে-ব্যাপারে। যদিও আমি অজ্ঞ ছিলাম, এখনও যেমন আছি, আমি দেখছিলাম ব্যাপারটি কাজ করছে। কিছু কিছু ব্যাপারে প্রত্যাশার পরিবেশটি যেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফরাসি বিপ্লবের সময়ে যেমন দেখেছিলেন তেমন ছিল—

In which the meagre, stale, forbidding ways
Of custom, law and statute, took at once
The attraction of a country of romance.

(যেখানে তুচ্ছ, বিবর্ণ, আইন, বিধিনিষেধের বেড়াজাল, মুহূর্তে দুঃসাহসী অভিযানের দেশের জন্য আকর্ষণীয় রূপ নিল)

কিন্তু শিগ্‌গিরই এই সব কিছু ক্রোধের মেঘে আবৃত হয়ে গেল। এমনকি পশ্চাৎদৃষ্টি দিয়েও বোঝা কঠিন ছিল কীভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়। এই জাতির জন্ম হলো যে-নীতি বা আদর্শ থেকে তা হলো ইসলামী জাতীয়তাবাদের একটি সর্বব্যাপী বন্ধন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর স্বীকৃতির জন্যে লড়াই চলছিল ততক্ষণ তা সত্য ছিল। সেই অর্জন যখন হয়ে গেল, মানবসম্প্রদায়কে বিভক্ত বা ঐক্যবদ্ধ করে অন্য যেসব শক্তি, সেগুলো সবই জীবনে প্রবেশের পথ পেল। পাকিস্তানের দুটো অংশ প্রায় হাজার মাইলব্যাপী বৈরী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তাদের জলবায়ু আলাদা, মানসিক ও শারীরিক গঠনে মানুষেরাও আলাদা, আলাদা তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, খাঁবার, যে-ভাষায় কথা বলে ও লেখে— সে-ভাষা। ইসলাম যদি ঐক্যের খুব শক্তিশালী বাঁধন না হয়, তবে কোনকিছুই তা নয়।

পূর্ব পাকিস্তানে জনগোষ্ঠী বৃহত্তর, কিন্তু প্রথম থেকেই পশ্চিম শাসন করছিল, তার ছিল সম্পদ, ছিল রাজনৈতিক একনিষ্ঠতা এবং তার ছিল সেনাবাহিনী। ব্রিটিশরা বাঙালিদের সেনাবাহিনীর অনুপযুক্ত মনে করত, কিন্তু তারা উত্তর সীমান্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপজাতিদের এবং পাঞ্জাবি, শিখ ও মুসলিম উভয়কেই খুঁজে পেয়েছিল, চমৎকার উপাদান হিসেবে এবং তাদেরকে দেখাশুনা করেছে কৃষক ও সৈন্য দুইভাবেই। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ছিল করাচিতে, সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানকে খুব কম স্বায়ত্তশাসনই দিয়েছিল এবং কেউই স্বীকার করত না যে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা সেখানকার জনগণের কণ্ঠস্বর।

একটি শাসনতান্ত্রিক পরিষদ ছিল কিন্তু সংসদীয় নির্বাচন ছিল না, তাই পরিষদ-প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করত। নিয়মিত নির্বাচন সেই সময়ে একটি যোগ্য অথবা খাঁটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ দেবে কি না এমন প্রশ্ন আমি কখনও উঠতে দেখিনি। নির্বাচন যখন প্রথমবারের মতো হলো, খোরশেদ আমাকে বলেছিল যে ওর গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা তাকেই ওদের গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত লোক ভেবে উপদেশ চাইতে এসেছিল কাকে ভোট দেবে, যেহেতু তারা ভেবেছিল পুরো গ্রামেরই একজোট হয়ে ভোট দেয়া উচিত। এটাকে আমার কাছে একধরনের গণতন্ত্র বলে মনে হয়েছে কিন্তু ঠিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার যে-ধরনের গণতন্ত্রে থাকে সে-ধরনের নয়, সংবিধান জনগণের কাছ থেকে গড়ে ওঠেনি এবং তারা রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি যে বুঝতে পারবে সেটা দিয়ে কী করবে।

বাঙালিদের কাছে, এই ভিনদেশী উর্দুভাষী বাহিনীকে মনে হত দখলদার সেনাবাহিনীর মতো। শিক্ষিতদের কাছে আরও বিরক্তিকর ছিল পাঞ্জাবি মুসলমানরা, উদ্বাস্তুরা, অভিযানকারীরা, সরকারি কর্মকর্তারা। তারা এসেছিল ব্যবসা চালাতে, কর্তৃত্বের পদগুলো পূরণ করতে আর সাধারণভাবে দায়িত্ব নিতে। তারা বাঙালিদের হেয়জ্ঞান করত, অযোগ্য মনে করত, রাজনৈতিকভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করত না, অবিশ্বাস করত তাদের দেশপ্রেম ও ভাষার জন্যে ভালোবাসা এবং হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধকে।

আমি আমার এক তরুণ সহকর্মী, যে কিছু উস্কানির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল, তাকে বললাম, "আমার মনে হয় পাঞ্জাবিদের চাইতে তোমাদের জন্যে হিন্দু শাসকরাই ভালো ছিল।" সে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ মন্তব্য করল, "অবশ্যই আমাদের তা-ই করা উচিত ছিল, তারা অন্তত আমাদেরই মতো একই জাতি। এই নতুন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শাসিত হবার জন্যে আমরা ব্রিটিশরাজের হাত থেকে মুক্ত হইনি।" একদিন সকালে কলেজে যাবার পথে, আমার ঠিক সামনে দু'জন ছাত্র খুব আগ্রহের সাথে একটু শান্তভাবে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। একজন আরেকজনকে বলছিল, "সবার আগে আমি একজন বাঙালি, তারপর একজন মুসলমান, তারপর একজন পাকিস্তানি"। ওর এই অগ্রাধিকারের মধ্যে যুক্তি ছিল, কারণ জন্মগতভাবে ও প্রথমটি, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচরণগতভাবে দ্বিতীয়টি এবং রাজনৈতিক একটি সিদ্ধান্তের কারণে তৃতীয়টি। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের মানে এই নয় যে, বাঙালি মুসলিমরা দেশবিভাগকে বাতিল করতে চায়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যকে ঘৃণা করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজাজের অসামঞ্জস্যতা ও ভাষার ব্যবধান ছাড়াও, পাঞ্জাবি ও বাঙালিরা অভিজ্ঞতার বিপুল পার্থক্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। আমার প্রথম কার্যকালের শুরুতে আমি একটি পাঞ্জাবি চা-চক্রে গিয়েছিলাম। আমাদের আপ্যায়নকারী ছিলেন একজন মজার মানুষ ও রসিক বক্তা এবং ঘুরে ঘুরে আলাপ চলল পৃথিবীকে নিয়ে যতক্ষণ না আলোচনাটি এসে থামল সাম্প্রতিককালে উত্তর ভারতে ঘটে-যাওয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে। এবং আলোচনাটি অতিরঞ্জিত এমন ভাবার কোন কারণ আমার জন্যে ছিল না। তবুও আমি আবেগের নিষ্ঠুরতা দেখে বিতৃষ্ণ বোধ করেছিলাম। হিন্দুরা, সর্বোপরি শিখরা ছিল 'অধঃপতিত', তারা ছিল 'মানবেতর', কোন শব্দই তাদের জন্যে যথেষ্ট খারাপ ছিল না, এবং কোন আচরণই তাদেরকে শেষ বা ধ্বংস করে দেয়ার মতো যথেষ্ট নয়। আমার মতো তারাও নিশ্চয়ই জানত যে নৃশংসতা যে-কোন এক পক্ষ থেকেই হোক-না কেন তা খারাপ, কিন্তু এর খবর চেপে যাওয়া হত। তারা কেবল তাদের বন্ধুদের প্রতি শত্রুদের অপরাধের কথা জানত। ইংল্যান্ডে দুটো বিশ্বযুদ্ধে, কেউ হয়ত কখনও এমন ক্রোধান্বিত আবেগের কথা শুনতে পেত, বেসামরিক নাগরিকদের চাইতে পেশাদার সৈন্যদের মুখে, এটা ছিল একটি অপেশাদার যুদ্ধ ; শতাব্দীব্যাপী জমে থাকা ঘৃণার বিস্ফোরণ। বাঙালিরা, হিন্দু বা মুসলিম, সেই সুরে কথা বলেনি, কিন্তু বাংলায় দাঙ্গা যদিও খারাপ ছিল তবুও অত ব্যাপক বিস্তৃত বা অত পাশবিক ছিল না। পাঞ্জাবে জনশক্তির বিনিময় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তান পরিণত হলো মুসলিম রাষ্ট্রে যেখানে আপোস করার মতো হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই ছিল না। আমার সন্দেহ হয়, পাকিস্তানের অর্ধেকও বুঝতে পেরেছিল কি-না এটা অন্যদের মনোভাবে কী পার্থক্য সৃষ্টি করবে। অনিয়মিতভাবে রাখা আমার ডায়েরিতে দেখতে পাই ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালের কথা, বম্বে-কলকাতা ট্রেনে বসে লেখা, যখন আমি নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরছিলাম—

ভ্রমণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি : একজন তরুণ পাকিস্তানি ছিলেন, বেলুচিস্তান থেকে আসা এক ভূস্বামীর পুত্র। চমৎকার এক তরুণ, পাকিস্তান ও তার গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত উৎসাহী। পূর্ববঙ্গীয় পাকিস্তানিদের ভেতরে এমন সমালোচনাহীন উৎসাহ সাধারণত দেখা যায় না। সমুদ্রযাত্রার শেষপর্যায়ের আগে পর্যন্ত সে জাহাজের ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসেনি। এ-যাত্রাটি দুবছর আগের ফ্রান্সোনিয়া থেকে একেবারে আলাদা, যখন স্বাধীনতার মানেই ছিল সবকিছু এবং দেশবিভাগকে ধারণাতেও আনা যায়নি। ফ্রিম্যান্টলে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন একটি অংশের এক পুলিশ কমিশনার ডেকের ওপর এলেন। আমার তাঁকে ভালো লাগল। খুব সত্যিকারভাবেই তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং আমার মনে হলো না, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে খুব জানেন ; পশ্চিম পাকিস্তান যেন জানতই না যে পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব আছে। এই দুজনসহ আর যাদের সাথেই হঠাৎ করে আলাপ হয়েছে এইরকম ধারণাই আমার হয়েছে। পাকিস্তানের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশ সরলমনা ছিল ; তাদের একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আছে এবং তারা অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যে, তারা এর মালিক। দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে তাদের মনে এবং ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গীয়দের চেয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ অনেক বেশি এবং পাকিস্তানে আর কেউ অন্যভাবে ব্যাপারটা দেখতে পারে এমন ধারণাই নেই। যখন আমি পুলিশ কমিশনারকে বললাম যে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার মতো কোন ভয়ই আমি দেখতে পাইনি, তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়, যেহেতু সব হিন্দুই চলে গেছে।' তাঁর কাছে এটা একটি বিস্ময়কর সংবাদ ছিল যে এখনও পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু আছে। তাঁর নিজের জেলায় সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে।

এই ঘটনা পাকিস্তানের জন্মের দুবছরের বেশি সময় পরে। এবং মাত্র দুমাসের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে আমার পরিতৃপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হলো। কিন্তু সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাহারে পূর্ণ ইংরেজি বিভাগে যে-কোন শিক্ষকই এমনটি বলতেন। এই নোটের মজাটা হলো এই যে, তখন এটাকে সঠিক বলেই মনে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে এমন পাকিস্তানী আমি পাইনি যারা দেশের এই অবস্থায় সুখী ছিল।

অতিসরলীকৃত রূপরেখায় ১৯৪৭-৪৮ সালের অবস্থাকে রাখলে, যেসব হিন্দু স্বেচ্ছায় থেকে গেলেন পূর্ব পাকিস্তানে, তাঁরা দেশবিভাগের ব্যাপারটিকে একটি সম্পন্ন সত্য বলে মেনে নিলেন। তাঁরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে তাঁদের অবদান রাখতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু অনুভব করতে পারছিলেন যে সরকারের চোখে তাঁদের অনুপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত না হলেও নিষিদ্ধ এর। বাঙালি মুসলিমরা নিজেদেরকে হিন্দুদের সাথে এক কাতারে দাঁড় করেছিল বাঙালি দেশপ্রেমের চেতনায়— যা ছিল রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক,— কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট কোন স্বাতন্ত্র্যবোধ নয়। তারা ভালো মুসলিম ও সেইসাথে ভালো বাঙালি হওয়া খুব অসম্ভব মনে করল না। পশ্চিম পাকিস্তানিরা করেছিল। আমার মনে হয়, তারা হয়ত দাবি করত যে, ইসলাম একটি সংস্কৃতি যাকে খুব উৎসাহের সাথে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে ; তারা নিশ্চিতভাবেই এই আন্তঃসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমকে অবিশ্বাস করত এবং দেখতে চাইত যে এখানেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে তাদের নিজের স্বদেশভূমির মতোই মেরামতের অযোগ্য ফাটল। তারা একই ভাষার বাঁধনশক্তির বিরুদ্ধেও ছিল যার কিনা ছিল গভীর প্রেমময় এক সাহিত্যিক ঐতিহ্য।

আমি এইসব মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষের কথা বললাম কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যা শুনতে ও দেখতে পেতাম, সে-সবই এই। অর্থনৈতিক দুর্দশা ছিল, যে ব্যাপারে বাঙালিরা গভীরভাবে উপলব্ধি করত ও স্বাধীনভাবে বলত, যে-ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞানও ছিল না, বিচার করার মতো তাৎক্ষণিক বুদ্ধিও ছিল না। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিসের একজন ইংরেজ, যিনি দেশটিকে আমার চেয়ে বেশি জেনেছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান সামরিকভাবে প্রতিরক্ষাযোগ্য নয় এবং রাজনৈতিকভাবেও নির্ভরযোগ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এখানে টাকা খাটাতে রাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। শিল্প গড়ে তুলে, যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা বা প্রকল্প নিয়ে একে কেবল আগ্রাসনের জন্যে লোভনীয় করে তোলা হবে। যুক্তিটি দেশের অধিবাসীদের কাছে আবেদন রাখেনি— বিশেষ করে যেহেতু আয়কর ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনের অধীনে—রাজ্য সরকারের নয়। কিন্তু বাস্তববাদী রাজনৈতিক পরিভাষায় আমি এর ঠিক উত্তর জানি না। যদ্দুর আমি দেখতে পারি, কেউই ভারতের সাথে পুনর্মিলন কাঙ্ক্ষিত বা সম্ভাব্য বলে গভীরভাবে ভাবছিল না। কিন্তু সীমান্তের দুই পারেই, যখনই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উচ্চকিত হত, মনে হত যেন একটি স্বাধীন যুক্তবাংলার জন্যে আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস উঠে আসত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাষা সমস্যা

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ সালের জার্নাল থেকে)

২৮শে ফেব্রুয়ারি শনিবার : বাংলা-উর্দু প্রশ্নে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ করে ছাত্ররা ক্রোধে ফেটে পড়ল। মিছিল শুরু হলো, স্লোগানে উচ্চকিত হলো সব। আমি দুপুর একটার সময় আমার এম এ প্রথম পর্বের ক্লাসে গেলাম, একটি ছাত্রী এগিয়ে এসে বলল সে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেবে, তাই ক্লাস করবে না। সেই ক্লাসে আর মোট দুজন ছাত্রছাত্রী ছিল। যা হোক সেই দুজন ছাত্র রয়ে গেল। আমি তো ক্লাস নিতে শুরু করলাম। করিডোরে এমন হৈ-হল্লা হচ্ছিল যে আমি শব্দ আটকাতে দরজার ছিটকিনি তুলে দিলাম। কিছুক্ষণের ভেতরেই বাইরে জনতা দরজা ধাক্কাতে লাগল। আমি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম তারা কী চায়। তারা বলল, 'আজ ধর্মঘট'। আমি বললাম যে, যতক্ষণ ক্লাস আছে আমি ক্লাস নেব। তাদের মুখপাত্র বলল, তারা ক্লাসের ছাত্রদের সাথে কথা বলতে চায়। এর ভেতর কোন দুর্বিনীত ভাব বা ঔদ্ধত্য ছিল না। কেবল ছাত্রদের ভিড়। এর মধ্যে সেই ছাত্র দুজন এদের দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারাও তাদের সাথে যাবে'।

এই আগুন কেন জ্বলে উঠল? আমি যদ্দুর জানতে পারলাম তা হলো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের একজন হিন্দু সদস্য প্রস্তাব এনেছিলেন যে পরিষদের কার্যবিবরণী উর্দু ও ইংরেজির মতো বাংলাতেও লেখা হোক। সে-প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রাসঙ্গিক বিতর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে যাতে বাঙালিদের মনে হয়েছে উর্দুভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা অসন্তোষ জানিয়েছে যে, ডাকটিকিট ও মনিঅর্ডার ফরমে উর্দুতে লেখা থাকে। এ ছাড়াও এটা খুবই 'অশুভ সংকেত' যে একটি 'গোপন সার্কুলার' গেছে শিক্ষা বিভাগে, আমার বিশ্বাস তা সরকারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মচারীদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যই যে, তারা যেন এই বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে।

ছাত্ররা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। দুটো সরাসরি স্পষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে—১. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি উর্দু হবে? এমন ঘটার সম্ভাবনা অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন। ২. বাংলা কি পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম থাকবে? কেউ এ-ব্যাপারে নেতিবাচক কিছু বলেনি, কিন্তু সেধরনের আশাংকাও হচ্ছে।

আমি মনে করি এ-ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ হবে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কী চায় তা স্পষ্ট করে জানানো এবং এ-ব্যাপারে সরকারের সম্মতি দাবি করা। যদি তারা প্রত্যাখ্যাত হয় তখন আন্দোলন করার নির্দিষ্ট কারণ থাকবে। কিন্তু কেউ কি তা করতে পারবে? যাদেরকে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি তাঁরা মনে করেন এখানে অনতিক্রম্য বাধা রয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। সরকারি অফিসে উর্দুভাষী পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তাতে স্বায়ত্তশাসনের সীমা যেমন অনেক বিস্তৃত হয় তেমনি অনেক স্বাভাবিকও হয়। এবং খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান সরকার এই ধারণাটি পছন্দ করছে না, তাদের মতে, বাঙালি মুসলিমরা যথেষ্ট ইসলামি নয়। এবং এমন হয়ত হতেও পারে যে, তারা আশংকা করছে হিন্দুরা এইভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে সেটিকে দুই বাংলা এক করার একটি আন্দোলনে ঘুরিয়ে নিতে চাইছে। সুতরাং খুব ভয়াবহ কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা যেন দেখা যাচ্ছে।

মার্চ ১১ মঙ্গলবার : ভীষণ গরম পড়েছে। বিশেষ করে রাতে হাঁটতে গেলে পথের পাশের গাছ থেকে অদ্ভুত মিষ্টি সুগন্ধ নাকে এসে লাগে। ছাত্র সংসদ আজ ধর্মঘট ডেকেছে। এখন ইস্যু বা দাবি হচ্ছে উর্দুর সাথে বাংলাও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আরেকটি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে। নাজিমুদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ হবে। সবাই আশঙ্কা করছিল গোলমালের। বেশি বেশি করে পুলিশ আসছিল (অবশ্যই তারা পাঞ্জাবি) নিঃশব্দে, এবং আমার বিশ্বাস প্রায় সপ্তাহখানেক আগে একটি বিশেষ আদেশ জারি করে চারজনের বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মঘট ও অর্ধদিবস ছুটির মধ্যে পড়ে প্রথম পর্ব এম এ'র এত ক্লাস আমার মিস হয়েছে যে আমি আজ ক্লাস না-ও হতে পারে আন্দাজ করে গত শনিবার এই ক্লাসটা নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার আজ ২টা বিশেও একটি ক্লাস ছিল এবং যদিও জানতাম ক্লাস হবে না তবু ভাবলাম একবার অন্তত যাওয়া উচিত। কোন পিকেটিং নেই, ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে দুপুর একটায়। যখন জনসভা শুরু হয়েছে আমি অফিসে বসে রইলাম, কিছু ব্যবসায়িক চিঠিপত্র লিখলাম, একটি রচনা সংশোধন করলাম। কালীপদ আমায় চা এনে দিল এবং বলল যে সকাল সাড়ে সাতটায় গোলমাল শুরু হয়েছে। আইনের ক্লাস হয়নি। পুলিশের সাথে দুএকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘর্ষ হয়েছে। ক'জন আহত হয়েছে। মাঝে মাঝে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশাল এক জনসভা চলছিল। প্রায় দুটোর দিকে স্লোগান দিয়ে মিটিং শেষ হল। ঠিক আড়াইটার পর জিনিসপত্র গুছিয়ে আমি বাড়ি গেলাম।

শিকদারের বাড়ির নতুন জামাই হাসান এসে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জানাল সংঘর্ষ হয়েছে, গুলিও চলেছে। কিন্তু আহতের সংখ্যা বলল সতেরো, যেটাকে কালীপদ বাড়িয়ে বানিয়েছিল শতাধিক।

তখন এল মুরশিদ ও মুনীর। সকাল দশটা থেকে বাইরে বাইরে ঘুরে তারা ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমার বাসায় বিশেষ কিছুই ছিল না খাবার মতো। অমলেট আর ভাঙা কিছু বিস্কুট দিয়ে ওদের আপ্যায়ন করলাম। মুনীর জানাল যে মিটিংশেষে জনতা মিছিল করে শহর ঘুরেছে। তারা আজ সকালে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মুক্তি দাবি করেছে। সেই মিছিলেই আবার আঘাত হানা হয়েছে। তারা দুজনেই সেখানে ছিল। মুরশিদ বলল এটা একেবারেই ইচ্ছাকৃত আক্রমণ, কোনরকম উস্কানি ছাড়াই। ছাত্ররা খুবই সুশৃঙ্খল ছিল এবং মোটেও আক্রমণাত্মক কোন আচরন তারা করেনি। পুলিশ তবু তাদের আক্রমণ করেছে। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ফজলুল হকও এই মিছিলে ছিলেন। কোনক্রমে পুলিশ-কর্ডন ভেদ করে এসে মাথায় আঘাত পাওয়ার একটি ব্যবস্থা তিনি করতে পেরেছেন। পরে অবশ্য তাঁর নিজের ভাষ্যে জানা যায় আঘাতটি ছিল পায়ে। এমনভাবে বলছি যে মনে হলো যেন বিরোধীদলীয় নেতা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তিনি এসব করেছেন। বেশ ক'জন লোক খুব মারাত্মক আহত। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন আবদুল এসে খবর দিল যে, মাথায় মারাত্মক আঘাত পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র মারা গেছে। অন্যেরা সন্দেহ প্রকাশ করল যে খবরটা সত্যি হতেও পারে। ওরা দুজন আহতদের দেখার জন্য হাসপাতালে গেল। মুরশিদ রাতে খাবার সময় ফিরে এল। তিনজন ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একজন, যে সবচাইতে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, তার পিঠে গুলি লেগেছে, অন্য দুজনের মাথায় বেয়নেটের আঘাত। প্রচুর রোগী হাসপাতালে আছে যাদের আঘাত অপেক্ষাকৃত কম। মফস্বল থেকে খবর এসেছে যে ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল। মুরশিদ খুব নিশ্চিত ছিল যে, পুলিশই উস্কানি দিয়েছে বরং ছাত্ররা প্রশংসনীয় ধৈর্য দেখিয়েছে। কিন্তু ধর্মঘটটি কি একটি গোলমাল বাধানোর উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত? যখন এটা স্থির হয়েই গেছে, নাজিমুদ্দীন ঘোষণা দিয়েছেন জনসমক্ষেই যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে, তখন তো গোলমালের অর্ধেক কারণ অগ্রিম দূর হয়ে গেছে।

১৫ মার্চ, সোমবার : সাধারণ ধর্মঘট। গতকাল কলেজের মাঠে আমি পাঁচজন মহিলার একটি দলকে দেখেছিলাম যারা আমার অফিসে গিয়ে চিঠি লিখতে চাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি। পরে প্রক্টর জনাব হক এসে একটি সিগারেট খেয়ে খানিক গল্প করে গেলেন। তিনি শনিবারের একটি ঘটনায় খুব বিরক্ত। একদল ছাত্র শান্তভাবে পিকেটিং করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে। ওরাযে শান্ত ছিল তা একদম পরীক্ষিত। তখনই লরিভর্তি পুলিশ এসে ওদের সবাইকে তুলে নিয়ে যায় ও গ্রেফতার করে। এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিপন্থী। প্রায় চার পাঁচ মাইল দূরে শহরের বাইরে নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছিল। এই কড়া রোদে ছেলেরা হেঁটে ঘরে ফিরেছে।

আমরা যখন কথা বলছি তখন মনে হলো গেটে যেন কিছু হচ্ছে। আগের কথামতো একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ড. হাসানের সাথে গ্রন্থাগার দেখতে এসেছেন। বোঝাই যাচ্ছে যে ড. হক তাঁকে মানা করে দেয়ার ফুরসত পাননি। সাথে সাথে ছাত্রীরা গেটটি দখল করে নিল এবং নির্দেশ দিল যে, কোন অজুহাতেই যেন লাইব্রেরি না খোলা হয়। প্রথমে ওরা সন্দেহ করছিল যে লোকটি হয়ত পুলিশের লোক— কারণ পুলিশ ওখানে খুব ঘনঘন আসা-যাওয়া করছিল, কোন গোলমাল হয় নাকি দেখার জন্য। যাহোক উনি যখন ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারলেন তখন নিজের থেকেই চলে গেলেন এই বলে যে, তিনি আরেকদিন আসবেন। কিন্তু ছাত্রীরা তখনও পিকেটিং করার জন্য ওখানে থেকে গেল ; বাকি দিনটা তারা আর সেখান থেকে নড়বে না। জনাব হক ভাবলেন তা হলে আমার এবং ওঁরও ওখানে থাকাটাই উচিত হবে, কোন গোলমাল করার ইচ্ছে থাকলেও আমার উপস্থিতিতে তারা তা করবে না। যা-হোক কিছুই হলো না। মেয়েরা সেদিন ওখানেই কাজ করবে ঠিক করল। তাই আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম চলে আসার।

সকাল সাড়ে দশটায় আমি এলাম। নীলক্ষেতের রাস্তায় একটি ছোট জটলা, এদিকে ওদিকে সশস্ত্র পুলিশ, লরিবোঝাই গ্রেফতার-হওয়া ছাত্রদের উচ্চকিত স্লোগান। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু হচ্ছে না, মেডিক্যাল কলেজ ঘিরে উত্তেজনা চলছে। কিন্তু একদল মহিলা পিকেটিং করছিলেন, তাঁরা আমাকে ঢুকতে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর দুজন বাদে সবাই চলে গেলেন। শুনতে পেলাম তাঁরা মেডিক্যাল কলেজের দিকে গেছেন। সেটা যেহেতু একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাদের সেখানে পিকেট করার কোন অধিকার নেই, তাই তাঁরা হয়ত গ্রেফতার হতে পারেন এই আশঙ্কায় সেখানে কী হচ্ছে দেখতে গেলাম। সেখানে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে। লরি দাঁড়িয়ে আছে। সবাই সশস্ত্র। পথের ওপাশেই জনতা।

ছাত্র সংসদ স্থির করেছে যে ঐ রাস্তায় যানবাহন চলাচল করতে দেবে না। মহিলাদের ওরা বলেছে বেসামরিক যানবাহন থামাতে, পুরুষেরা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গাড়ি থামাচ্ছে। আমার মনে হলো এটা তারা ঠিক করছে না। এতে গোলযোগ আরও বাড়বে, আর মহিলাদের এতে জড়ানো মানে পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করা। যখন ছাত্রীরা আমার কাছেই আবেদন জানাল, 'প্রফেসর স্টক, তুমি কি মনে কর আমাদের এটা করা উচিত?' আমি দেখলাম আমি উত্তর দিচ্ছি, 'সংসদ কমিটি কি তোমাদের এ-কাজ করতে বলেছে? তোমরা যদি ওদের সমর্থন কর তা হলে ওদের পশে দাঁড়ানো উচিত।' কাজের সময় পালিয়ে যাওয়ার উপদেশ আমি ওদের দিতে পারলাম না।

কিন্তু ছাত্রীরা সংখ্যায় কম ছিল, তারা এ-কাজে খুব পারদর্শীও ছিল না আর দুটো রাস্তাই ওদেরকে আটকাতে হচ্ছে। একটি দুটি গাড়ি ওরা সফলভাবে থামাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিল। খুব নার্ভাস বোধ করছিল, কিন্তু প্রকাশ করলে বিপদে পড়বে, তাই আমাকে সারাক্ষণ ওদের পাশে থাকতে অনুরোধ করছিল। সেই সময় অধ্যাপক ও মিসেস জেরনিক ঢাকার পথে সাইকেলে করে এলেন। তাঁরা থামতে চাইলেন না। ছাত্রীদের একজন মিসেস জেরনিকের বাইসাইকেলে হাত রাখতে তিনি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। রাস্তার মাঝখানে আমি ওদের সাথে দাঁড়িয়ে আছি, পুলিশের একটি দল আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। মনে হলো যেন লুডোর একটি গেম খেলা হচ্ছে এমন শান্ত ধীর গলায় একটি মেয়ে বলল, 'প্রফেসর, আমাদেরকে তো গ্রেফতার করা হয়েছে। পথে একপাশে আমাদের সরে যেতে হবে।' আমি সরে যেতে যেতে ভাবছিলাম পুরো ব্যাপারটি জেরনিকদের কাছে কেমন লাগছিল। ওরা তখন চলে গেছে। আমি যখন বৃহস্পতিবারে ওদের সাথে ডিনারে যাব- এর কী ব্যাখ্যাই-বা দেব?

এ-সময় একজন বাঙালি পুলিশ তার হৃদয়ে কোন আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে একটি পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছে পোশাকআশাক খুলতে শুরু করে দিল, ঝোলাটা ছুড়ে ফেলল, আর সরকার সম্পর্কে অনেক গোপন কথা চিৎকার করে বলতে লাগল। কেউ তাকে গ্রেফতার করল না, তারা ওকে চৌমাথা জুড়ে ছোটাছুটি আর চিৎকার করতে দিল। ঠিক সেই সময়ে আবার একটি উত্তেজনা সৃষ্টি হলো, একটি পুলিশ-লরি মেডিকেল কলেজ গেটের দিকে যাচ্ছিল। মহিলারা, ছাত্ররা সবাই ভেতরে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিল। লরিটি থামল, কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ছাত্রদের মন জয় করার চেষ্টা হলো। শেষ পর্যন্ত মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা একটি ছেলেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, আর লরিটি ফিরে যাবার সময়ে জনতা ছি ছি বলে চিৎকার করতে লাগল। পুলিশ লরি ঘুরিয়ে চলে গেল।

সেই সময় চাপরাশি এসে আমাকে খবর দিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আমাকে খোঁজ করছে। গিয়ে দেখি র‍্যালফ, আমার এক ইংরেজ বন্ধু। প্রত্যাশিত সময়ের আগেই ও এসে পড়েছে। বাংলোয় গিয়ে আমাকে পায়নি। ঘরে তালা দেয়া ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিক্ষোভ হচ্ছিল। অনেক কষ্টে সে এখানে এসেছে। ছাত্ররা আসতে দিচ্ছিল না। আমি ওকে নাশতা খাওয়ার জন্য বাসায় নিয়ে গেলাম। ধর্মঘটের আর কিছুই আমি দেখিনি। আগামীকালও ধর্মঘট হবে কি-না জানি না। ষাটজনের বেশি গ্রেফতার হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে কী করে, হয়ত এর ওপরই নির্ভর করছে পরের ব্যাপারগুলো। একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন আজ শুরু হবে। বিক্ষোভের কারণ ওটাই। দাবি উঠেছে আইন পরিষদে বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার। বিরতির সময়ে দলীয় বৈঠক ও সংসদ অধিবেশনে এ-বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে বলেও রিপোর্ট পেয়েছি, কিন্তু এখনও জানি না তা কতটা সঠিক।

এর মধ্যে আমার মাথায় ঘুরছে যে আমাকে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহকে উদ্দেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের পক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে একটি ইংরেজি বক্তৃতা তৈরি করে শিগ্‌গিরই অফিসে জমা দিতে হবে। যদিও রেজিস্ট্রার সাহেবের মাধ্যমে আমাকে এ-কাজটি করতে অনুরোধ করা হয়েছে কিন্তু আসলে এটি আদেশ যা না মেনে উপায় নেই। (জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসছেন, তিনি ঢাকায় একটি জনসভা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দেবেন)। তাঁকে সম্বোধন করব কী বলে?

২২ মার্চ, সোমবার : বৃহস্পতিবারের আগে ধর্মঘট শেষ হয়নি। কিন্তু আমি আসলে ঘটনাগুলোর খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রথম দিনের খবর তো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। ছাত্ররা নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে বাঙালি সদস্যরা বাংলাকে কেন্দ্রের একটি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেবে। ধরা-পড়া ছেলেদের ছেড়ে দেয়া হল। নাজিমুদ্দীন তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু মনে হলো যেন ছাত্ররা এই ছাড় দেয়ার ব্যাপারে নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত। অনেকেই মনে করছিল তাদের এমন একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়া উচিত যে বাংলার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পেলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সমস্ত বাঙালি সদস্য একযোগে পদত্যাগ করবেন।

(কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদ পক্ষকালব্যাপী অধিবেশনের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল। আর মনে হতে লাগল যে, প্রশাসন তার উর্দুভাষী টাইপিস্ট ও কেরানিকুল নিয়ে উর্দু ও ইংরেজিতে কাজ চালিয়ে যেতে চাইছে। আমলাতন্ত্র এই পরিবর্তনের কট্টর বিরোধী ছিল। আমার মনে হয় বাঙালিরা এ-ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়েছে)।

যাহোক ছাত্ররাও ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তারা তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করবেই। তারা পরিষদের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। সদস্যরা বেরিয়ে এলে তাদের গালাগাল করল। দুচারজনকে মারধরও করল। সুতরাং পুলিশ লরির বহর সাজিয়ে এল, লাঠিচার্জ করল, টিয়ারগ্যাস ছুড়ল। নাজিমুদ্দীনের এখন একটি সুযোগ হলো বলার যে, ছাত্রদের ক্রমাগত দুর্ব্যবহার পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। ছাত্ররা দাবি করতে লাগল যে পুলিশকে তার বর্বরতা ও নৃশংসতার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। অবশ্যই পুলিশ তা করেনি, সুতরাং আর একদিন ধর্মঘট হলো।

ইতিমধ্যে ওরা বুঝতে শুরু করল যে জনসমর্থন কমে যাচ্ছে এবং একেবারেই নিঃশেষিত হওয়ার আগে কাজে ফিরে যাওয়া দরকার। তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কায়েদে আজমের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা কায়েদে আজমের কথামতো তাদের পরিকল্পনাকে নতুন করে সাজাল। মুনীর একে খুব খুশি হয়ে নাম দিয়েছে 'পক্ষকালের সময়সীমায় দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা'।

সুতরাং বৃহস্পতিবারে আমরা কিছু কাজ করলাম। তিনি এলেন শুক্রবার সন্ধ্যায়। লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য বিমানবন্দরের দুপাশ থেকে ঢাকা পর্যন্ত লাইন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। শনিবারে আমার কোন ক্লাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না বলে সকালে কলেজে কিছু কাজ করলাম। হঠাৎ করে প্রচণ্ড গরম পড়েছে, আমি সারাদিনে খুব বিধ্বস্ত বোধ করছিলাম। আমি ঘরে ফিরে দেখি দু'টি ছাত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হোস্টেল ওয়ার্ডেন মিস বোস আসতে পারছেন না। আমি কি ওদেরকে রোববার জিন্নাহ সাহেবের রেসকোর্সের জনসভায় নিয়ে যেতে পারব?

রোববারে কায়েদে আজমের সম্মানে ছুটি ছিল। আমরা মিটিঙে গেলাম। দেখার মতো লোক হয়েছিল সেই মিটিঙে। পুরো ঢাকা শহরই যেন চলে এসেছে। খাকি ঘের দেয়া সাদা সমুদ্রের মতো লাগছিল রেসকোর্সের মাঠটিকে। মহিলাদের বসার সবচাইতে ভালো জায়গাটি ভিআইপি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। খোদেজা নামের একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণী যে কিনা ইসলামি সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল, পাহারায় রত সৈনিকদের কাছে গিয়ে বলল, ওরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ঐ গেটটি খুলে না দেয় তবে ছাত্রীরা ঐ গেট ভেঙে ঢুকে পড়বে। নম্রভাবে সৈন্যরা গেটটি খুলে দিল।

শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা যখন শুরু হলো তখন মাইক কাজ করছিল না। আমি তো বিশেষ কিছুই শুনতে পাইনি। কেবল ঐ জায়গাটা বুঝতে পেরেছিলাম যেখানে তিনি ছাত্রদের বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছেন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে, রাজনৈতিক দলগুলো থেকে দূরে থাকতে। এর বেশি আমি শুনতে পাইনি। পরে জানতে পারলাম নাজিমুদ্দীনের সরকারকে প্রশংসা করে আকাশে তুলেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে নাম ধরে গালি দিয়েছিলেন। আর বলেছেন যে মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য যে-কোন দলেই যে-কেউ যাবে তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে। আর নাজিমুদ্দীন যেসব অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেইসব অভিযোগেরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি আরও জানালেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হবে (আইন পরিষদের কোন উল্লেখ করেননি)— এখন বাঙালিদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা তাদের নিজেদের প্রদেশে বাংলা চায় কি-না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সে-ব্যাপারেও ভালো করে ভেবে দেখার উপদেশ দিলেন।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হলো আমরা যেন একটি নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের যুগে বাস করছি। মুরশিদ তো ভীষণ ভেঙে পড়ল। মুনীর আমাকে পরে বলল যে, মিটিং- ফেরত সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো সমস্ত সাজসজ্জা ছিঁড়ে ভেঙে ফেলা।

তারা ভাবছিল সমাবর্তন বয়কট করে তারা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে কি-না। তবে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। আজ সন্ধ্যায় তাদের একটি প্রতিনিধিদল জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

ছাত্রদের এই সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আমার মনোভাব কিন্তু প্রথমে খুব বৈরীই ছিল। আমি এ-ব্যাপারে ব্রিটিশ মনোভাব স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। ব্রিটিশ জনগণ খুবই বিরূপ হয়ে উঠবে যদি সরকারের থাকা না-থাকা, আইনবিষয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত নেয়া না-নেয়ার ব্যাপারটিতে ছাত্ররা খবরদারি করে। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল, আমি ব্যাপারটির অন্য দিকটিও বুঝতে শুরু করলাম।

সরকার বা আইন পরিষদের সদস্যদের কাউকেই জনগণ স্পষ্টত তাদের প্রতিনিধি মনে করতে পারছে না। যদিও তারাই তাদের নির্বাচিত করেছে তবুও। সবাই শুধু একজন আরেকজনকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে চলছে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন শ্রমিক ইউনিয়ন, সমন্বয় সংস্থা, কৃষক সংগঠন এবং এমন অন্য সংগঠনগুলো কোন জোরালো বক্তব্য রাখতে পারছে না। সুতরাং জনমত খুব সংহত হতে পারছে না। এ-অবস্থায় ছাত্ররাই একমাত্র জনমত প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অন্তত এই ভাষা প্রসঙ্গে তারাই জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্তত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধের সূত্রপাত যখন হলো, তখন এমনভাবেই আমি ব্যাপারটিকে দেখেছি ও ভেবেছি। পরবর্তীকালে যা ঘটেছে সে-তুলনায় তখনকার ব্যাপারগুলো একটি খেলার মতো মনে হচ্ছিল। তবু এটা ছিল আসলে একটি বীজ যার ভেতরে লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের বিশাল এক বৃক্ষ। আমি কেবলমাত্র আমার ডায়েরির পাতা থেকে তুলে দিয়েছি কারণ তখনকার ঘটনা ও আমার পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরার আর কোন উপায় ছিল না। ঘটনাকে বিকৃত না করে দেখার অন্য কোন বিকল্প ছিল না। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটি আমি সেভাবেই দেখেছি, আমার কাছে যেমন মনে হয়েছিল, ১৯৭০ সালে বোধহয় ছাত্রদের অসংসদীয় এইসব আচরণের ব্যাপারে কেউই এত কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত না। কিন্তু আমি মাত্র সিকি শতাব্দী আগে ইংল্যান্ড থেকে এসেছি যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরে আমাদের অবিচল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এবং স্নাতকপূর্ব ছাত্ররাও সেখানে ছাত্রদের ক্ষমতার কথা বলে না। তবুও ছাত্রদের কৌশল সম্পর্কে আমি যা-ই বলি-না কেন, আমার অনুভূতি ও সমর্থন কিন্তু পুরোপুরিই ওদের দিকেই ছিল।

তা-ছাড়া পাক-ভারতে ছাত্রদের বিদ্রোহের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। প্রায় বিশ বছর ধরে নবপ্রজন্মের প্রতি রাজনীতিবিদরা আহ্বান জানিয়েছেন যে, 'প্রতিরোধ করো, বিক্ষোভ করো, বুলেট ও লাঠির আঘাত সহ্য করো, জেলে যাও, স্বরাজ আনো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করো, ভবিষ্যৎ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।' তাদের সচলতা, গতিময়তা, বাধাহীনতা, বল্গাহীন তারুণ্যের ক্ষমতা, বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস, স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদেরকেই মূল ও আদর্শ ঝটিকাশক্তি করে তুলেছিল। এখন, ক্ষমতার গদিতে চড়ে কিন্তু রাজনীতিবিদরা তাঁদের এই বীর্য, বিদ্রোহ পছন্দ করছে না। বারবার বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে বইয়ের পাতায় মন দিতে বলছে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা আপত্তি করছে। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রভাষকরা বলাবলি করছিলেন যে এটাই হচ্ছে মূল পরিস্থিতি। যেন মনস্তাত্ত্বিক রোগনির্ণয়ের ফলে ইস্যুটির জটিলতা কমে যাবে।

ভাষাপ্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রাতিষ্ঠানিক মতামত ছিল না, সৌভাগ্যবশত দরকারও পড়েনি। এখনও পর্যন্ত কেউ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজি তুলে দেয়ার প্রস্তাব দেননি। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকরা হয়ত এ-বিষয়ে বিভিন্ন রকম মতামত পোষণ করেন এবং দৃঢ়ভাবেই, কিন্তু আমাদের কোন ধর্মঘট চলছিল না, ক্লাসও বন্ধ ছিল না। আমরা সময়মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতাম এবং ছাত্র এলে তাদেরকে পড়াতাম। পড়াশুনার এই ব্যাঘাতের জন্যে আমরা খুব কষ্ট পেতাম, কারণ জানতাম যে এর পরই যে-দাবি আসবে তা হলো আবার পরীক্ষা পিছানোর। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সন্ত্রাস ঠেকাতে প্রয়োজনে যে-কোন ধরনের ব্যবস্থা নিতে আমরা তৈরি ছিলাম। কিন্তু এর বাইরে ছাত্ররা কী করছে তা তাদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপার। এই সুচিন্তিত নিরপেক্ষতাকে ধন্যবাদ। ছাত্র-কর্মচারী সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়নি, শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়নি বরং কথাবার্তা হত খোলামেলা। আমি নিজে শুনে যেতাম, প্রশ্ন করতাম, যদি কেউ জানতে চাইত আমার মতামত, জানাতাম। তবে তা খুব সচরাচর ঘটত না। অবশ্য কোন দলীয় মিটিঙে কিছু বলতাম না। কেউ এসব বক্তব্য পড়তও না।

এই কথাগুলো পুনরায় পড়তে গিয়ে মনে পড়ছে যে মাঝে মাঝে আমি ছাত্রদের যুক্তিতে ভুল ধরতাম। তাদের কার্যকৌশলকে অদূরদর্শী ও ভুল মনে হয়েছে। যারা ধৈর্য ধরে শুনত তাদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করেছি এই বলে যে, শুধু যদি তারা তাদের ভেতরের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে যদ্দিন না একটি ডিগ্রি পাচ্ছে, এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করছে, তদ্দিন চাপা দিয়ে রাখে, তারপর যে-নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে এখন কাজ করছে, সেভাবে তখন কাজ করে, তবে দেশকে তারা অনেক তাড়াতাড়িই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে। তবে মূলত আমি তাদের পক্ষেই ছিলাম।

এই সহানুভূতিটা নমনীয় হয়েছিল একটি পুরনো ধারণা থেকে। এই ধারণা আমি আমার সহকর্মীদের সাথে পোষণ করতাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব মূলত শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা নেয়ার জন্যে এবং মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও এ-কাজটি তাকে করে যেতে হবে। এই মতের কারণ আমরা ঘটনা থেকে দূরে ছিলাম। ছাত্ররা সরকারের মুখোমুখি হচ্ছিল। আমরা, যারা পড়তে আসছিল, তাদেরকে, আমাদের মতামত যা-ই হোক, পড়িয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তো বুঝে পাই না আর কী করতে পারতাম। দেয়ালটা খুব মজবুত ও শক্ত ছিল না, কিন্তু আমাদেরও যে আর কোন বসার উপযুক্ত জায়গা ছিল না।

কিন্তু পরোক্ষ সহানুভূতি আর প্রত্যক্ষ অঙ্গীকারের মাঝের ব্যবধানটি খুব স্পর্শকাতর হয়ে উঠল যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে আমার ভূমিকার জন্যে। আন্দোলনের গোড়ার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যেদিন রহমান,— প্রথম বর্ষের সেই ছাত্রটি, সেপ্টেম্বর মাসে যে নিজেই নিজেকে ভুলের সংশোধনকারী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, এসে উপস্থিত হলো। পরদিন সভায় দেবার জন্য একটি বক্তৃতা তৈরি করে সে নিয়ে এসেছিল। তার মনে হচ্ছিল আন্দোলন ও তার নিজের, উভয়ের জন্যেই ব্যাপারটি খুব জরুরি। আমি কি দয়া করে ইংরেজিটা একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকঠাক করে দেব? বক্তৃতায় তাৎক্ষণিকভাবে মধ্যরাতের একটি গোপন অভিযাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে যে-অভিযানের লক্ষ্য হবে সচিবালয় ভবনটি দখল করা। যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশর্তভাবে তদের দাবি না মানা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভবনের দখল ছাড়বে না। অবৈধ কিন্তু বহুলপ্রচারিত জনসভার জন্যে এ-ধরনের আহ্বান আমার কাছে রোমান্টিক অবিমৃষ্যকারিতা মনে হলো। তবে বক্তৃতাটি যখন দেয়াই হবে, তখন ব্যাকরণসম্মতভাবে না দেয়ার কোন কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। সুতরাং ওর সঙ্গে বসে আমি একটি রচনা দেখার মতো করে বক্তৃতাটি দেখলাম আর এমনভাবে তার ওপর কলম চালালাম যে লেখাটি পড়ার অযোগ্য হয়ে উঠল। তখন একটি স্পষ্ট ও ভালো কপি ওকে টাইপ করে দিলাম। পরের অনুরোধটি ছিল দ্ব্যর্থবোধক : যেহেতু ওর নিজের কোন টাইপরাইটারে কাজ করার সুযোগ নেই আমি কি তাকে ডজনখানেক কপি টাইপ করে দিতে পারি যেগুলো ও মিটিঙের আগে ছাত্রনেতাদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে? সেই অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান করলাম এই বলে যে শিক্ষকতা ও অংশগ্রহণের মধ্যে একটি সীমা আছে। আমার মনে হয় রহমানের শুভবুদ্ধির কারণেই সে আমার যুক্তিটা গ্রহণ করল। আমার মনে হয় সম্ভবত ওর বক্তৃতা ও দিয়েছিল, কিন্তু স্পষ্টতই আরও নমনীয় পরামর্শগুলোই গ্রহণ করা হয়েছিল। কোন মধ্যরাতের অভিযান হয়নি। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পরিণতি এর ঘটেছিল ঠিক। ধর্মঘটের পর সে নিজেই আমার রচনা ক্লাসে বদলি হয়ে চলে এল এবং সাময়িকীতে সে ছিল খুব উৎসাহী লেখক। নিজেকে সে সবসময় মেধাবী বলে দাবি করত এবং নিজের ভালোর জন্যেই খুব স্বাধীনভাবে সে এই মেধা ক্লাসরুমের বাইরে কাজে লাগাত। কিন্তু প্রায় দুবছর পর সে এসে একদিন জানালো যে সে সাংগঠনিক ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। এখন সে সত্যি সত্যিই পড়াশোনা করতে চায় এবং তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। আমার যে কী প্রশান্তি লাগল! সময়মতো এম এ-তে একটি দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে সে পাশ করে গেল।

আমি যুক্তি দিয়ে বিচার করার আগেই মানসিক সমর্থন দিয়েছিলাম। বলা যায় পথের চেয়ে লক্ষ্যটিকেই আমি বেশি বড় বলে মেনেছিলাম। রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান ছাত্রদের বিপক্ষে ছিল। আর প্রশাসনে কর্মরত পাঞ্জাবিরাই শুধু নন, ইংরেজরা, যাঁরা আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন (যদিও রাজনৈতিক অসন্তোষ সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা, আমার মতো করে আছে), ভাবছিলেন ছাত্ররা সম্পূর্ণ ভুলপথে। পাকিস্তানের দুই অংশ সূক্ষ্মভাবে যুক্ত, আর যদি কোন বন্ধন এর দুটো অংশকে যুক্ত রাখতে পারে তা হলো একটি সাধারণ ভাষা। কিন্তু ভাষা হচ্ছে জীবনের উৎসধারাগুলোর সবচাইতে কাছের, একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায় না।

আর রাষ্ট্রকে জনগণের কল্যাণের শক্তিতে পরিণত না করে জনগণকে রাষ্ট্রের সুবিধামতো গড়তে যাওয়া মানে জীবনকেই দুর্বল করে তোলা। পশ্চিমা বিশ্বে বহুভাষিক রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে কম। ইতিহাস আমাদেরকে ধর্মের মারাত্মক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধক্ষমতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ভাষার নয়। প্রাচ্যে 'টাওয়ার ব্যাবল'-এর গল্প থেকে জানা যায় যে, এই বিরোধও নতুন নয় ; আর এখন তো দেখাই যাচ্ছে যে, বিভাজক শক্তি হিসেবে ভাষা ধর্মকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। পাকিস্তান ও ভারতের নির্মাতাদের হতবুদ্ধি করছে যে-ভাষাসমস্যা তার জন্য কোন সর্বরোগহর ওষুধ আমার জানা নেই। আমি এখানে যা করতে চাই তা হলো, আমার স্মৃতির পটভূমি হাতড়ে এই আন্দোলনের উন্মেষের সময়টিকে যতটা সত্যনিষ্ঠ করে তুলে ধরা যায়, তারই চেষ্টা। কিন্তু একটা বিরোধের মাঝে কোন পক্ষে মত না দিয়ে বাস করা খুবই কঠিন এবং রঙিন কাচের মতোই যেহেতু এই মতামতগুলো আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, সেহেতু সেগুলোও দৃশ্যপটে চলে আসতেই পারে।

এই বিবরণ থেকে একথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে '৪৮-এর প্রতিরোধ কোনক্রমেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না। বরং এটা ছিল মূলত পূর্ববঙ্গে মুসলিমরা যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন করছিলেন তাতে আরও সক্রিয়ভাবে ও সমতার সঙ্গে অংশ- গ্রহণের দাবি। পশ্চিমের অর্ধেকের মতো তাঁরাও পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করেছেন। তাঁরা দরিদ্র ছিলেন, প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ ছিলেন ; সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণকারী পাঞ্জাবিদের চেয়ে তাঁরা কিন্তু তবু কম সভ্য ছিলেন না। অন্য ভাষাভাষীদের চাইতে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় সবচাইতে বেশি। পাঞ্জাবি অভিবাসীদের ব্যবহার, তাদের শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকার, বাংলার প্রতি তাদের তাচ্ছিল্যবোধ, বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করেছে কিন্তু তারা তাদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্যে কিছুই করেনি।

খুব কম পাঞ্জাবিই, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পাঞ্জাবিরাও বাংলা পড়তে এমনকি বলতেও পারত না। বাঙালিদের সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই খারাপ ছিল। তারা অবিশ্বাস করত তাদের ভাষাকেও। বাংলা ভাষাকে তারা মনে করত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে এক করে তোলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহক। এ-ভাষা এ-সংস্কৃতি তাদের নয়। তারা মনে করত যেহেতু উর্দু পবিত্র কোরানের ভাষা আরবির হরফে লেখা হয় তাই উর্দু উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক বেশি ইসলামি ভাষা। তারা মনে করত বাঙালিদের যদি তারা এ-ভাষা বলাতে না পারে তা হলে সবচাইতে ভালো হবে স্কুলে বাঙালিদের শিশুদের নিজেদের ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষা শেখানো। প্রশাসনিক সুবিধা হবে যে, দেশের দুই অংশেই একই ছাপাখানা ব্যবহার করা যাবে ; কিন্তু প্রতিটি বাঙালি শিশুকে এই ব্যবস্থা তার ভাষার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই সম্ভাবনাটি বাঙালিদের জন্য তাদের সাহিত্যের ব্যাপারে আবেগময় অহংকারে একটি আঘাত তো ছিলই কিন্তু তা পাঞ্জাবিদের জন্যেও খুব কাম্য হওয়ার কথা নয়।

ছাত্ররা একটি বৈষয়িক কারণেও ভাষার সমতা দাবি করেছিল। যদি বাংলা না হয়ে উর্দু রাষ্ট্র স্বীকৃত ভাষা হয় তবে ভালো উর্দু জানা প্রশাসনিক পদগুলোর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। তখন বাঙালিরা যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশি ভাষা হিসেবে এটা শিখবে তাদের চাইতে উর্দুভাষীরা ভালো করবে, বাঙালি ছাত্রদেরকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে উর্দুর জন্যে, যে-সময়টা ওরা অন্য বিষয়ের জন্য দিতে পারত। এটি আন্দোলনের মূল কারণ না হলেও একে একেবারে তুচ্ছও করা যায় না। সত্যি বলতে কি আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়েছে যে বাঙালিরা উর্দু অনেক তাড়াতাড়ি শেখে, এতটা তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিরা বাংলা শিখতে পারে না। বর্ণমালা বা পাণ্ডুলিপিটা কখনও বড় কোন বাধা নয়। কারণ প্রতিটি বাঙালি ছেলেই ইসলামি শিক্ষার ফলে অর্থ না বুঝেও জোরে জোরে কোরান পড়তে শেখে। জাতিগতভাবে তারা ভাষাটিকে অস্বীকার করতে চাইলেও ব্যক্তিগতভাবে তারা ইন্সুরেন্সের পলিসি করার মতো যত্ন নিয়ে ভাষাটি শেখে।

পরের ফেব্রুয়ারিতে একটি ঘটনা এই ব্যাপারটিকে প্রকাশ করল। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কদল ন্যাশনাল ইউনিয়ন অভ স্টুডেন্টস-এর সৌজন্যে আমাদের এখানে বেড়াতে এল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদেরকে স্বাগত জানানো হলো। আবদুলের ভাষায় তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য (তার নিজের আত্মতৃপ্তির কারণেও) আমার ওপর ভার পড়ল দলটিকে আপ্যায়ন করার। তাদের আপ্যায়ন করতে হবে ভদ্রোচিতভাবে কোন কার্পণ্য না করে। ছাত্ররা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। বিতর্কে ভিড় জমানোর পরও তারা একটি ইংরেজি নাটক ও বাংলা গানের অনুষ্ঠান করল। ছাত্র সংসদ তাদেরকে নদীতে পিকনিক করতে নিয়ে গেল। আর অভিজাত নিমন্ত্রণকর্তার মতো যতটা ভালো করে পারা যায় পাকিস্তানের সবচাইতে ভালো ভালো বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, সাম্প্রতিক ঘরোয়া কলহের উল্লেখ মাত্র করল না। দলটি এদের আতিথেয়তার উষ্ণতা অনুভব করতে পেরেছিল। তাদের একজন, ভাষাতত্ত্বে দক্ষ, ভারতে যুদ্ধের সময় কাজ করেছে, আমার কাছে জানতে চাইল বিদায়ী বক্তৃতাটা উর্দুতে দেয়াটা খুব ঠিক হবে কি-না। আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললাম, কেন আমি মনে করি যে সেটা হবে একটি রক্তাক্ত প্রস্থানের পথ সংক্ষিপ্ত করা মাত্র। কিন্তু ছেলেটি ছিল সাহসী ও সম্ভাবনাময়। বাংলা জানত না বলে খুব চেষ্টা করে একটি বাংলা বাক্য সে মুখস্থ করেছিল, তাই দিয়েই বক্তৃতা শুরু করল, কাজও হলো, 'আমি সত্যি দুঃখিত যে তোমরা যত সুন্দর করে আমার ভাষায় কথা বলছ আমি তত সুন্দর করে তোমাদের ভাষায় বলতে পারছি না।' এরপরই সে উর্দুতে বলতে শুরু করলে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী প্রশংসা ও খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ইংরেজির চাইতে উর্দু তাদের কাছে বেশি পরিচিত আর বিশেষ করে ইংরেজের ইংরেজির চেয়ে তা বেশি বোধগম্য। তার ওপর ভারতীয় মুসলিমদের একটি ভাষায় কথা বলা, আবার তার জন্য ক্ষমা চাওয়া কৌশল হিসেবে খুব কাজ করল।

কোনরকম আন্দোলন ছাড়াই গরমকালটা কেটে গেল। ছাত্ররাও পড়াশুনায় এমন মনোযোগ দিল, যেন এটাই তাদের একমাত্র কাজ। তাদের দাবিদাওয়া ও অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আগেই লিখেছি, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, বর্ষার ছুটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোরশেদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া—আমার দিনগুলোকে ব্যস্ত রাখল। সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ সকালে আবদুল খবর নিয়ে এল কায়েদে আজম জিন্নাহ মারা গেছেন। সারা দেশবাসীর মতো আমিও খবরটি শুনলাম—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিয়ে। কখনও কোথাও যদি এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন রাষ্ট্র থেকে থাকে—সেটি হলো পাকিস্তান। প্রতিটি অফিস, প্রতিটি বাড়িতে দেয়ালের ফাঁকে অথবা যেখানেই মানুষের ভিড়, তার ভেতর থেকে জিন্নাহর মুখ উঁকি দিত। জওহরলাল নেহরুর মতো জনগণের সাথে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐক্যের প্রতীক। ছাত্ররা তার সামনে শান্ত হয়ে যেত। যদি তিনি কথা বলতেন, কেউ প্রশ্ন করত না, যেন পাকিস্তানই কথা বলছে।

আমার একজন মুসলিম সহকর্মী বললেন, 'তিনি তাঁর মানসিক ক্ষমতা থেকেই পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন।' ব্যক্তিগতভাবে, পাকিস্তানি নন যাঁরা, তাঁদের অনেকের মতো আমিও অনিশ্চিত ছিলাম এই ক্ষমতার উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে, এর গন্তব্য সম্পর্কে। এটা কি কোন সৃষ্টিশীল দর্শন, নাকি শুধুমাত্র ক্ষমতাকে উপলব্ধি করার ও করানোর দৃঢ়তা, —যা ভারতকে ভাগ করেছে? তবে পাকিস্তান একটি বাস্তবতা এবং একটি অর্থপূর্ণ লক্ষ্যে তাকে কাজ করতে হবে নিজের অস্তিত্বের জন্যই। নইলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর শোকে অনিবার্যভাবে একটি ছুটির দিন পাওয়া গেল। কিন্তু আমি অফিসে গেলাম, কারণ সেদিন ইংরেজি কমিটির একটি সভা ছিল, আর খবরটি জানার আগে অন্তত দুজন সদস্য ঢাকার দূরবর্তী দুটো কলেজ থেকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশাল শোকসভা অনুষ্ঠিত হল। ড. হাসান রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আমরা যখন নামাজে বা প্রার্থনার জন্যে সমবেত হই তখন নিয়ম এই যে, যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাঁর অনুপস্থিতিতে পরবর্তী জন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখন তা-ই করতে হবে, আমরা নিজেদের যত অকিঞ্চিৎকরই মনে করি না কেন যেখানে কাজের প্রয়োজন সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।'

অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী ছুটিটা আমি পক্ষকাল দার্জিলিঙে কাটালাম। হিমালয় আমার প্রত্যাশা পূরণ করল।

জেরনিকদের সাথে এক জোছনা রাতে আমি টাইগার হিলে হেঁটেছিলাম, মধ্য বাতাসে কাঞ্চনজঙ্ঘা চিকচিক করছিল, যেন পৃথিবীর সবকিছুর সাথে সম্পর্কহীন ; আমরা ছোট্ট উঁচু চুড়োটায় উঠেছিলাম, যেটা থেকে এভারেস্টের গা-ঘেঁষে সূর্যোদয় দেখা যায়। সেই দৃশ্যের জন্য সমবেত হয়েছিল প্রায় ডজনখানেক মিশ্রজাতি—ভারতীয়, ইউরোপীয়, তিব্বতি, আমেরিকান, পাকিস্তানি। আমরা দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম যখন চাঁদ ডুবে গেল আর সাদা উজ্জ্বল বলয়টি ভৌতিক ধূসর রঙে বদলে গেল। সূর্যের বৃত্তটা বেরিয়ে এল, আমরা সবাই খুশিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠলাম, যেন কোন বিখ্যাত চিত্রতারকা সত্যিই চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এভারেস্টের চুড়োয় গোলাপি আলোর বলয় যেন ঝলসে উঠল, বড় হলো, কমলা রঙে বদলে গেল, তারপর সোনালি, তার পর মেঘশূন্য আকাশে ঝলসানো সাদা রং, সারাটা সময় ধরে চুড়োর পর চুড়ো যেন ছায়ার বাইরে বেরিয়ে আসছে, মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সীমার বাইরে, একই প্রণামের ভঙ্গিতে। কয়েক মুহূর্ত আমরা রুদ্ধশ্বাস দেখতে লাগলাম ; তখন কেউ-একজন লক্ষ করল যে, ঠিক আমাদের নিচেই একজন তিব্বতি মহিলা চায়ের পাত্রসহ একটি হাতে-ঠেলা ট্রলিমতন নিয়ে দাঁড়িয়ে। আরেকটা স্বতঃস্ফূর্ত চিৎকার, হিমালয়ের দিকে পেছন ফিরে সবাই চায়ের জন্য ছুটে গেলাম।

আমি যখন বাইরে ছিলাম খোরশেদ তখন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিল। সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমার এখানে থাকতে রাজি হলো কারণ ওর বাড়ি যাবার পথটা খুবই ক্লান্তিকর ছিল আর হোস্টেলের খাবার ওর শরীরকে সুস্থ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আমি ফিরে এসে আরও জানতে পারলাম যে, এক আশ্চর্য কাণ্ড করে ও প্রায় মরেই যাচ্ছিল—দশ সপ্তাহের মারাত্মক অসুস্থতার পর হাসপাতালের নিম্নমানের খাবারের বিরুদ্ধে ও একাই অনশন করেছিল। অন্য রোগীরা ওকে সমর্থন জানিয়েছে তাদের পূর্ণ সহানুভূতি দিয়ে, যদিও কেউই পূর্ণ উপবাসে ওর অংশীদার হয়নি। একটি হাসপাতালে লোকেরা নিজেদের দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণায় এতই অস্থির থাকে যে সেটা মিলিত কোন আত্মত্যাগের জন্য খুব সুবিধাজনক জায়গা নয়।

মনে হয় খাবার সরবরাহের ব্যাপারটা যাদের কাছে চুক্তিতে দেয়া হত তারা রোগীদের মূল্যে নিজেরা লাভবান হত। খাবার অপ্রতুল এবং রান্না যাচ্ছেতাই আর বন্ধুবান্ধবরা সাহায্যে না এগিয়ে এলে রোগীরা অসহায়। নিতান্তই প্রচণ্ড দুর্গতি দেখে খোরশেদের এই প্রতিবাদী চেতনা কাজ করেছিল। ছুটিতে হোস্টেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সব বন্ধু বাড়ি চলে গেছে, আমিও বাইরে। ধর্মীয় উৎসবের দিন ছিল সেটি, সব পরিবারই তাদের সাধ্যমতো ভালো রান্না করবে, অথচ ওকে দেয়া হলো একথালা অখাদ্য ভাত। ও খেতে অস্বীকার করল এবং ব্যাপারটিকে ছেড়ে দিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে বাধ্য হলো এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে এ-বিষয়ে তদন্ত করবে। সাধারণ মতামত ছিল এই যে ঘটনাটি একটি ইতিবাচক সংস্কারের সম্ভাবনা অর্জন করেছে, অস্থায়ী বা স্থায়ী যা-ই হোক না কেন এবং সেটা সম্ভব হয়েছে তাৎক্ষণিক ওর আবেগ, জনমত ও সহ্যক্ষমতার মিশ্রণে। কিন্তু এই প্রয়াস ওকে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিল এবং প্রায় পক্ষকালব্যাপী আব্দুলের রান্না ওকে আবার হোস্টেলে ফিরে যাবার মতো সুস্থ করে তুলল। এর পর থেকে ও নাশতার সময় সাধারণত আসত, যতটা পুষ্টির জন্য তার চাইতেও বেশি সামাজিকতার কারণে। আর আমি লাভবান হতাম এমন একটি বন্ধুত্ব পেয়ে যার ভেতরে কেবল ভালোত্বই খুঁজে পেতাম না, যার ভেতর দিয়ে আমি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ছাত্রদের প্রতিক্রিয়াকে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেতাম।

ক্রিস্টমাস ছুটির আগে পর্যন্ত কাজের চাপে ডায়েরী লিখতে পারিনি। এরপর দেখছি গত দুমাসের কিছু ঘটনার ভেতর দিয়ে ছাত্র-রাজনীতির ঐক্যের ব্যাপারে ফাটলটি দেখিয়ে দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশে ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রীর আগমন। (আমি সঠিক তারিখটা ভুলে গেছি, ডিসেম্বরের প্রথমদিকে হবে) আমাদের অর্ধেক দিন ছুটি দেয়া হলো, খেলার মাঠে উনি ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, শোনার জন্য।

আমি প্রথমে খোরশেদের কাছে শুনতে পেলাম যে, ছাত্রদের মধ্যে একটি বিষয়ে বিতর্ক চলছে। তাঁর উদ্দেশে একটি বক্তৃতা ওরা দেবে এবং দেখা গেল ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি (অবশ্যই সে নির্বাচিত) একজন হিন্দু। একজন হিন্দু এই বক্তৃতাটি পড়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করবে, অনেকেই এতে খুব ক্ষুব্ধ হলো। তা-ছাড়া ভাষণটিতে অনেক ব্যাপারের মধ্যে এ-ও ছিল যে, যদিও তারা এখন উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে— এ-সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে, তবে, তারা এ-ও আশা করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হবে। একদল আবার বাংলার ব্যাপারটি উল্লেখ করারই বিরোধিতা করল। শেষ পর্যন্ত বক্তৃতাটি অপরিবর্তিতই রইল তবে তা পড়ল একজন মুসলমান ছাত্র।

দেখা গেল সে-সময় দুএকটি কলেজে ধর্মঘট চলছিল। একটি নৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় এইসব কলেজের কর্মচারীদেরকে বিকেল ৩টার মিটিঙে ৪টায় আসতে বলা হল।

অতএব আমরা এসে হাঁ করে বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত মিটিং শুরু হল। লিয়াকত আলি খানকে আমি খুব পছন্দ করে ফেললাম। তাঁকে আমার বেশ সক্ষম ও আন্তরিক মনে হলো। ছাত্রদের বক্তব্য সম্পর্কে খুব একটি তিনি ভাবেননি বোঝাই গেল। তিনি বললেন, এ-বক্তব্য প্রাদেশিকতার পক্ষপাতদুষ্ট। জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন তিনি। ইতিমধ্যেই জনসভার এক বক্তৃতায় তিনি জানিয়েছেন যে তিনি মনে করেন জনগণ বরং খাদ্যাভাবে বা খাদ্যবিহীন থাকুক সে-ও ভালো কিন্তু নিরাপত্তাবিহীন নয়।

এরপর ছাত্রদের তিনি বললেন, তিনি মনে করেন প্রতিটি পাকিস্তানি অক্ষরজ্ঞানহীন থাকুক কিন্তু নিরাপত্তাহীন নয়। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই বক্তব্যের বাস্তবতা বাদ দিলেও প্রচারণা হিসেবে এর কী মূল্য থাকতে পারে? ব্রিটিশ জনগণ খুব খুশি হয়ে উঠেছিল যখন চার্চিল তাদেরকে কেবল রক্ত, কষ্ট, অশ্রু আর ঘাম দিতে চাইলেন, কারণ এই পণ্যগুলোর সরবরাহ তাদের কাছে খুবই কম ছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষুধা ও অজ্ঞতা ইতিমধ্যেই প্রচুর দেখেছে ও পেয়েছে। তারা কি আরও চায় এসব? মনে হলো— একথা বলার মানে তা হলে একটিই হতে পারে যে তিনি সত্যিই তা-ই বোঝাচ্ছেন।

যে-সমালোচনাই মনে-মনে করি না কেন, আমার মনে হলো মুসলমান হলে তার বক্তৃতায় আমি খুবই উদ্বুদ্ধ বোধ করতাম। কিন্তু অমুসলিমদের জন্য তাঁর ভাষণে কিছুই ছিল না। যেন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মনে হলো তিনি যেন যৌথ অসচেতনার ভেতর দিয়ে তাদের অস্তিত্বকেই দমন করতে চাচ্ছেন এবং দমননীতি সবসময়ই অসামাজিক প্রতিঘাতের রূপ নেয়। আমি জানি না আমার বিশ্লেষণের ফল অতদূর গড়াবে কি-না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলায় সবসময়েই ক্রিস্টমাসের সময়টা হচ্ছে সবচাইতে চমৎকার সময়। আমার ইংরেজি অভিজ্ঞতায় দিনগুলো বেশ উষ্ণ, নির্মেঘ, রাতে বেশ সতেজ-করা শিরশিরে ঠাণ্ডা। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন ইংরেজ সদস্য আমাকে বড়দিনটিতে পিকনিকের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর গাড়ি আমাকে তুলে নেবে বলে অপেক্ষা করছিলাম, সে-সময় ঢাকা বেতারের একটি গাড়ি এসে থামল। বেতার-কথিকার পরিচালক নেমে এলেন। 'আজ রাতে আমরা একটি বিপদে পড়েছি। মনে হলো আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।' ইংরেজিতে তাঁরা একটি ধারাবাহিক কথিকা প্রচার করছেন, 'ইতিহাসের ইতিহাস' নামে। ঐ সন্ধ্যার বিষয় ছিল কার্ল মার্কস। কোন কারণে (নিঃসন্দেহে আদর্শগত), বক্তা ও তাঁর কথিকা কিছুই শেষ মুহূর্তে আসেনি। আমি কি পনেরো মিনিটের একটি কথিকা লিখে সন্ধ্যা সাতটায় বেতারকেন্দ্রে আসতে পারি? তাঁরা দ্রুত সেটা দেখে দেবেন ও আমি সাড়ে সাতটায় সেটা পড়ব? 'তবে অবশ্য', তিনি শান্তভাবে বললেন, 'সমাজতন্ত্রকে সেখানে উল্লেখ করার দরকার নেই।'

আমাকে চিন্তা করার সময় না দিলে অসম্ভব কাজেও আমি সম্মতি দিয়ে বসি। এই প্রস্তাবটিও এমনই অসম্ভব ছিল যে আমি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলাম। পিকনিকের মজা তাতে মাটি হয়নি। আমরা গাড়ি নিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেলাম। আলোছায়ায় ঘেরা চমৎকার একটি জায়গা খুঁজে বের করলাম, বিয়ার আর স্যান্ডউইচের সাথে সাথে গল্প চলল। সবই হলো কার্ল মার্কসকে বাদ দিয়ে যিনি আমার মনের ভেতরে তাঁর মুহূর্তগুলো গুনছিলেন। আমার নিমন্ত্রণকর্তা পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিসের জন্য তাঁর প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। বাঙালি ছাত্রদের সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রশাসক হিসেবে তাঁর ধারণা খুব খারাপ ছিল : ভাষাবিতর্কে তাঁর মতে তারা সম্পূর্ণ ভুল। কী করণীয় সেটাই আসল। নিরাপত্তার জন্য খুব শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন দরকার। আর ফেডারেল বা চুক্তিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসন যেটা আসলে বাঙালিরা চাইছে, সেটা হবে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহিত করা। গ্রামীণ দারিদ্র্য এখন সবচাইতে বড় সংকট নয়। আমি হয়ত এসব নিয়ে একটু বেশিই ভাবছি। আমার ইংরেজ মনে এদেরকে বিচার করছি যেমনটি ইংল্যান্ডে করতাম। তবে নিশ্চিত ছিলাম (তাঁর মতোই) যে তারা খুব ভালো অবস্থায় নেই। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সরকার ঢাকায় বা করাচিতে যেখানেই থাকুক, তাদের জন্য করার খুব বেশি কিছু নেই।

তিনি জানতেন তিনি কী বলছেন আর আমারও উত্তর দেয়ার মতো কিছু নেই। আমি জানতাম, ভালোভাবেই, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মীদের সাথে এ-ব্যাপারে নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ অনেক বেশি ছিল। সেখানে বাস্তব বিবেচনায় একজন প্রশাসকের দৃষ্টি এড়ায় না এমন অনেক মূল্যবোধকে আমরা সবাই পাশ কাটিয়ে যেতে পারি। যাহোক আমি কিছুতেই মাথা থেকে এ-ভাবনা দূর করতে পারলাম না যে, বাঙালিদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেয়ার মানে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই উৎসাহ দেয়া। তারা চাইছে সম্ভব হলে পাকিস্তানি ও বাঙালি থাকতে কিন্তু সরাসরি একটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ করতে হচ্ছে— করাচিই এটা তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে— তারা পাকিস্তানি থাকতে চাইবে কি-না— আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। চূড়ান্ত মুহূর্তের আগে ওরা নিজেরাও হয়ত নিশ্চিত নয়।

গ্রামের দারিদ্র্য যদিও একটি আপেক্ষিক ধারণা তবু একটি চরম সীমারেখা ছিল। গ্রামবাসীরা তার ঠিক ওপরে বাস করত। এর নিচে যাওয়া মানেই মৃত্যু। কোন পরিবর্তনে বিশ্বাস করার ক্ষমতা বা শক্তি হারিয়ে সন্দিগ্ধ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল জনগণ। আমার অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতেও দেখতে পেয়েছিলাম যে বন্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশাল কোন ব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থায় সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর মতো প্রচণ্ড দ্রুত সংস্কার, কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের আগেই দরকার। তার মানে এই কাজে হাত দেয়ার আগে সরকারকে নিজের ক্ষমতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আমি কখনও এমন কিছু শুনতে বা জানতে পারিনি যা থেকে আন্দাজ করব সরকারের এ-ধরনের কোন পরিকল্পনা আছে।

কৃষিতে কী ঘটেছে তার ওপরে পরের সপ্তাহের ডায়েরিতে লেখা কথাগুলো থেকে এ বিষয়ে কিছু জানা যাবে।

২ জানুয়ারি, ১৯৪৯ : আগামীকাল নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে। খোরশেদ গতকাল এসেছিল। কৃষি কলেজের এক ছাত্রের সাথে ও ভ্রমণ করছিল। সে ওকে জানিয়েছে যে গত বছরের চেয়ে কম ছাত্র এ-বছর কলেজে পড়তে আসবে। কারণ ইতিমধ্যেই যারা পাশ করে গেছে তারাই কিছু করতে পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম তারা কী ধরনের কাজ চায়? কোন কাজই নয়, তারা চায় আরও পড়াশুনার জন্য বিদেশ যেতে, কিন্তু খুব কমসংখ্যক ছেলে সে-সুযোগ পায়। যদি পায়ই তাতেই-বা কী? কিছুই না, নিজের খামারকে উন্নত করবে এই উদ্দেশ্যে কেউ কৃষি পড়ছে না। কোন খামারই নেই। আছে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত কিছু জমি, গত পঁচিশ বছর ধরে সেগুলো একইভাবে চাষ হচ্ছে। কৃষিতে এম এ পাশের বিদ্যা সেখানে কোন কাজে লাগবে কি? না, পুঁজি ছাড়া কাজে লাগবে না এবং ভিন্ন একটি ভূমিব্যবস্থা না হলে তো য়ই। কৃষকরা যদি পাঁচশ বছরে তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন না করে থাকে তার কারণ হলো, তাদের সীমিত সম্পদে জমি ব্যবহারের এর চেয়ে ভালো কোন পথ নেই।

সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে কী বক্তব্য? সরকারি মুখপাত্র মাঝে মাঝে অশুভ কোন শক্তির কথা বলে, যেমন সাধারণত শক্ত কোন বিরোধীদলের পাল্লায় পড়লে যে-কোন সরকারই বলে। কিন্তু সেইসাথে তারা কখনও একে সমাজতন্ত্র বলে, কখনও বলে ভারত, তাৎক্ষণিক সুবিধা বুঝে। আমার মনে হয় না সত্যি তারা এসব দিয়ে কিছু বোঝাতে চায় বা বিশ্বাস করে। (মনে করুন, ১৯৪৮ সালে চীনের সমাজতন্ত্রের শক্তি কেউ ধারণাই করতে পারেনি। বরং বার্মা খুব কাছে ও পরিচিত বলে, তার ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিল)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকারাবদ্ধ সমাজতন্ত্রী অবশ্য ভাষা আন্দোলনের সাথে উৎসাহী হয়ে যুক্ত হয়েছিলেন, তবে তাঁরা এটা শুরু করেননি। আমি যদ্দুর জানি ও দেখেছি, গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদের চাইতে বেশি অবগত ছিলেন। তাঁরা সম্ভবত আন্দাজ করছিলেন যে পার্টির আদর্শই এসবের সাথে বোঝাপড়া করবে। তার পরও যদি কেন্দ্রীয় সরকার আশঙ্কা করে যে বার্মার ভেতর দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ঢুকে পড়বে তা হলে সে-কারণে তারা একটি অজুহাত খুঁজে পায় পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের ভীষণ অপছন্দ যে পাঞ্জাব বাহিনী তা দিয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলার ও যে-কোন প্রতিবাদী আন্দোলন দমন করার। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে থাকতে চাই না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি বাঙালিরা পাঞ্জাবি পুলিশি রাষ্ট্রের চেয়ে সেটাই বেশি পছন্দ করবে। সুতরাং বাস্তবে জড়িত না হয়েও আমার চিন্তাভাবনাগুলো বছরের শেষে এইসব ইস্যুতে আন্দোলিত হতে হতে স্বাধীনচেতা বাঙালিদের পক্ষেই একগুঁয়েভাবে ঝুঁকে রইল।

কিন্তু সেই বড়দিনের সন্ধ্যায় ফিরে যাওয়া যাক না যদিও সন্ধ্যায় বিরতিটা বেশ উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল, কিন্তু ইতিহাসে সমাজতন্ত্রের উল্লেখমাত্র না করে কার্ল মার্কসকে উপস্থাপনে কোন সাহায্য করতে পারেনি। কিন্তু কখনও কখনও চোখ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও মন অন্ধকারেই ডিম ফুটিয়ে ফেলতে পারে। আমি বাড়ি ফিরে এলাম পাঁচটায় এবং কথিকাটির খসড়া লিখতে বসলাম যে বক্তব্যের সারাংশ ছিল এই যে, মার্কস ইতিহাস থেকে ঈশ্বরকে মুছে দিয়েছিলেন, যা আর কেউ করেনি।

স্বর্গীয় করুণার বদলে তিনি কারণ ও ফলাফলের যুক্তির শিকল এনেছেন জৈবিক প্রয়োজনে। শেষ শব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঠিক এমন সময়ে রেডিও অফিসে পৌঁছুলাম যখন ওদের হাতে কোন মতে লেখাটা পড়ে সেটা অনুমোদনের সময়টুকু কেবল থাকে, যাতে একেবারে সঠিক সময়ে ওটা পড়া যায়। মুনীর শুনেছিল এবং ভালো হয়েছে ভেবেছিল, একই রকম ভেবেছিলেন কথিকা পরিচালক যার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ছিল বিপরীত মেরুতে। সুতরাং নিশ্চিতই সত্যের একটি জয় ছিল এটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

ছাত্র এবং চাপরাশিরা

১৯৪৮ সালে ছাত্ররা প্রাথমিক বিচ্ছিন্ন লড়াইটি লড়েছিল বেশ উৎসাহ নিয়ে যাকে দায়িত্বহীনতা মনে করা ভুল হবে। কোন পক্ষই আগাম দেখতে পায়নি আসন্ন রক্তপাতের সম্ভাবনা, কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিল যে একটি প্রধান নীতি বিপন্ন।

সরকারের দিক থেকে সেটা আইন-শৃঙ্খলা : এগুলো যখন হুমকির সম্মুখীন হয় তখন প্রতিটি সরকারই একে অগ্রাধিকার দেয়, অন্তত ক্ষণিক সময়ের জন্যে হলেও সম্পূর্ণ সঠিক বিষয়েরও ওপরে। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মতো একই ব্যাপার নয়—এটা বুঝতে রাষ্ট্রনায়কোচিত মহানুভবতার দরকার যা করাচি তখন দেখায়নি, পরেও না।

ছাত্রদের দিক থেকে, তাদের বাঙালি পরিচয়ই ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং যদিও সে-বছর কেউ এ-কারণে মারা যায়নি, তারা তাদের পূর্বসূরিদের মতোই মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে কম প্রস্তুত ছিল না। তারা জানত যে দেশ তাদের পেছনে আছে, হয়ত বিদ্রোহের হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বেড়ে-ওঠা একটি প্রজন্মের ভেতরের বোধশক্তি থেকে তারা আরও জানত, কোন্ বিশেষ সীমার বাইরে দেশের সহানুভূতি বিস্তৃত হবে না ; পরাজয়কে তারা আত্মসমর্পণে পরিণত না করে গ্রহণ করল এবং তাদের স্বাভাবিক কাজে যোগ দিল। প্রায়ই যা হয়, পরবর্তীতে, ভাবনার বিরতিতে ফাটল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিতে শুরু করল।

ছাত্রদের সব ধর্মঘটের সময়ে আমার কাছে কখনও এটা মনে হয়নি যে ধর্মঘটগুলো সমানভাবে ভুল বা সঠিক। আমি এটাই প্রথম দেখেছি কিন্তু পরে ভারতে আরও অনেক ধর্মঘট হয়েছে, যার কিছু-কিছু আমার মনে হয়েছে খুব সম্মানজনক ভাবে উদ্দেশ্যমূলক নয়। ভুল বা সঠিক, সেগুলো শিক্ষার মূল্যবোধের জন্য সর্বনাশা, যখন ঘটে এবং পরবর্তী পরিণামে, উভয় সময়েই। অন্যান্য গণকর্মসূচীর মতো এটাও সুযোগ করে দেয় তাদেরকেই যারা কেবল কর্মসূচিটিকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চূড়ান্ত হিসেবে দেখেন, নেতৃত্বের জন্যে একরকম নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শান্তিকে বিঘ্নিত করে উন্নতি লাভ করেন।

১৯৪৯ সালের ঝামেলাগুলোর একটি কুৎসিত চেহারা ছিল, কারণ ছাত্ররা নিজেরাই বিভক্ত ছিল এবং যেমন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের, তেমনি সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্রদের জন্যে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষ ছিল পুরোটাই জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের ঐতিহ্য; করাচি যখন ব্রিটিশরাজের স্থান দখল করে নিল তখন তার ভেতরে আত্মসম্মানবোধ হারানোর কিছু ছিল না। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ভারতে ছাত্র ও শিক্ষকের ভেতরের শ্রদ্ধা ও স্নেহ ছিল পশ্চিমা শিক্ষার চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং পারিবারিক বন্ধনের মতোই একটি পবিত্রতা তাতে ছিল। কিন্তু আজ সে সবই অতীত। এমনকি ঐ সময়েও পশ্চিমা শিক্ষা এটা ভেঙে ফেলতে অনেক কিছু করেছে, তবুও এর স্বাদ-গন্ধ রয়ে গিয়েছিল। তাই উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যতটা স্বৈরাচারঘাতী হিসেবে অনুভূত হয়েছে ততটাই যেন পিতৃঘাতী হিসেবেও। ক্রিসমাসের সময় ড. হাসান করাচিতে একটি সরকারি নিযুক্তি নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর উত্তরসূরি ড. হোসেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক, একজন হাসিখুশি সহজগম্য লোক, যিনি ছিলেন সলিমুল্লা মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ। আমার বিশ্বাস তাঁর প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো শিক্ষায়তনিক শান্তি ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তিনি এমন একটি পদে নতুন অধিষ্ঠিত হয়েছেন যে-পদটির নিজের ভেতরেই একটি নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা বেড়ে উঠছিল এবং তাঁকে খুব সূক্ষ্মভাবে ছাত্র ও সরকারের মধ্যে তাঁর পথকে অনুভব করতে হয়েছিল। দুপক্ষই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিল যেহেতু সে-সময় পূর্ব পাকিস্তানে আর একটি ছিল না। এদের যে-কেউই এটা ভেঙে দিতে সমর্থ ছিল এবং দুপক্ষই দুপক্ষের দিকে পারস্পরিক অবিশ্বাসের তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল।

এমন হলো যে, এই পরিবর্তনে আমি লাভবান হলাম। আবাসনের ক্রমবর্ধমান সংকটে পুরনো প্রাধ্যক্ষের বাড়িটি, ছাত্রাবাস সংলগ্ন বিশাল রাজকীয় প্রাসাদটি এর কাজের জন্য বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল এবং এটিকে অধ্যাপকদের জন্যে ৪টি ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত করা হলো, যার একটি আমার ভাগে পড়ল। এটা ছিল দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাট, একটি বড় মাপমতো ঘরসহ যেটা টেরাকটা টাইলে ছাওয়া। একধারে একটি খাবার ঘর, একটি স্নানঘর যেখানে কলের পানি প্রবাহিত হত এবং সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায় এমন সিংহাসনের মতো উঁচু ডায়াসের ওপর শৌচস্থান, যার ওপরে একটি পানির পাত্র আছে, চেন টেনে দিলে ফ্লাশ করে। আরেক পাশে একটি ছোট্ট শোবার ঘর, সবচাইতে ভালো ব্যাপার হচ্ছে অর্ধবৃত্তাকার ছাদ উন্মুক্ত গ্যালারির মতো, এর রেলিং বেয়ে নেমেছে বোগেনভ্যালিয়ার ঝাড়, পশ্চিমমুখী হয়ে বাগানের দিকে। লেখা এবং পড়ার জন্য আদর্শ স্থান, কেউ এলে তার সাথে বসে চা খাবার জন্যেও, যখন সূর্যাস্তও বিবর্ণ হয়ে আসে আর তারাভরা অন্ধকারে গুটিকয় বাঁদর দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। গত বছরের নিয়মিত অতিথিদের মধ্যে মুনীর একদিনের যাত্রাপথ, এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মফস্বল কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। মুরশিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দিয়েছে এবং তার কাজ ও নিউ ভ্যালুজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয় অফিসেই বেশি দেখা করে যায়। কিন্তু সেই স্বাভাবিক সহজ সামাজিক যাওয়া-আসা চলছেই, নতুন নতুন মুখের ; অনেকে বারবার আসছে, কেউ কখনও যাবার পথে একবার।

এখন ইংরেজি বিভাগ ভালো প্রভাষকের একটি দল পেয়েছে, অনার্স ও এম এ ক্লাসের ছাত্ররা মনে হচ্ছে যেন কাজ করতে আগ্রহী, আবহাওয়াটিও নিখুঁত। যখন ছাত্রসংসদ জানুয়ারির শুরুতে একটি ধর্মঘটের ডাক দিল আমার মনটা দমে গেল ; এই শান্ত সমাহিত প্রশান্ত পরিবেশকে এলোমেলো করতে শুরু করার জন্যে বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি যেন হয়ে গেল। এবং ধর্মঘট ঠিক কোন নির্দিষ্ট কারণে বলেও মনে হলো না—বরং এত বেশি পরস্পর-অসংবদ্ধ কারণে, যে, মনে হলো এর প্রতিটিই যেন কোন কার্যকর কারণ নয়, ছুতো বা অজুহাত মাত্র। একটি দায়সারা ব্যাপার বলে সেটি প্রমাণিত হলো যা কিনা সারাদিনও টিকল না, কিন্তু এটা সরকারকে একটি উপলক্ষ তৈরি করে দিল একথা বলার যে, সে এখন কঠোর পথ নেবে, যেসব ছাত্র এই গোলযোগ সৃষ্টি করেছে তারা কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত এবং দেশের শত্রু। এটা ছিল আবেগের ভাষা, সত্যের ভাষা নয়। স্বাভাবিকভাবেই ক'জন কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল, কিন্তু সামাজিক প্রতিবাদের এই বেড়ে-ওঠা আন্দোলনের জন্যে তারা দায়ী নয়। এবং স্বাভাবিকভাবেই বেশ বড় একটি অংশ এই উপলব্ধি থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের নিজেদের উদ্যোগে কোন আন্দোলন করে উঠতে পারত না।

আমি সরকারকে পছন্দ করিনি কিন্তু মনে হচ্ছিল যে তারা গভীরভাবে চাইছিল মার্চের বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই ছাত্রদের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে। ভালো বা মন্দ উদ্দেশ্য যেটা নিয়েই হোক কোন সরকারই এরকম একটি অংশের চাপ নিয়ে খুশি মনে তার কাজ করে যেতে পারে না, যারা কারও কাছেই নির্দিষ্টভাবে দায়ী নয়, কিন্তু দরজায় সশব্দে আঘাত করে যাচ্ছে আর নীতি নির্ধারণে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। মার্চেই, নিশ্চিতভাবে মনে পড়ছে, খেলাটা শুরু হলো, কোন প্রত্যক্ষ ম্যাকিয়াভেলিয়ান পরিকল্পনা থেকে নয়, কিন্তু তেমন একটি অশুভ দৈব দুর্ঘটনার ফলে, যখন সবকিছুই একসাথে যেন খারাপের জন্যে কাজ করে। ৩ মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশি, বেয়ারা ও ঝাড়ুদাররা ধর্মঘটে গেল। এর কিছু আগে তারা সবরকম যথাযথ নিয়মের মধ্যে একটি পরিমিত দাবির তালিকা পেশ করেছিল : বেতনবৃদ্ধির যা কিনা ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের কারণে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, ভবিষ্যৎ তহবিলের, যেহেতু তাদের কোন পেনশন ছিল না, বছরে একবারের পরিবর্তে দুবার পোশাক দেয়ার এবং তাদের ইউনিয়নের স্বীকৃতির। কোন নজরই দেয়া হয়নি সেদিকে, সুতরাং তারা ধর্মঘটের নোটিস দিল এবং ধর্মঘটে গেল।

অসহায়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভর করতে লাগল তাদোর ওপর, যাদেরকে যৌথভাবে এবং কিছুটা হেয় করে 'মেনিয়াল স্টাফ' বা চাকর বলা হত। সেইদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থাগার, লেকচার রুম, গবেষণাগার গুলো তালাবদ্ধ রইল, ক্লাস স্থগিত হলো। এই চাপিয়ে দেয়া ছুটিকে সব ছাত্র সম্ভাষণ জানালো না। আমার তৃতীয় বর্ষ সম্মানের ছাত্ররা, আসন্ন ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমার ফ্ল্যাটে মিলিত হবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু তাদের সহানুভূতি ছিল ধর্মঘটীদের দিকে। সন্ধ্যার দিকে ছাত্রাবাসগুলো খুবই অস্বস্তিকর হয়ে উঠল, ঘর ঝাড়ু দেয়া হয়নি, থালাবাসন ধোয়া হয়নি, স্নানঘরে পানি নেই, শৌচাগারগুলো অপরিষ্কার। ছাত্ররা বেয়ারাদের সাথে দেখা করল এবং জরুরি কাজগুলোর বিনিময়ে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাল। একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করল—যেখানে উদারভাবে বেয়ারাদের একজন প্রতিনিধিকে রাখা হলো এবং ছাত্ররা একটি সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট ডাকল।

আরও পরিশীলিত নেতারা হয়ত ভেবেছিল 'নেতৃত্বের জন্য কাজ' একটি ভালো কৌশল। তারা যদি তাদের ক্লাস চালানোর অধিকারের ওপর জোর দিত, লাইব্রেরিতে বই পেতেই হবে এমন বলত, গবেষণাগারগুলোকে চালু রাখতেই চাইত এবং একই সাথে একজন বেয়ারা সাধারণত যা করে থাকে সেইসব কাজ করতে অস্বীকার করত, প্রশাসন ও শিক্ষকদের জন্য জীবন নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব হয়ে উঠত। কিন্তু তারা সনাতন ধর্মঘটের কর্মসূচির বাইরে চিন্তা করতে শেখেনি ; তা-ছাড়া এতে হয়তো আন্দোলনের উদ্যোগটাও বেয়ারাদের হাতে চলে যেত। মাত্রই জনস্বার্থের অভিভাবকরূপে এগিয়ে এসে আবার সেই দায়িত্বটা ছেড়ে দিতেও তারা অনিচ্ছুক ছিল। বেয়ারারাও মনে হলো যেন খুব দক্ষতার সাথে নিজেদের জন্যে কাজ করছিল। তা সত্ত্বেও শ্রেণী আনুগত্যের মনোভাব এমন গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে তারা বাধ্যগতের মতোই তাদের বিষয়টি পরিচালনার ভার ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দিল। স্পষ্টতই তারা কোন সামাজিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিল না।

হয়ত সেই একই সামাজিক ঐতিহ্যবোধ উপাচার্যকে সরাসরি বেয়ারাদের সাথে কথা বলার চেয়ে ছাত্রদের মাধ্যমে বলতে উদ্দীপিত করেছিল। আমি বরং মনে করি এটা বিচারের ভুল ছিল। বেয়ারাদের আগ্রহ ছিল একটি যুক্তিপূর্ণ সমঝোতায় যেখানে ছাত্ররা, যারা এর কোন শর্ত দিয়েই প্রভাবিত হবে না, জোর দিচ্ছিল বেশ দর্শনীয় একটি বিজয়ের প্রতি। আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে, নিশ্চিতভাবে উপাচার্য সাহেব বেয়ারাদের দাবিগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে করেন এবং যতটা পারেন মেটাবেন। জটিলতাটা ছিল এই যে, মেনিয়ালরা সরকারি অফিসের বেতনের মতোই বেতন পেত। তারাও অসন্তুষ্ট ছিল কিন্তু অপেক্ষা করছিল একটি বেতন কমিশনের রিপোর্টের জন্য। এবং ভাবছিল আমরা যদি রিপোর্টের আগেই কোন কর্মসূচি নিই সরকার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবে।

হঠাৎ করে আবহাওয়াটা বদলে গেল। কীভাবে তা হলো আমি কখনওই সঠিক জানতে পারিনি কারণ বরাবরের মতোই আমার ছবিটি তৈরি হয়েছে কিছু অনিশ্চিত জনশ্রুতি, এবং আমার নিজের দেখা ও শোনা কিছু বিষয় নিয়ে। গত সপ্তাহের ঘটে-যাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে, অনুমান মিশিয়ে আমি লিখছি ১৯৪৯-এর ১১ মার্চে : আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম কাজ শুরু করা যায় কি-না দেখতে, কিন্তু লাইব্রেরি ভবনের দরজা তালাবদ্ধ থাকত। আমার মনে পড়ে সেটা ছিল বুধবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সশস্ত্র পাহারাদাররা পাহারা দিচ্ছিল। প্রক্টর ও অন্য শিক্ষকরা ফটকের কাছে দাঁড়ানো। আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি, তিনি উত্তর দিলেন, 'আমরা তাদেরকে আরেকটি সুযোগ দিচ্ছি। যদি তারা বেলা দুটোর মধ্যে কাজ করতে আসে তাদেরকে বরখাস্ত করা হবে না।' আমি বললাম, 'এটা তো চরমপত্রের মতো শোনাচ্ছে।' 'হ্যাঁ তা-ই বটে'। 'আর এটাকে আপনি বলছেন দ্বিতীয়বারের মতো সুযোগ দেয়া।' তিনি হাসলেন।

তিনি বললেন, এবার কর্তৃপক্ষ খুব কঠোর মনোভাব নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মনে হলো এবং বলেও ফেললাম যে কঠোরতা প্রদর্শনের এটা একটি ভুল সময়। মনে হচ্ছে শাস্তি দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যেন বাড়াবাড়িই করে ফেলছে বেয়ারাদের প্রতি যারা বরাবরই ভালো ব্যবহার করে আসছে। মনে হয় ছাত্ররা যারা এর চেয়েও অনেক তুচ্ছ কারণে ধর্মঘট ডাকে, তার পর আবার সময় নষ্টের অজুহাতে পরীক্ষা পিছায়, তাদের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেনি বলেই হয়ত।

তারা ফিরে এল না। আমি শুনতে পেলাম ছাত্রদের উপদেশে বেয়ারারা একটি লিখিত প্রতিশ্রুতির দাবি জানাল যে তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেয়া হবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কাজে যোগ না দেয়া পর্যন্ত কিছুই করতে রাজি হলো না। বুধবারে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী কমিটির সভা ছিল যেখানে ছাত্ররা দলে দলে মিছিল করে এল।

মনে হলো নির্বাহী কমিটি ছাত্রনেতাদের ডেকে বলে দিল যে ছাত্রদের এবং বেয়ারাদের অবশ্যই বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার মধ্যে ক্লাসে ও কাজে যোগ দিতে হবে। ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হবে, পোশাকও সরবরাহ করা হবে কিন্তু আর্থিক দাবিদাওয়া পূরণের ব্যাপারে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি করা হবে, মফস্বল থেকেও সদস্য নেয়া হবে—সেটা আরও দশদিনের নোটিস দিয়ে গঠন করা হবে।

বাহ্যত ছাত্রনেতারা সময়মতো, ঠিক এগারোটায় আসতে ব্যর্থ হয়েছিল। অনেক বেয়ারাই তখন কাজে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু ছাত্ররা আলোচনা চালাতে লাগল এবং দুটোর সময় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। তারা অবাক হয়ে গেল যে উপাচার্য তখন তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তালাবদ্ধ রইল, বেয়ারাদেরকেও পুনর্বহাল করা হলো না। অর্থনীতি বিভাগের মিস্টার সেন ছাত্রদেরকে উপাচার্যের কাছে গিয়ে তাদের দেরির জন্য ক্ষমা চাইতে ও তাদের অপরাধকে উপেক্ষা করার অনুরোধ করতে বললেন। কেউ-কেউ হয়ত তা করত কিন্তু অন্যেরা প্রচণ্ড খেপে গেল। যাহোক, তারা সত্যিই এই সময়সীমার ব্যাপারটায় পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল এবং বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যদি গোলমাল পাকাতে চাও, তা-ই হবে।'

মিছিল ও স্লোগান চলতে লাগল কিন্তু উপাচার্য অনড় রইলেন। একটি প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে গেল, তিনি পুলিশ প্রহরায় তাদের গ্রহণ করলেন এবং যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা অনুরোধ করল, পুলিশ সরিয়ে নিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলেন এবং সমস্ত বেয়ারাকে বরখাস্ত করলেন।

ছাত্রদেরকে ছাত্রাবাস ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে বলা হলো, সকালের নাশতা দেয়া হবে কিন্তু তারপর আর কিছু নয়। ছাত্ররা এর প্রতিবাদে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে, জানাল যে, তারা কেউ হল ছেড়ে যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় আগামীকাল খুলতেই হবে এবং দাবি না মানলে উপাচার্য পদত্যাগ করবেন। প্রাধ্যক্ষ তাদের বোঝালেন যে তারা চলে না গেলে পুলিশ তাদের উচ্ছেদ করবে। তা-ই যদি সত্যি হয় এর অর্থ রক্তপাত।

হঠাৎ পরিস্থিতি এমন মোড় নিল কেন? এর কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমি নিশ্চিত যে ড. হোসেন নিজের ইচ্ছায় এমন সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি নিশ্চয়ই সরকারের প্রচণ্ড চাপে এমন আচরণ করছেন। মনে হচ্ছে যেন, সরকার ব্যাপারটিকে শক্তি পরীক্ষার বিষয় হিসেবে নিয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে দেখাতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় কার দখলে। আমি এমন প্রস্তাব করতে শুনেছি, যা হয়ত অসম্ভবও নয় একেবারে, যে, তারা চাইছে আইন পরিষদের সভা চলাকালে এই কৌশলে ছাত্রদের ঢাকার বাইরে পাঠাতে, আজই পরিষদের সভা শুরু হচ্ছে।

অনেকে এসবের পেছনে একটি অদৃশ্য হাতের কথা বলছে এবং এই আন্দোলনকে রেলওয়ে ধর্মঘটের হুমকি ও সীমান্তের ওপারের গোলমালের সাথে মেলাতে চাইছে। যেন কমিউনিস্টদের উস্কানি ছাড়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাইকে অসন্তুষ্ট করার মতো যথেষ্ট কারণ নেই বা ছিল না। যদি এখানে অদৃশ্য হাত থেকেই থাকে তা হলে তা এসেছে অপরদিক থেকে। এটা সত্য যে, কোন আন্দোলন শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টিই সেটার সুযোগ নেয়ার জন্যে সবচাইতে ভালো অবস্থায় আছে। যেহেতু বিরোধীদলকে খুব সুপরিকল্পিতভাবে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে তাই এই আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল।

ধর্মঘটের প্রথমদিকে ছাত্রদের হস্তক্ষেপ আমাকে বিরক্ত করেছিল কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় আমার মনে হলো যে, সংকটটিকে যেন এমনভাবে সৃষ্টি করা হলো যাতে সরকার সেটাকে দাবিয়ে দেয়ার সুযোগ পায় এবং তা-ও ঠিক এমন সময়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকারের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজে স্থিত হবার একটি লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

মার্চ ১২ই : আজ সকালে ছাত্ররা শহরে মিছিল নিয়ে ঘুরে এল, দাবি ছিল শিগ্‌গির বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে হবে। আমি যদ্দুর শুনেছি, কোন 'ঘটনা' ঘটেনি, কিন্তু তারা বাড়িতে ফিরে যেতে চায়নি। আমার মনে হয়, তারা ঢাকার অন্যান্য কলেজের ছাত্রদেরকে বেরিয়ে এসে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে আবেদন জানাবে। আর যেহেতু গতকাল আইন পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়েছে, ভালো একটি ঝড়ের সম্ভাবনাই আছে। অপরদিকে যদি তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়েও যায়, মফস্বলে গিয়ে ছাত্র-জনতার মাঝে প্রচার করতে শুরু করবে। এ. এ. (একজন বিভাগীয় প্রভাষক) আজ বিকেলে এসেছিলেন। তিনি উপাচার্যের সাথে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিলেন এবং জানতে পেরেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় আবার খুললে, বেয়ারাদের যারাই আবেদন জানাবে, আপনা-আপনিই তারা চাকরি ফিরে পাবে। কিন্তু মনে হল, ২৬ মার্চের আগে খোলার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ ঐদিন একটি পূর্ণ ই.সি. মিটিং ডাকা হবে।

১৭ এপ্রিলের আগে খোলা হলো না। সব মিলিয়ে ছয় সপ্তাহের বিরতি পড়ল কাজে, যার মধ্যে আইন পরিষদের অধিবেশনও চলছিল। এটা কি দুর্ঘটনা না পরিকল্পিত? সত্য থেকে অনুমানটিকে আলাদা করে নিলে, আমি যা বলেছি তাতে কোন উপসংহারে পৌছানো যায় না। সরকার তার উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ঘোষণা করছিল। কিন্তু উপাচার্য, সরকার নয়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেন। তাঁর এমনটি করার কারণ হিসেবে দেখালেন, তাঁর দেয়া ৩ ঘণ্টার সময়সীমা ছাত্ররা অতিক্রম করেছিল তাই। ছাত্রনেতারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের কোন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি এবং একথা তারা অন্যদের বলেওনি, যেখানে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা সমান নিশ্চিত যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। এই ব্যাপারে সত্যটি কখনোই স্পষ্ট হয়নি। আমার মনে হয়, আইনি কোন আদালতে ব্যাপারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু কেউই তখন সেটা খুঁজতে গেল না। একটি যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব যখন পূর্ণ উদ্যমে চলে তখন তার পেছনের কথাগুলো অন্য যে-কোন কিছুর মতোই নিরর্থক হয়ে যায়।

পুরো ব্যাপারটিকে একটি নতুন ও অশুভ চেহারা দিল পুলিশের উপস্থিতি, যেখানে উপাচার্যের অনুমোদন ছাড়া তারা থাকতেই পারত না। ওপরে-ওপরে অন্তত মনে হয়নি যে এটা এমন একটি সংঘাত যা পেশিশক্তি ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয়। যথেষ্ট কারণ ছাড়াও তিনি ইচ্ছেমতো পুলিশ ডাকতে পারতেন, অথবা ছাত্রদের ভয় দেখানোর জন্যে তাঁকে চাপ দেয়া হতে পারে পুলিশ আনতে। যে-কারণই থাকুক না কেন, ছাত্ররা এটিকে একটি ষড়যন্ত্র হিসেবেই মনে করল, অঘোষিত একটি আইন যেন জন্ম নিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলার সাথে সাথেই আরও গোলমালে জড়িয়ে গেল।

অন্তর্বর্তীকালটুকু যেন ছিল একটু নিশ্বাস নেয়ার খোলা জায়গা যা আমায় কিছু মজার ঘটনা মনে করিয়ে দেয়ার মতো সময় দিল, যদিও মূল ঘটনার সাথে এর সম্পর্ক খুবই প্রান্তিক। মুনীর গ্রেফতার হল এবং ঢাকা জেলে নিরাপত্তা কয়েদি হিসেবে কয়েকমাস কাটাল। ওর বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না, কিন্তু যেহেতু ওর কলেজটা বেশ দূরে, মার্চের ১১ তারিখে ঢাকায় ওর উপস্থিতি পুলিশের কাছে সন্দেহজনক মনে হলো। তারা ওকে কমিউনিস্ট হিসেবে জানত এবং সরকারও ধরেই নিয়েছিল যেসব ছাত্র গোলমাল করছে তারা সবাই কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ; তাদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত ছিল যে, ও ঢাকায় এইসব গণ্ডগোলের নির্দেশনা দিতেই এসেছে। আসলে ও এসেছে খুবই নিষ্পাপ একটি কারণে, ওর অধ্যক্ষ কলেজের নিয়মিত কাজের একটি অংশ হিসেবে ওকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার ফির কিছু টাকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে নিয়ে যাবার জন্য এবং একটি রশিদ সেখান থেকে তুলে নেয়ার জন্য। যদিও তার মানে এই নয় যে, খুব কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা সামনে ঘটতে দেখলেও ও সেটা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। তা ছাড়াও পার্টির সাথে কোন দ্বন্দ্বে না গিয়েও ও নিজেকে সভ্যপদ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল কারণ ও চাইছিল সৃজনশীল একজন লেখকের স্বাধীনতা। কিন্তু শিল্পের স্বাধীনতা হচ্ছে সর্বশেষ বিষয় যা একজন পাঞ্জাবি পুলিশ বুঝবে বলে আশা করা যায়।

গ্রেফতারের খবর পেয়ে আমি ওকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করলাম। প্রায় একপক্ষকালব্যাপী অর্থহীন কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর গোয়েন্দা শাখার একজন পরিদর্শক আমার সাথে দেখা করতে এলেন এবং জানালেন আমি একটি সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাব যা কিনা কেবলমাত্র বন্দির আত্মীয়স্বজনকে দেয়া হয়। আমরা পরদিন সেটার ব্যবস্থা করলাম। তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা এবং পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে, বেশ আগ্রহী তরুণ, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কর্তৃত্বপরায়ণ, তাঁর চলে যাওয়ার পর আমি আমাদের কথোপকথনের একটি নোট তৈরি করলাম।

সে বলেছিল মুনীর পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে— তার কাজকর্ম রাষ্ট্রের জন্য নাশকতামূলক (তারা ওকে কোনকিছুর জন্যে অপরাধী সাব্যস্ত করেনি এবং আমি কৌতূহলী হলাম এটা দেখে যে, পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটির একটি দলগত ধারা আছে মেনে চলার মতো, যা কোন অংশেই কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে কম নয়)। আমি বললাম যে, আমার দৃষ্টিতে সে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একজন বিদ্যার্থী এবং সম্প্রতি সে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, নিজের সৃজনশীল কাজ করার জন্য।

লোকটি : এই পরিবর্তন রাষ্ট্রের পক্ষে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়ের নয়।

আমি : কিন্তু ওকে গ্রেফতার করে রেখে কী করে রাষ্ট্র তা বিচার করার সুযোগ পাবে?

তিনি : জেল সংশোধন ও শাস্তি দুটোরই জায়গা।

আমি : কিন্তু যখন সে কেবলমাত্রই নিজেকে লেখাপড়ায় নিবেদিত করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, একটি কলেজে অধ্যাপনার নতুন চাকরি পেয়েছে, সেই সময়ে এমন বাধা আমার কাছে মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না।

তিনি ঠিক কী বলেছিলেন আমি ভুলে গেছি, কিন্তু মনে হলো তিনি ভাবছেন আমি যদি মুনীরের কাছ থেকে কোন সঠিক নিশ্চয়তা এনে দিতে পারি, কর্তৃপক্ষ হয়ত তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে।

আমি বললাম যে ওর ওপরে কোন ধরনের চাপই আমি দেব না, তবে মুনীরের মতামত জানার চেষ্টা করব।

অবশ্যই আমি মুনীরকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে মানা করব না। আমার মনে হয়েছিল ওর হৃদয়ে রাজনীতির চেয়ে সাহিত্যই বেশি ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি ও কোন গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করত, যেটা ওর লেখার যোগ্য, সেটা ওকে আরও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা দেবে, হয়ত সরকারি নজরদারিকেও যুক্তিসঙ্গতভাবে একটু বিরাম দিতে পারে এই বলে যে, এই কাজ শেষ না করা পর্যন্ত রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। আমার মনে হল এসব কথা বলার আগে ওর সাথে দেখা করাটাই জরুরি। এরপর সেই পরিদর্শক বিষয়টি নিজেই পাল্টে ফেললেন তার বোনের ব্যাপারে কিছু উপদেশ চেয়ে। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চায় ১৯৫১ সালে একজন প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হিসেবে (ছাত্রদেরকে স্কুল থেকেই পরীক্ষাটা দিতে হত, কিন্তু মেয়েদেরকে বাড়ি বসেও পড়ার সুযোগ দেয়া হত কারণ প্রচুর পরিবার পর্দাপ্রথা মেনে চলত এবং মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাত না), তার নিজের ভাষা বাংলা নয়, উর্দু। তিনি জানতে চাইলেন, ভাষার ব্যাপারে কোন্ কোন্ পত্র ও কী কী নির্ধারিত পাঠ্যবই তাকে পড়তে হবে। আমি এসব বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারলাম। তিনি জানালেন, তাঁর বোনের এই পরীক্ষার ওপর কী কী ব্যাপার নির্ভর করছে। মেয়েটির একজন সরকারি কর্মকর্তার সাথে বিয়ে হয়েছে, যে পাকিস্তান হওয়ার পর আশাতীত দ্রুততার সাথে পদোন্নতি পেয়েছে। তার কর্মজীবনের জন্যে এখন একজন শিক্ষিত স্ত্রী প্রয়োজন এবং সদাশয় ব্যক্তি বলে সে মেয়েটিকে দুবছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। যদি সে এই সময়ের ভেতরে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে, ভালো। না পারলে তার বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া উপায় রইবে না।

বিয়েবিচ্ছেদ হিন্দুসমাজে মোটেও স্বীকৃত নয় তবে ইসলামি আইনে একজন পুরুষের পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। নীতিগতভাবে যতটা বুঝি নারীর জন্যেও তা-ই, ব্যতিক্রম এই যে, সীমাবদ্ধ জীবন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ সাক্ষী যোগাড় করা কঠিন করে তোলে। তবে যে-সমাজে মেয়েদের জন্য বিয়ে ছাড়া অন্য কোন বৃত্তির সুবিধা নেই, সেখানে তারা এমনটি হোক খুব একটা চায় না। আমি আশা করেছিলাম এই তরুণীটি তার জীবনের চ্যালেঞ্জকে সাফল্যের সাথে গ্রহণ করবে, তবে পরবর্তীতে আর সে-ব্যাপারে জানতে পারিনি। পরদিন বিকেলে কারা-পরিদর্শক ও সেই বন্ধুভাবাপন্ন কর্মকর্তাটির সামনে আমি মুনীরের সাথে দেখা করলাম। ও আসার আগে ওরা মন্তব্য করছিল যে ও ভুল লোকজনের সাথে মেশে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম যে, এই কারণে কাউকে গ্রেফতার করা হতে পারে এবং বললাম স্বাধীনতা ও সহনশীলতার পাকিস্তানি ধারণা বোঝা আমার পক্ষে খুব কঠিন। এর উত্তরে সেই গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাটি হাসিমুখে সরলভাবে উত্তর দিল, তার মনে হয় আমার কাছে সেটা কঠিনই লাগবে। কারণ, একটি দেশ তার অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছে এমন আমার অভিজ্ঞতায় দেখা নেই। আমার মনে হলো সমস্যাটি হচ্ছে একটি দেশ তার অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছে, আর একটি সরকার নিজেকে ক্ষমতায় রাখার জন্য লড়াই করছে, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা। ভালোভাবে পরীক্ষিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই পার্থক্যকে স্বচ্ছভাবে ধরে রাখা খুবই কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনীর এলো, অদম্য আনন্দে ভরপুর এবং আমরা খুব সতর্কভাবে এক ঘণ্টা কথা বললাম, শ্রোতৃবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, সাহিত্য, নাটক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারকম রটনা ইত্যাদি নিয়ে। ও জানাল, জেলখানা খুব খারাপ নয়, সিগারেটের মতো বিলাসদ্রব্য কিনতে পাঠাতে পারে না বটে, তবে বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেতে পারে। কারা-পরিদর্শকদের অনুমতি ও অনুমোদনসাপেক্ষে তারা বইপত্রও পাঠাতে পারে, আবার সময়মতো ফেরতও নিয়ে যেতে পারে। ও কাজে ফিরে যেতে চাইল রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করে। গবেষণা প্রকল্পের ধারণাটা খুব পছন্দ করল এবং আমি চলে আসার আগে আমরা এর একটি খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেললাম।

আসার পথে গোয়েন্দা বিভাগের লোকটি, যে সত্যিই ভালো ছিল, বলেছিল কেসটি পর্যালোচনার জন্য কার কাছে যেতে হবে। ও জানাল যে তারা হয়ত মুনীরকে পরীক্ষা করার জন্য লোক পাঠাবে আর ওরা যদি এ-ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়, যে, মুনীরের হৃদয়ে সত্যিই কোন পরিবর্তন এসেছে এবং সরকারের সাথে সহযোগিতার একটি আন্তরিক প্রতিশ্রুতি ও করে তবে হয়ত ওকে ছেড়ে দেয়া হবে। এই তা হলে পিতৃসুলভ সরকারের কার্যক্রম! আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম কতদিন একজন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ব্যক্তি জেলখানার বাইরে থাকতে পারবে? অথবা কেউ কি প্রশ্ন করতে পারে যে এমন কর্তৃত্বের দাবিদার যে-সরকার সে কী করে তার প্রাপ্য আন্তরিকতা পাবে?

আমার মনে হয় মুনীরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে না পেরেই ওরা ওকে ছেড়ে দিল, একটি শান্ত সময়ের অবকাশে। ও চলে গেল ওর কলেজে, যারা ওর জন্য পদটি খোলা রেখেছিল। পরে যখন দেখা হলো ও আমাকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে Pride and Prejudice পড়ানোর মজার মজার নিজস্ব কৌশলের কথা উৎসাহের সাথে বলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর জন্য একটি পদ খালি হবার আগে আমি নিজেই ঢাকা ছেড়ে চলে গেলাম। কিন্তু এটাই ছিল ওর সঠিক জায়গা এবং ও যখন সেটা গ্রহণ করল, সবাই খুশি হলো।

মনে হয় সেটা ছিল মার্চের শেষ, যখন হোরেস আলেক্সান্ডার ও আগাথা হ্যারিসন ঢাকায় তিনদিন কাটালেন, পরের জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হতে যাচ্ছিল তার সম্ভাবনা খোঁজার জন্য। এই ব্যাপারে পরিকল্পনা ছিল দশ দিন পরপর দুবার সম্মিলিত হবার, যেখানে সদস্যরা পাঁচজনের দলে ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখবে শান্তির জন্য গঠনমূলক কী করা যায়। এ যেন ঘন কুয়াশা থেকে দিনের নীলচে আলোয় উঠে আসা, আমাদের ক্রুদ্ধ, অদূরদর্শী, তুচ্ছ কলহ থেকে বেরিয়ে আসা, এবং যারা বিশ্বশান্তির কথা ভাবেন এমন লোকদের সাথে দেখা করা, আর উল্লসিত আনন্দের সাথে দেখা যে কী প্রাণবন্ত একদল লোক তাদের ঘিরে সমবেত হচ্ছে। অনেক হিন্দুও সেখানে ছিলেন, যাদের জন্য মহাত্মার স্মৃতি ছিল তাঁর বন্ধুদের সাথে যোগদানের নির্দেশের মতো। আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কিছু মুসলমানও ছিলেন, যুবক ও বৃদ্ধ উভয়েই। সবাই খুব আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন, তাঁরা কেবল একটি কর্মপদ্ধতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যাতে শান্তি বাড়বে, কলহ নয়। হোরেস যেদিন জগন্নাথ কলেজ হলে ভাষণ দিচ্ছিলেন সেদিন সেটা ছিল শ্বাসরুদ্ধকরভাবে পূর্ণ, আমার যদ্দুর মনে পড়ে, ছাত্র ও কর্মচারী দ্বারা। তিনি যা বললেন তা খুবই সরল ও সহজ, একেবারেই সঠিক এবং তর্কাতীতভাবে সত্য, যে, যদি কোনদিন বিশ্বনাগরিকত্ব পাওয়া সম্ভব হয় তার মানে হবে, মানবতার ভালো দিকটিকে নিজের দেশের আগে বেছে নেয়া, এই ব্যাপারেও কি কোন দ্বন্দ্ব আছে যে, আমরা বেশির ভাগই অতীতের দ্বন্দ্ব নিয়ে কলহ করতে ভালোবাসি ; যেমন একজন ধনী, যিনি বিশ্বের বেশির ভাগ জিনিসের অধিকার নিয়ে একা আরামে বাস করেন, আর তাঁর একার জন্য সব চান এবং বস্তিতে বাসরত বিক্ষুব্ধ একজন দরিদ্রের মধ্যে পূর্ববর্তী জন শান্তির বড় শত্রু। শ্রোতারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, বুঝতে পারছিল না এখানে কোথায় দ্বিমত করার আছে। আমার মনে হলো, তবু যেন সবাই এই মতটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না। শেষে একজন প্রভাষক যখন উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু কথা বলতে চাইলেন, তক্ষুনি প্রত্যাশার গুঞ্জন শোনা গেল।

তিনি ছিলেন কালো, ও মোটা, ধুতিপরা, যা দেখলে বোঝা যায় তিনি হিন্দু। ক'মুহূর্তের জন্য তিনি চারদিকে তাকালেন যেন আসন্ন বজ্রাঘাতের মতো, তারপর ফেটে পড়লেন এই বলে যে, পাকিস্তানে এমন জোরের সাথে, এইসব বলতে পারা একজন ইংরেজের পক্ষে খুবই ভালো। এমন কথা তিনি ইউরোপে বলুন, ইতিহাসে সবসময়ে যেখান থেকে বিশ্বশান্তির প্রতি সমস্ত বাধাবিপত্তিগুলো এসেছে। ভারত ও পাকিস্তানের লোকেরা পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং কোন ইউরোপীয়ানের বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই তা কীভাবে। এবার একই প্রতিক্রিয়া যেন আরও বেশি করে হলো। সারা ঘর থেকে আন্তরিক করতালির ভেতরে তিনি বসে পড়লেন। হোরেসের একজন তরুণ অনুসারী মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, তিনি কোন দেশের নাগরিক হিসেবে কথা বলেননি, বরং শান্তির একজন প্রবক্তা হিসেবে বলেছেন। তারপর আলেক্সান্ডার হোরেস নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন উত্তর দিতে। বক্তব্যটির সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে তিনি জানালেন এমন বক্তব্য দেয়া হয়েছে বলে তিনি খুশি। শান্তিনিকেতনে শান্তি সম্মেলন হবার মূল কারণই হচ্ছে এই যে আজ শান্তিবাদীরা বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষের কাছ থেকে অনেককিছু শেখার আছে। এভাবেই সভা শেষ হলো।

পরে চা পানের বিরতিতে আলাপের সময়ে তিনি জানালেন এই বিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক সাড়া কিছু ব্যাপারকে ভীষণভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। কেবলমাত্র এই মুহূর্তগুলোতেই তিনি আবেগের সেই প্রচণ্ডতা অনুভব করতে পেরেছেন যা কাজ করছে পাকিস্তান ও ভারতের পার্থক্যগুলোর পেছনে, ইউরোপ থেকে ভিন্ন তার—যে-সম্প্রদায়, তার পেছনে। নতুন করে লেখার জন্য মানবহৃদয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা মুছে ফেলা! কী আশ্চর্য এবং অদ্ভুত! পাঞ্জাবি ও বাঙালিদের এক ঘোরতর কলহের মধ্যে আমরা ছিলাম এবং এখানে যারা বসেছিলেন তাঁদেরসহ বাঙালিরা যেন মাত্র এক বছর আগে হিন্দু-মুসলিম শত্রুতার ফলে যে-রক্তপাত হয়েছিল সেসব স্মৃতি মুছে ফেলেছেন। ইংরেজদের উপস্থিতিতে এমনকি তা যেন ভুলেই যাওয়া হলো এবং আমরা ফিরে গেলাম সেই সময়ে যখন ঐক্যবদ্ধ ভারত ব্রিটিশরাজ ও পাশ্চাত্যের স্পর্ধার বিরুদ্ধে লড়েছিল। পরে ভেবে ভেবে আমার মনে হয়েছে ঐ করতালির ঝড়ের পেছনে মূল অনুভূতিটি ছিল স্বস্তির। হোরেসের যুক্তির উত্তর শ্রোতাদের জানা ছিল না, কিন্তু যে-মনোভাবটাকে আহ্বান করা হয়েছিল সেটি ছিল তাদের জন্য একটি প্রচণ্ড চাপ। তারা আবেগের একটি নিজস্ব স্তরে ফিরে এসে যেন অনেকটা আরাম পেয়েছে। অবশ্যই তাঁর ছোট্ট উত্তরটি প্রমাণ করে যে তিনি গভীর আন্তরিকতার সাথে কথা বলেছেন যা একটি মনোভাবের চাইতে বেশি কিছু।

আমরা জানতে চাইলাম সম্মেলনের সদস্য যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণে আসছেন কী দেখতে চাইবেন। সাথে সাথে আগাথা হ্যারিসন বললেন, এখানে ঢাকায় কলেজগুলোতে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রীতির সাথে পাশাপাশি কাজ করছে যা কিনা ঘটছে বলে তাঁর আমেরিকান ও ইউরোপীয় বন্ধুরা বিশ্বাসই করতেন না। যেহেতু এমনটি বহুদিন ধরেই ঘটছে, মাঝে ছোট কিছু বিরতি ছাড়া, আমাদের কাছে ব্যাপারটি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এটা নিয়ে যখন ভাবতে শুরু করলাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটতে লাগল। শহরের ভেতরেই জনস্রোতের আসা এবং যাওয়া, গত দুবছরের বাসস্থানস্বল্পতা, হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চলগুলোর মধ্যে পুরনো সীমারেখাকে ভেঙে দিয়েছে। এখন হিন্দুদের সংখ্যা আরও কম কিন্তু তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট মুসলমানদের বাড়ি ও দোকানপাটের পাশাপাশিই অবস্থান করছে। মনে হলো আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঘৃণা যেন একটি অলীক মতিভ্রমের মতো ছিল, কেবলমাত্র বিশ্বাস যাকে মুহূর্তের বাস্তবতায় রূপ দিয়েছিল। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, তাঁদের কি আমরা নোয়াখালীর গ্রামে নিয়ে যেতে পারি যেখানে মহাত্মা গান্ধীর কাজের ফলে মুসলিমরা হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণে সাহায্য করেছে এবং হিন্দুদেরকে ফিরে আসতে রাজি করেছে। কেউই সঠিক কোন উত্তর দিলেন না, মনে হয় ব্যাপারটি কারোই জানা ছিলনা। খোরশেদ আমাকে নোয়াখালীর গ্রাম সম্পর্কে যা বলেছিল সেসব কথা মনে করে আমি বললাম, তাঁরা অনেক গ্রামই দেখতে পাবেন যেখানে গান্ধীর কাজ করার কোন প্রয়োজনই হয়নি, কারণ সেখানে কোন সন্ত্রাস ছিল না। কিন্তু তিনি মনে করলেন যে তাতে হবে না ; তাঁরা যা দেখতে চাইছিলেন তা হলো এই প্রমাণ যে মহাত্মার শান্তির বাণী দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করতে পারে।

আমার জার্নালে, আমি জিজ্ঞেস করেছি শান্তিবাদীরা কি একটি মরা ঘোড়াকেই চাবকাচ্ছে যখন জীবন্ত একটি পদাঘাত করার শক্তি নিয়ে বেড়ে উঠছে? যদি এখানে ও ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা কেবলমাত্র কমিউনিজম-এর ভয়ে শেষ হয়ে আসে, তা হলে তা হবে আরও অনতিক্রম্য বাধা। দুটো ধর্ম যে একই সরকারের অধীনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে তা দেখানো যায়। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে একথা বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পরে একথা প্রমাণ হয়েছে সত্য বলে ; এখন এখানে এশিয়াতেও একথা প্রমাণ করতে শুরু করছি আমরা। সমাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রবিরোধীরা, যারা দুজনেই তাদের বিশ্বাস প্রচণ্ড আবেগের সাথে লালন করে তারাও কি তা-ই করে? যদি কোন পথ থেকে থাকে তা খুঁজে আমাদেরকে এখনই অনুদ্ঘাটিত উপায়গুলো খুঁজে বের করতে হবে।

আমার অগ্রাধিকারগুলো, অন্তত নিকট ভবিষ্যতের জন্য ভুল ছিল, পরের পরিচ্ছেদে যে-ব্যাপারে জানাব। কিন্তু ঠিক তখন, আমাদের মনে হয়েছিল যেন আন্তঃসাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল, না ফিরে আসা অতীতের একটি নির্বুদ্ধিতা। আমাদের এমন মনে হয়েছিল এইজন্য নয় যে এর কারণগুলোকে আমরা নির্মূল করেছি অথবা এমন ভাবারও কারণ ছিল না যে আমরা সংঘাতের মনোভাবকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি। বরং এইজন্য যে সে-মুহূর্তে এমন একটি দ্বন্দ্ব আমাদের সামনে ছিল যার কাছে এ-ব্যাপারটি অবান্তর।

এপ্রিলের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় যখন বন্ধ ছিল আমি চারদিন কলকাতায় কাটিয়েছি। উপলক্ষ ছিল একজন বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ মতাদর্শ বিশ্বাস করেন বলে ভারতবর্ষে থেকে যাওয়াকে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ের সাথে শামসুল হুদার বিয়ে। প্লেনের পথে কলকাতা এক ঘণ্টার রাস্তা— আমার প্রথম যাত্রার জন্যে দিনটি ছিল আদর্শ। উড়োজাহাজটি মসৃণভাবে যাচ্ছিল তবু বাতাসের গভীরতা, নৌকার নিচের পানির মতো অনুভব করা যাচ্ছিল— কিন্তু বাতাসের, পানির নয়। বাংলা হচ্ছে ধূসর বাদামী ও সবুজাভ বাদামির টুকরো কাজ, ঘন সবুজ পৃথিবীর ছাপ-ধরা, সেইসাথে পুরো শরীর জুড়ে জড়িয়ে থাকা নদী ও মেটে বাদামির এঁকেবেঁকে যাওয়া নকশা। এমনকি সেই শুকনো মওশুমেও মাটির ওপর থেকে খুব সবুজ দেখা যাচ্ছিল, উজ্জ্বল স্পষ্ট সবুজ, যেন ভেতর থেকে সূর্যরশ্মি ঝিকমিক করছে।

পাকিস্তানের বাইরের বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয়ার টনিকের মতো কাজ করল পরিবর্তনটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যায় আচ্ছন্ন ঢাকা যেন একটি অসংলগ্ন উপন্যাসের ভেতরের অবস্থাটার মতো বোধ করতে লাগল। ব্যাপারটা বাইরের বিশ্বের সাথে সম্পর্কহীন হলেও এর ভেতরে থাকলে অন্য কোন কিছুকেই আর বাস্তব বলে মনে হবে না। সত্য যে আমি ইচ্ছে করলেই বইটা বন্ধ করতে পারি, কেবলমাত্র চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। অন্য কোথাও গিয়ে এই ব্যাপারে আমার আর মাথা না ঘামালেও চলবে, কিন্তু সেই ভাবনা আমায় যেন একটি অশরীরী প্রেতাত্মার মতো জড়িয়ে ছিল, কারণ আমি অন্য যেসব চরিত্রের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিলাম, তাদের জীবনের জন্য ব্যাপারটা ছিল অপরিহার্য। সেই মুহূর্তে ভারত ছিল নিজের জন্যে আরেকটু খোলামেলা। এবারে কলকাতায় আমি ফিরে এলাম কিছু যোগাযোগ করে, যার ফলে এর বহুধাবিশিষ্ট সমাজের একটি স্তরে প্রবেশ করার সুবিধা পেলাম। শহরটাকে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো কথা বলার জন্যে চমৎকার, যেখানে সূর্যের নিচে যে-কোন বিষয়ে উত্তেজিত মতবিনিময় করা চলে। যাঁদের সাথে আলাপ করেছিলাম, তাঁদের ক'জন সরকারি চাকরি করতেন। অনেকে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অন্যরা ছাত্র, অনেকেই সীমান্তের ওপারে তাঁদের বন্ধুদের সাথে এখনও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। কেউ-কেউ এমনকি চাপরাশিদের ধর্মঘটের মতো সর্বশেষ পরিস্থিতির খবরও আমাকে দিয়েছেন, যেন দুই বাংলার ভেতরে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হত। মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে হলো কলকাতা, যে কিনা ছাত্র-অসন্তোষের নিজস্ব যুগে এখনও পা রাখেনি, একধরনের অস্বস্তিকর ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান নিয়ে ঢাকাকে লক্ষ্য করছিল।

১৩ এপ্রিলে, আমার ফেরার সন্ধ্যায় আমি লিখেছিলাম,.... কলকাতায় বেশ কিছুসংখ্যক লোক চাপরাশিদের ধর্মঘট এবং এর ফলাফলের বিষয়ে জানতে আগ্রহী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন ; সংসদের সহ-সভাপতি যার কিনা বেশ ভালো সর্বজনস্বীকৃত একটি ব্যক্তিত্ব ছিল তাকে সহ ছজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে, বাকিদেরকে ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ; এবং অন্যদের যাদের মাঝে ইংরেজি এম এ ক্লাসের না... নামের একজন ছাত্রী ছিল, তাদের কাছ থেকে ফেরার শর্তসহ পনেরো টাকা জরিমানা ও ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করা হয়েছে। এখানে আমি সরকারি মহলে ব্যাপারটিকে অনুমোদনের একটি ধুয়া শুনতে পেলাম। কিন্তু ছাত্ররা অন্যরকম ভাবছিল। এদের একজন, যাকে কোনমতেই আক্রমণাত্মক বলা যাবে না, আমাকে বলল যে, তারা হয়ত ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কার ও জরিমানা ব্যাপারটিকে সহজভাবেই গ্রহণ করত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারটি ছিল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। আর যা হোক, ছাত্ররা তাদের কাজে ফিরে যেতে চাইছিল, এর মধ্যে তারা বসে থাকতে পারে না। হয়ত ১৭ এপ্রিল আবার একটি নতুন ধর্মঘট হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র বাজেট অধিবেশনের সময়টুকুর জন্যেই বন্ধ হয়েছিল। তার ফলে এই তত্ত্বই রং পেল যে, সরকার ছাত্রদেরকে তার কাছ থেকে দূরে রাখাই সুবিধাজনক মনে করে ; দ্বিতীয়ত যারা স্পষ্টভাবে সরকারের সমালোচনা করার জন্যে পরিচিত তারাই শাস্তির জন্যে বাছাই হয়েছে, এই ধর্মঘটের সময়ে তারা তা করুক বা না-ই করুক। খুব ভালোভাবেই বোঝা গেল, গোয়েন্দা বিভাগ আর বিশ্ববিদ্যালয় হাতে দস্তানা পরেই আছে, এবং এতে দু'জনের জন্যেই, কারও শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পেল না।

সুতরাং আসন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্যে কী ফেনিয়ে উঠছে সে-সম্পর্কে অর্ধঅবগত হয়ে আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। বস্তুতপক্ষে চাপরাশিদের ভুলত্রুটি এখন বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে ; পুরো দ্বন্দ্বটাই সীমিত হয়ে এসেছে ছাত্রদের শাস্তির প্রচণ্ডতার ওপর। ছাত্ররা যে দ্বৈত আচরণ দেখেছে তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ; উপাচার্য বাহ্যত অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কাজ করছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে সরকারের সুবিধাই দেখছেন ; সরকার যেন তাঁর নিজের অনুরোধেই তাঁর কর্তৃত্বকে সমর্থন করছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছে সমস্ত ছাত্রকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিতে যখন সংসদ অধিবেশন চলছে এবং বিশেষ করে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে।

আমি নিশ্চিত এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কী ভাবছিলাম। এমন নয় যে তাতে কিছু যায় আসে। খুবই সৌভাগ্যজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী কমিটিতে না থাকায় বা ছাত্র- সংসদের আস্থায় না থাকার ফলে, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আমার কোন দায়িত্ব ছিল না। তাই একটি সমস্যা-নাটকের দর্শকের মতো ভালো-মন্দ দুদিকেই দেখতে ও ভাবতে পারছিলাম।

যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, বহিষ্কারটি ছিল সত্যিই অত্যন্ত কঠোর ও আকস্মিক একটি শাস্তি। এর ফলে একজন মানুষের ভবিষ্যৎ একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। এটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে সরকারের চাপের ব্যাপারে ছাত্রদের সন্দেহের একটি কারণ। তবে, এটাই তারা যেন চাইছিল। যেখানে প্রায় দুবছর ধরে তারা সরকারের ওপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেয়ার প্রচণ্ড চেষ্টা করে আসছে, সেখানে তাদেরকে যদি এখন প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়া হয় কোন্ যুক্তিতেই-বা অভিযোগ করার থাকে?

স্পষ্টতই তাদেরকে তাদের কাজে ফিরিয়ে আনা উচিত, আন্দোলনে তাদের প্রাণশক্তি ব্যয় করতে না দিয়ে, এবং আমি নিশ্চিত, বেশির ভাগই তাদের কাজে ফিরে যেতে চাইছিল। এটা দুঃখের বিষয় যে, একটি সংখ্যালঘু আন্দোলনকারী দল সহজেই শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে, যতটা সহজে না সংখ্যাগুরু শান্তিকামী লোকেরা তাকে রক্ষা করতে পারে। তবু আমি ভালো করে জানতাম যে, যদি আমি একজন ছাত্র হিসেবে গতবারের প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িত থাকতাম, এইভাবে নির্বাচিত নেতাদেরকে নির্যাতনের শিকার করাটা মেনে নিতাম না। নিশ্চয়ই নয়। বিশেষত এমন প্রতিপক্ষ দ্বারা যারা আমার শ্রদ্ধা অর্জনের জন্যে কিছুই করেনি। আমারও মনে হয়েছিল এবং তার পর থেকে মনে হচ্ছেই যে, যে -পক্ষই করুক-না কেন, ক্ষমা চাওয়ার দাবিগুলো অবাধ্যতার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। সবচাইতে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে পরাজয়কে যেন অপমান দ্বারা দাগিয়ে দেয়া।

ছাত্রদাঙ্গার রূপতত্ত্ব অন্য জায়গায় কেমন হয় আমার কোন ধারণা নেই, কিন্তু ভারতবর্ষে এই দাবি যেন প্রলম্বিত হয়েছে বা বিস্তৃত হয়েছে ও উত্তেজিত করেছে অন্য যে- কোন বিক্ষুব্ধ পক্ষের চেয়ে। চাপিয়ে দেয়া ক্ষমাপ্রার্থনা হবে নৈরাশ্যবাদের একটি শিক্ষা যা আত্মমর্যাদার মূল্যে অর্জিত হবে।

সম্মানজনক শান্তির সম্ভাবনা, দুদিক থেকেই খুব ভালো বলে মনে হলো না। আমার এমন আশা না করে উপায় ছিল না যে ছাত্ররা তাদের নেতাদের সাথে লেখাপড়ার স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাদের তা-ই করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচিয়ে রাখতে। ১৫ তারিখে খোরশেদ ফিরে এল, পরদিন ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে জেনে। ও আমাকে জানাল যে, বহিষ্কৃতদের মধ্যে তিনজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল অ্যাকশন কমিটির, যারা চাপরাশিদের ধর্মঘট সংগঠিত করেছিল এবং নিশ্চিত যে তাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে আবার একটি ধর্মঘট হবে। ও নিজেও মনে করছে, বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং গতস্য শোচনা নাস্তি—ভেবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া উচিত এখন (এই মতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত নই)— কিন্তু বৃত্তি হারানোর ভয়ে ওকে ওর ক্লাসে ফিরে যেতেই হবে, বৃত্তি হারানো ওর পক্ষে অসম্ভব। আমি ভাবছিলাম, কতজন ওর মতো অবস্থায় ছিল। গ্রামের অবস্থার কথা ভেবে ও খুব বিমর্ষ ছিল, কারণ অসময়ের প্রবল বর্ষণ সমস্ত বীজধান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আর লোকের হাতে আবার কেনার মতো টাকা নেই। এ-বছরের ফসলের জন্য ওদেরকে ধার করতে হবে।

সেই বিকেলে উপাচার্য অবস্থার বর্ণনা দেয়ার জন্যে সমস্ত শিক্ষককে ডেকে পাঠালেন। তিনি স্পষ্ট করে জানালেন (যদিও মূল কারণটা অত স্পষ্ট হলো না), যে, নির্বাহী পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া ঠিক করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপর কী করা হবে। ছাত্রদের একটি অংশ তেমন প্রয়োজন হলে, জোর করে ক্লাস বন্ধ করতে চাইছিল, অপর একটি তেমন প্রয়োজনে জোর করে খোলা রাখতে চাইছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আবার কাজে ফিরে যেতে পারলে খুশি হত কিন্তু কোন দ্বন্দ্বে যেতে চাইছিল না। আমরা কি ফটক খোলা রাখার জন্যে পুলিশ ডাকব?

শেষে আমরা ঠিক করলাম, শুরু করে দেয়া যাক, কাজ চলুক। ছাত্রদের রাজি করাতে যে-কোন প্রভাব খাটানো হবে স্থির হলো। কোন সমস্যা হলে, ক'দিনের মধ্যেই আবার বসব। যদি এরই মধ্যে বোঝা যায় যে, ছোট একটি দল অন্যদের কাজ করতে বাধা দিচ্ছে, তা হলে পুলিশ ডাকা যেতে পারে। যদি ছাত্রদের মূল অংশই বিদ্রোহ করতে চায়, তা হলে কেউই জানি না কী করব। কেউই শাস্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি করার কথা বলতে সাহস পেল না। এমন সময়ে তা যেন দেখাবে হুমকির কাছে নত হওয়ার মতো।

১৬ তারিখে সবই খুব শান্ত ছিল। সতেরোতে একটি ধর্মঘটের হুমকি থাকায় অনেক ছাত্র তার পরদিন পর্যন্ত বুদ্ধি করে দূরে রইল। আমি দেখলাম ইংরেজি বিভাগের তরুণ প্রভাষকরা সবাই বহিষ্কারের ঘটনায় ক্ষুব্ধ। বয়স্করা অতটা নন, কিন্তু সবাই একমত যে সম্ভব হলে ক্লাস চালানো উচিত। আমি তাঁদের বললাম, আমার ফ্ল্যাটে তাঁদের স্বাগত জানাব যদি ধর্মঘটিরা লেকচার রুম বন্ধ করে দেয়। সেইদিনই পরে, একজন স্পষ্টবাদী তরুণ, প্রথম বর্ষ সম্মানের, পড়াশোনার ব্যাপারে কিছু উপদেশ চাইতে এল।

কাজ করতে খুবই আগ্রহী ছিল, মনে হলো, কিন্তু আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ। সে জানাল, সাতাশ জনকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, যাদের ভেতরে এমন ক'জন আছে যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিল। আসলে তারা সবাই বহিষ্কৃত হয়েছে, কারণ তাদেরকে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না এমন প্রতিশ্রুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে বলা হয়েছে, যা ওর মতে অসম্ভব। ছাত্রটি উপাচার্য ও নির্বাহী পরিষদকে সরকারের চাপের কাছে নত হওয়ার জন্যে অভিযুক্ত করল। আমি ওর সাথে ছাত্রদের কৌশল একেবারে হতাশাব্যঞ্জক বলে তর্ক করলাম এবং বললাম, আগামী কবছরে তাদেরকে এমন নিষ্ফল কৌশলের বদলে ফলপ্রসূ কৌশল নিতে হবে। সে বলল, তাত্ত্বিক দিক থেকে আমি সঠিক, কিন্তু বাস্তবে কিছু না করে বসে থাকা যায় না। তবে ও ধর্মঘটি পিকেটারদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে আমার বাড়ি এসে ক্লাস করার ধারণাটা সমর্থন করল।

আমার মনে হলো, আন্তরিকভাবে কাজ করার ইচ্ছা এবং ন্যায়বিচারের অভাবে বিক্ষুব্ধ মনের অবস্থা বেশির ভাগের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। সেই সন্ধ্যায় সচিবালয়ের এক তরুণ ইংরেজের সাথে একটি দ্রুতপায়ে ভ্রমণ যেন বাতাসে একটি সতেজ পরিবর্তন নিয়ে এল। অবশ্যম্ভাবীভাবেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং এটা দেখে কৌতূহল হলো যে তিনিও, তাঁর মন্ত্রণালয়ের মতামত অনুসারে ভাবছিলেন যে, এটা কোন অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয় বরং বাঙালি ছাত্র ও করাচির সরকারের মধ্যে একটি বিরোধ।

আমার দেখা বেশির ভাগ সরকারি কর্মচারীদের মতো, তিনিও মনে হলো বাঙালিদের অপছন্দ করেন এবং তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে হীনতম ধারণা পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, পাঞ্জাবিরা প্রশ্নাতীতভাবে যোগ্যতর এবং এখানে পাঞ্জাবি কর্মকর্তা থাকা খুবই জরুরি। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশ্ব এখানে আছে। একটিকে পাওয়া যাবে ক্লাবে ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেশির ভাগ ইউরোপীয়ান, আরেকটি ছাত্র ও তরুণ প্রভাষকদের মধ্যে। যথেষ্ট ভালো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সবসময়ে বলছে বাঙালিদের প্রশাসন-ক্ষমতা চরিত্রগতভাবেই নেই। সেটা মেনে নিলেও কিন্তু শাসিত জনগণ সম্পর্কে গভীরে প্রোথিত তোমার অপছন্দ কি তোমার সেই চাকরির জন্যে একটি অযোগ্যতা নয়? যখন আমি এ-বিষয়ে ভাবি, তখন মনে হয় কেবল বাংলায় কর্মরত পাঞ্জাবিদের মধ্যেই এই সংকীর্ণতা নেই, বহুস্থানে ব্রিটিশরাজের অধীনে কর্মরত বহু ইংরেজেরও এই সংকীর্ণতা আছে।

পরের পক্ষকালটি ছিল ক্রোধ, উদ্বেগ, হাস্যরস ও গীতিনাট্যের একটি সমন্বয়। তবে গীতিনাটকটিই ছিল জীবনের সত্য। ধর্মঘট শুরু হলো, প্রধান সব লেকচার কক্ষ যেখানে ছিল, সেই লাইব্রেরি-ভবনের সামনে যথারীতি পিকেটিং হলো। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেল, প্রথম শিফটে 'না... ' নামের ইংরেজি বিভাগের একজন ছাত্রী ছিল, যে ইতোমধ্যেই কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে। ওর সাথে বাদানুবাদ আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। তাই বেশ আগ্রহী শ্রোতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি তাকে জানালাম যে, যদি এই কাজের লক্ষ্য হয় শান্তির মাত্রা হ্রাস করা, তবে ক্লাসরুমে বাধা দেয়ার কাজটি অবশ্যই একটি বাজে কৌশল। সে যুক্তিটিকে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করল না। ও জানাল যে ওদেরকে এভাবেই এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে হবে : কারণ একটি গণআন্দোলনকে একটি ফ্যাসিস্ট সরকার ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর। ওর দূরদৃষ্টি হয়ত আসন্ন কোনকিছুর আভাস পেয়েছিল, কিন্তু আমি পাইনি। এবং যেহেতু ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল গণআন্দোলন যেন নিশ্চিহ্ন হতেই বদ্ধপরিকর ছিল, অভিযুক্ত সরকার তা করুক বা না-করুক।

আমি আমার প্রথম বর্ষের ক্লাসে গেলাম, কিন্তু সেখানে কেবল বি.... উপস্থিত ছিল যে অধ্যবসায়ের সাথে বাধা দিচ্ছিল। কিছুতেই ও ওর পদ ছাড়তে চাইল না, তবে গতকালের প্রস্তাব গ্রহণ করে আমার ফ্ল্যাটে সন্ধ্যায় আসবে বলে জানাল। ছেলেদেরকে দল বেঁধে বেঁধে তর্ক করতে দেখা যাচ্ছিল, মাঝেমাঝেই মেজাজ চড়ে গিয়ে ঝগড়ার রূপ নিচ্ছে। একজন অধ্যাপক কোনভাবে এমন একটি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী একজন জানালেন যে, ইংরেজি বিভাগের একজন প্রভাষক তাঁকে উদ্ধার করতে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে মধ্যস্থতা করেন।

আমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলাটা খুব ভালো বটে। আমার ভেতরে একটি শয়তান আছে যে কর্মপদ্ধতি নিয়ে এমনভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসে যেন সে ব্যাপারটা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যেন সেগুলো জ্যামিতির সমস্যা এবং তখন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। সে আমাকে জানাল এখানে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ক্লাসে ঢোকার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে, কেবলমাত্র দুজনেরই আত্মসম্মান বজায় রেখে তা করার একটি ফর্মুলার অভাব তাদেরকে বিরত রাখছে। পরীক্ষামূলক একটা-কিছু করার জন্যে আমি বসে গেলাম এবং আপোসমূলক একটি বিবৃতির খসড়া তৈরি করলাম, যা কিনা বেশির ভাগ শিক্ষকের মনোভাব প্রকাশ করে— এই মর্মে যে, ছাত্রদের নির্বাচিত নেতাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সেই লক্ষ্যে ধর্মঘটের ফলপ্রসূতাকে প্রশ্ন করি যে, যদি তারা কাজে ফিরে আসে, আমরা সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করব নির্বাহী কমিটি যাতে তাদের এই সদিচ্ছার উত্তরে শাস্তি মওকুফ করেন। আমার মনে হলো, এটা ভালোই শোনাল, কিন্তু মিস বোস, যাঁর মতামত বিরল কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়, সাধুভাবেই আমাকে সতর্ক করে দিলেন যেন এমন প্রস্তাব না করি যে-প্রস্তাব কার্যকর করা যাবে না। তাই আমি সেটা নিয়ে উপাচার্যের কাছে গেলাম ব্যক্তিগতভাবে ও অনানুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করতে যে, যদি এখানে প্রচুর স্বাক্ষর পাওয়া যায় এবং তাতে কাজে ফিরে আসার মতো ফল পাওয়া যায়, তবে কী শাস্তি লঘু করার সুযোগ সত্যিই থাকবে কি-না। তিনি মনে করেন, তা থাকবে। তবে সবসময়েই ভবিষ্যতে ভালো ব্যবহারের অত্যাবশ্যকীয় শর্তসাপেক্ষে। কিন্তু তিনি চাইলেন, আমি যেন বিবৃতিটি ২/১ দিন রেখে দিই, এই আশায় যে, ছেলেরা নিজের ইচ্ছাতেই কাজে ফিরে আসবে। স্পষ্টতই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে নম্রতা প্রদর্শনের চেয়ে ছাত্রদের আত্মসমর্পণ করাকেই বেশি পছন্দ করছিলেন।

একেবারেই হতাশ না হয়ে শিক্ষকদের আমি বাজিয়ে দেখতে লাগলাম, যে, প্রকাশের যথাসময় এলে কতজন এই দলিলটিকে সমর্থন করতে পারেন। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বিভাগ ও অন্য বিভাগের কয়েকজন বেশ জোরের সাথে এটা সমর্থন করলেন : অন্য বিভাগগুলোতে, জ্যেষ্ঠ প্রভাষকরা নীতিগতভাবে অনুমোদন করলেও এখনই কোন কথা দিতে রাজি হলেন না। একজন পাঞ্জাবি অধ্যাপক, যিনি নির্বাহী কমিটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, জোর দিয়ে বললেন, এ-ধরনের ব্যাপার দুর্বলতার পরিচয় বলে চিহ্নিত হবে। তখন একজন অচেনা—মনে হয় খুবই তরুণ কোন প্রভাষক, শিক্ষায়তনিক নয়, বরং রাজনৈতিক উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রস্তাবিত বিবৃতির একটি আগাম নোটিস বাংলা ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এলেন, আকর্ষণীয় ভাষায়, যার অর্থ দাঁড়াল— শিক্ষকদের একটি বড় অংশ ছাত্রদের পক্ষে। মুহূর্তের মধ্যে সম্ভাব্য জলপাই শাখার বদলে যেন নির্বাহী কমিটির দিকে একটি ঢিল ছুড়ে দেয়া হলো। উপাচার্য আমাকে ডেকে পাঠালেন ও তিন-চারজন বিভাগীয় প্রধানের সামনে আমাকে তিরস্কার করলেন (প্রথমে যাঁরা কেউ-কেউ আমায় সতর্কভাবে উৎসাহ দিচ্ছিলেন), যাঁরা তাঁর সাথে যোগ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন আমি কী ভুল করেছি এবং ছাত্র-মনস্তত্ত্বে বোধগম্য জ্ঞানের অভাবের কারণ দেখিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে শিক্ষক-মনস্তত্ত্বও অনেকটা শিখতে হবে ; কিন্তু তবু এটাও মনে রাখা দরকার যে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আসলে কোন মনস্তত্ত্বই থাকে না, কেবলমাত্র আওয়াজই তাদের কাজের ব্যাখ্যা করে। যাই হোক, আমি কূটনীতিটা আমার চেয়ে উত্তম ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্যে ছেড়ে দিতে শিখলাম।

এসবই ছিল তিন-চারদিনের ভেতরে ঘটে-যাওয়া সামান্য কিছু ঘটনা, এবং যা-ই হোক না কেন, ঘটনাগুলো আমার উজ্জ্বল ভাবনাকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। সতেরো তারিখ সকালে উপাচার্যের বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রদের বিশাল এক জনতাকে চিৎকার করতে শোনা গেল, কিন্তু তিনি উপরের একটি ঘরে বসে রইলেন, নেমে আসতে রাজি হলেন না। আমি সেখানে একটি নিয়মিত মিটিঙে উপস্থিত হতে এসেছিলাম (যে-মিটিংটা শেষ পর্যন্ত হয়নি) এবং যেহেতু আমার মাথার ওপরে এমনকি একটি মেঘের ছায়াও ছিল না, আমাকে ভেতরে ডেকে নেয়া হলো তাঁদের সাথে যোগ দিতে, যেখানে প্রক্টর, ফ্যাকাল্টিগুলোর ডীনরা, নির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যরা একটি অনানুষ্ঠানিক গোপন সভায় বসেছেন।

মনে হলো, জনতার দল এসেছে ঢাকার অন্যান্য কলেজ থেকে এবং তারা এখানে উপস্থিত কারও সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নয়। উপাচার্য তাদের দুজন প্রতিনিধিকে ভেতরে পাঠাতে বলেছেন কিন্তু তারা বারবার বলছে তাঁকে তাদের সবার সাথে কথা বলতে হবে। নিচতলার ঘর থেকে ওরা নিজেরাই চেয়ার ও গদি নিয়ে গেছে এবং ওঁর জিনিসপত্র নিয়ে সহজেই ব্যবহার করছে। ওরা মনে হয় বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে। কারণ বাতি বা পাখা কোনটাই কাজ করছে না। যদি উনি শান্তি প্রত্যাহার না করেন, তা হলে ওরা ওঁর বাগানের ভেতরে বসেই অনশন ধর্মঘট করবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। কেউ মোমবাতি নিয়ে এলো, আমরা যখন পরামর্শ করছিলাম, আমাদের মুখের ওপর তার সূক্ষ্ম ছোট শিখাগুলো জ্বলতে লাগল সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর্মাক্ত এপ্রিলের রাতে। আমরা কি পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাইব? আমি কী ভাবছি, জিজ্ঞাসা করা হলে বললাম, সেটা হয়ত নৈতিক প্রাধান্য হারানোর লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে। আমরা কি প্রয়োজন হলে সারারাত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারি না? জনতাকে আগ্রাসী মনে হচ্ছে না, আর তাই, যদি আমরা মনে করি দর্শক হিসেবে আমাদের উপস্থিতি সম্ভবত তাদের শান্ত রাখবে। উপাচার্য ও প্রক্টর মনে করেন আমার বক্তব্য অর্থবহ কিন্তু অন্যেরা সন্দেহ প্রকাশ করলেন অবরোধকারীরা রাতে আমাদেরকে ইচ্ছেমতো যাওয়া আসা করতে দেবে কি-না। আর তারা যদি সকাল পর্যন্ত থাকার প্রস্তুতি নিয়ে না আসে, অন্ধকার ও উত্তেজনা তা হলে এটাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। শেষ পর্যন্ত ? আমরা পত্রিকার জন্যে একটি বিবৃতি তৈরি করলাম, এবং উপাচার্য ছ'জন সশস্ত্র পুলিশ চেয়ে পাঠালেন কিন্তু এখন ব্যবহার করা হবে না এমন আদেশসহ। ইতিমধ্যে বাতি ও পাখা চলতে শুরু করল, চা ও হালকা নাশতা এল। দুটো থেকে যাঁরা আটকে আছেন, তাঁদের অনেকেই স্বস্তি পেলেন এবং আমরা সবাই দল বেঁধে চলে এলাম।

প্রায় দৃশ্যমান ছাত্ররা দ্বিধান্বিত মনে আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়াল, যেতে দেবে কি-না। অর্থনীতির অধ্যাপক, একজন নম্র ও বিনয়ী দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার সাথে তাদের সাথে আলোচনা করতে লাগলেন, যখন কণ্ঠস্বরগুলো বলতে লাগল যে উপাচার্য তাদের পিতার মতো এবং তাদের ঢুকতে দেয়া উচিত। তারা নিজেদের বিদ্রোহী বলে মনে করছে না বরং গভীরভাবে আহত সন্তান বলে মনে করছে। ডানদিক থেকে একটি কণ্ঠ আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, অবশ্যই তারা কাজে ফিরে যেতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী, অবশ্যই তারা শিক্ষকদের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের আস্থা ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছে। এ-ধরনের চাপ ছাড়া আর কী নিশ্চয়তাই-বা তারা পেয়েছে যে, তাদের ভুলগুলোকে ক্ষমা করা হবে? প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত ক্ষোভ সেই অনিশ্চিত অন্ধকারে এই সুবক্তাটির অনর্গল বাক্-পটুতায় বর্ষিত হতে লাগল। এই সবকিছুর অর্থ দাঁড়াল এই যে, যদিও শান্তিই হচ্ছে তাৎক্ষণিক বিষয় কিন্তু এর পেছনে এই বিশ্বাস কাজ করছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী চরম পর্যায়ে যাবার পেছনে সরকারের উস্কানি ছিল এবং এই কারণে ভবিষ্যতে গণকর্মসূচি থেকে তাদের বিরত রাখা যাবে না। কে জানে ভবিষ্যৎ কী নিয়ে আসবে?

পরদিন কলা অনুষদের সভায় আমরা জানতে পারলাম যে, বাড়িটি তখনও ঘেরাও হয়ে আছে এবং সম্ভাব্য অনশনকারীরা সকালের চা চেয়েছে। কিন্তু পরে বাড়িটির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আমি পুলিশ প্রহরার জোর দেখে চমকে উঠেছিলাম। দুটো লরি রাখা হয়েছে, ছোট ছোট দলে অনেক পুলিশ, সবাই সশস্ত্র অবস্থায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যে-কেউ বলতে পারবে, উদ্দেশ্য যতটা না রক্ষা করা, তার চাইতে বেশি ভয় দেখানো। পরদিন কিছুসংখ্যক ছাত্র ফিরে এল, যারা ধর্মঘট হোক বা না-হোক কাজে ফিরতে চায়। বাধা পেয়ে তাদের শক্তি দ্বিগুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো এবং কেবল একটি প্রাথমিক আঘাতের অপেক্ষা ছিল দ্বন্দ্ব বেধে যাবার জন্যে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের করণীয় ছিল মেজাজ ঠিক রাখা এবং কেউ পড়তে এলে পড়ানো। আমি আমার প্রথম বর্ষ রচনাক্লাসে যেতে গিয়ে দেখি ভবনের সামনে জনতার ভিড়ে জনযট লেগে গেছে প্রবেশপথে ; কিন্তু চারজন ছাত্র, যাদের দুজন অসমীয় খ্রিস্টান, ঝগড়ায় না জড়িয়ে কোনক্রমে অন্যপাশে এসে জিজ্ঞেস করল, প্রফেসর, তুমি কি ক্লাস নিতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, যদি ক্লাস করো।'

ভিড়ের ভিতরে কোনক্রমে, কাউকে পদদলিত না করে আমি ক্লাসে এলাম। জানালা দিয়ে ভেসে-আসা মেঘ-গর্জনের মতো জনসভার শব্দের মধ্যে দার্শনিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে বসে আমরা ছাত্র-রাজনীতির ভালো ও মন্দের বিমূর্ত দিক নিয়ে পত্রিকার জন্যে কথিকা তৈরি করতে লাগলাম।

কিন্তু পরদিন বাধাদানকারী কেউ ছিল না! একটি গুজব চারপাশে ছড়িয়ে গিয়েছিল, পরে যা পত্রিকার ঘোষণাতেও নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, পুলিশ যে-কোন বাধাদানকারীকে তাড়িয়ে দেবে। কাজে ফেরার একটি প্রক্রিয়া শুরু হলো। কিন্তু সেদিন বিকেলে আমি যখন সম্ভাব্য গোলমাল থেকে দূরে আমার অফিসে মেয়েদের একটি ছোট্ট দলের ক্লাশ নিচ্ছিলাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম ছ'জন সশস্ত্র পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভেতরে ঢুকল ও লাইব্রেরি-ভবনের বাইরে স্থায়ী আসন গাড়ল।

জার্নাল, এপ্রিলের ২০শে: বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে পাহারাদার : ছাত্ররা করিডোরে দাঁড়িয়ে..... কিন্ত কাজ খুব একটা হলো না। বিকেলে একটি মিছিল হলো, বেশির ভাগই জগন্নাথ কলেজ থেকে আসা, অনেক স্লোগানের শব্দ আমার অফিসঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল। মিছিলটি ঢাকা হল থেকে খেলার মাঠে আসার চেষ্টা করছিল যাতে সেখানে একটি মিটিং করতে পারে কিন্তু তখনই পুলিশ বাধা দিল। টিয়ার গ্যাস ছোড়া হলো এবং লাঠি চার্জ হলো, শুনতে পেলাম পাঁচজন ছাত্র আহত হয়েছিল যাদের মধ্যে একজন গুরুতর। ব্যাপারটা ঘটেছিল দুটো চল্লিশের দিকে যখন আমি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভায় যাচ্ছিলাম।

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এর সাধারণ কাজগুলো করল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দ্রুততার সাথে ধর্মঘটের কোন উল্লেখ না করে।... ঘটনাচক্রে, যদিও আমি এই বিষয়গুলো এইসব ছবি সাজাতে জমিয়েছিলাম। উপাচার্য তাঁর বাড়ি পাহারা দিতে পুলিশকে ডেকেছিলেন কিন্তু ছাত্রদের সরানোর চেষ্টা করতে বলেননি। তবে সরকার তা পুলিশের সম্মানের জন্যে হানিকর মনে করল বিশেষ করে যতই ছাত্ররা ওদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতে লাগল ও তাদেরকে জয় করে ফেলল। পুলিশপ্রধান ছাত্রদের সাথে তর্ক করার চেষ্টা করলেন এবং তাদেরকে সেই জায়গাটা ছেড়ে যেতে বললেন, ওদেরকে চিন্তা করার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় দিলেন, পরে আরও পাঁচ মিনিট, শেষে ওদেরকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাত জন প্রতিরোধকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রেফতার হলো যাদের মধ্যে একজন বাদে বাকিরা সবাই অন্য কলেজ থেকে আসা (কলাভবন থেকে আসা)। ছাত্ররাও, যারা কাজ করতে চাইছিল তারা সবসময়েই জোর করছিল যেন ক্লাস খোলা রাখা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি তা করতে না পারে তবে তারা নিজেরাই নিজেদের পাহারাদার নিয়ে আসবে। ওদের পদ্ধতিটি ছিল শ'খানেকের মতো গুণ্ডা (ভাড়াটে হাঙ্গামাকারী) নিয়ে আসা, যাদেরকে অনেক কষ্টে গেটের কাছে ধেয়ে আসা থেকে নিরস্ত করা গেছে সব মিলিয়ে পুলিশি ব্যবস্থা ছাড়া আর কীভাবে তা করা যেত ভেবে পাই না।

এই সমস্ত ঘটনাবলীর ভেতরে ছাত্ররা সন্ধেবলায় আমার ফ্ল্যাটে আসত, আমার বিশ্বাস আরও অনেক শিক্ষকের বাসায় যেত যাদের সাথে তাদের সহজ সম্পর্ক ছিল এবং এমন সব বিষয়ে কথা বলত যেসব বিষয় ছিল গণউত্তেজনার ধোঁয়াটে আবহাওয়া থেকে দূরে। এরা কোন দলেরই কোন যুদ্ধংদেহী চরমপন্থী নয়, হয়ত এমন ক'জন সেখানে ছিল, কিন্তু না..... ছাড়া আমি তেমন আর কারও দেখাও পাইনি, নামও শুনিনি । যারা আসত তারা ছাত্র হিসেবে সিরিয়াস, অনার্স বা এমএ ডিগ্রির জন্যে পড়ছে, তারা বিশ্ববিদ্যলয়কে এমন একটি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দেখছে যা তাদের জন্যও ভালো নয়, আমাদের জন্যেও নয়। এটি একটি অশুভ সমস্যা যার একটি লক্ষণ এই বর্তমান ইস্যুটি। তারা হয়ত নিজেদের কাজেই ব্যস্ত থাকত, কিন্তু তারা সবাই ভাবছে শাস্তিটা স্বেচ্ছাচারী ও চরম এবং প্রতিবাদটি না করলেই নয়। কখনও কখনও আমি এমন ভেবেছি যে, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বই হচ্ছে বিদ্যার প্রসার ও মানোন্নয়নের জন্যে, তাই যারা এটাকে বন্ধ করে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া অসম্ভব নয়। যদি অন্যায় না-ও হয়, তা হলেও বোঝার মতো অবিবেচনাপ্রসূত ছিল কাজটি যে-কেউ একথা মানবে। সবচাইতে বেশি যেটা তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তা হলো অভ্যন্তরীণ বিরোধ। গত বছর ভাষা-ধর্মঘটের সময়ে ছাত্র ও পুলিশ মুখোমুখি ছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নিজে একতাবদ্ধ ছিল। যখন পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ভেতরে প্রবেশ করে একজন ছাত্রকে গ্রেফতার করার জন্যে, সবার মতো বর্তমান উপাচার্যও খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ক্ষোভ ছড়িয়ে যাওয়া এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ ডাকা আরও খারাপ হলো। একজন চিন্তাশীল তরুণ, যে কিনা উপাচার্যের বাগান দখলকারী ছাত্রদের সরানোর দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তার সন্তান, আমাকে বলল, তারাই এ-পর্যন্ত যা দেখেছে তার মধ্যে এটা কদর্যতম পরিস্থিতি। এমন নয় যে পুলিশ বর্বরের মতো আচরণ করেছে, বস্তুত সবসময়েই তারা খুব ধৈর্যের সাথে আচরণ করেছে, কিন্তু তারা যদি খারাপ ব্যবহার না-ও করে, সাম্রাজ্যবাদের লাঠির মুখোমুখি হওয়া স্বীকৃত ছাত্র ঐতিহ্যের জন্যে একটি পেশাগত ঝুঁকি । বিক্ষোভটা ছিল, তারা যেমন দেখছিল, দুই কর্তৃত্বের ষড়যন্ত্রের গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে।

কেউ হয়ত বলবেন, ছাত্ররা এমনটি চেয়েছিল। তারা কি আশা করেছিল যে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এমন চরম দ্বন্দ্বে সম্মতি দেবেন, তাঁর নিজের বাড়ি ঘেরাওয়ের কথা বাদই দিলাম (তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ভেতরে রেখে), যখন একদল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিশ্চিত মেজাজের জনতা বাগান তছনছ করল, আসবাবপত্র নষ্ট করল! যেমন আমি আমার জার্নালে লিখেছি, আমি ভেবেছিলাম আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছি যখন পুলিশের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এটা সময়োচিত সেই প্রশ্নটিকে যেন পাশ কাটিয়ে গেল, আমরা কীভাবে সেই অবস্থায় পৌঁছুলাম? এটা শুরু হয়েছিল মার্চের অচলাবস্থা থেকে, এমন একটি সময়ে যখন চাপরাশি ও ছাত্ররা কাজে ফিরে আসতে প্রস্তুত ছিল এবং তখনই ছাত্রনেতারা শাস্তির শিকার হলো। আমার ফ্ল্যাটে যেসব ছাত্র আসত এবং আলোচনা করত তারা ব্যাপারটিকে কেবলমাত্র বিদ্বেষপূর্ণতার বলিকরণ হিসেবেই দেখতে পাচ্ছিল। তারা কেউ খুব জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ছিল না, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সরল বা বোকাও ছিল না, তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাঘাতে তারা যতই বিরক্ত হোক, তারা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করত না যে চাপরাশিদের ধর্মঘটের এবং ছাত্রসংসদের তাদেরকে সমর্থনের পেছনে কোন অশুভ রাজনৈতিক চক্রান্ত ছিল যা কিনা এই কঠোর পদক্ষেপকে যৌক্তিক করে তোলে।

সরকার হয়ত তা-ই বিশ্বাস করত বা করতে পছন্দ করত। পূর্ববঙ্গীয়দের এমন বিশ্বাস করার পেছনে কোন চক্রান্তের প্রয়োজন ছিল না যে, তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও বৈষয়িক স্বার্থের কোন স্থানই ছিল না পাকিস্তানের ধারণার ভেতরে ; তারা সমস্ত কাঠামোটার ভেতরেই ব্যাপারটাকে অনুভব করত ক্ষুব্ধ মোহমুক্তির ভেতর দিয়ে—যা কিনা প্রতিটি দুঃখ বা ক্ষোভকে ফুটন্ত বড় কড়াইতে ছুড়ে দিত। কিন্তু পাঞ্জাব-প্রভাবিত সরকার সেটা বুঝতে পারেনি এবং নিজেকে তারা একেবারেই ত্রুটিহীন ভাবত, এবং ভাবত পবিত্র ধর্ম যুদ্ধের তেজস্বিতা নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে অশুভ শক্তিকে, যা কেবলই ভারতীয় বা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র বলে তারা চিহ্নিত করত। স্বাভাবিকভাবে এরা এখানেও ষড়যন্ত্র দেখতে পেয়েছিল।

ছাত্র আন্দোলনের মতোই এই আন্দোলনটাও স্তিমিত হয়ে গেল কিন্ত ২৫ এপ্রিলের একদিনের ধর্মঘটের আগে নয়, যখন জানা গেল এদের সাথে জনসমর্থন কতটা আছে। 'শান্তি কমাও' হয়ে উঠল একটি জনপ্রিয় দাবি। সম্ভবত সেইদিন শহরের যেসব লোক দোকানপাট বন্ধ রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কমসংখ্যকই জানতেন শান্তিটা কী অথবা অপরাধই বা কী, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যেভাবেই হোক তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

স্বাভাবিক, নিয়মভঙ্গকারী মিছিল হচ্ছিল, ভেঙে দেয়ার জন্যে লাঠিচার্জও হচ্ছিল, পরে যথারীতি গ্রেফতার—তাদের মধ্যে দুঃখজনকভাবে—যদিও বিস্ময়করভাবে নয়, আমার বন্ধু 'বি'ও ছিল। গ্রেফতার হওয়ার জন্যে এটা খুবই অসুবিধাজনক সময় কারণ জেলের শাস্তি প্রথম বর্ষের পরীক্ষার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু উপাচার্য জেলের ভেতরে প্রশ্নপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন যাতে ছাত্রদের একটি বছর বসে থাকতে না হয়। 'বি' কলেজে ফিরে এল অনুতাপহীন এবং আমাকে জানাল জেলজীবন অত খারাপ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না'-এর অভিজ্ঞতা ছিল আরও বর্ণিল এবং তা একটি পুনশ্চ দিয়ে লেখার যোগ্য। সেই বাদানুবাদটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তার সাথে আমার বহু বছরের মধ্যে শেষ সংলাপ। সে ছিল খুবই একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট, সুদর্শনা, আবেগপ্রবণ বাগ্মী এবং কখনও ভয় কাকে বলে জানত না, আর পুলিশ তাই তাকে ভেবেছে খুবই মারাত্মক। ধর্মঘটের পর সে 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' গিয়ে মাসখানেকের মতো গ্রেফতার এড়িয়ে ছিল, কখনও এক জায়গায় দু'রাত ঘুমায়নি এবং খুব জনপ্রিয় একটি কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। এমন গল্প আছে যে, এক অন্ধকার রাতে ও ওর কিছু বন্ধুর সাথে ছিল, যখন পুলিশ চারদিক থেকে বাড়িটি ঘিরে ফেলল। 'না' শৌচাগারে পালাতে গেল, কিন্তু পুলিশ তাকে অনুসরণ করল। ও জানালা বেয়ে উঠে গেল, পুলিশটি পেছন পেছন, তারপর সমতল ছাদ পেরিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশটি পিছু নিল, শাড়ির প্রান্ত ধরে ফেলল। ও সেটি ছেড়ে ফেলে চলে গেল, পুলিশটির হাতে ট্রফির মতো রয়ে গেল শাড়িটি। দেয়াল বেয়ে মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে ঢুকে গেল ও, সেখানে ওর কিছু বন্ধু ছিল, তারপর নার্সের ছদ্মবেশে সেখানে কিছুদিন পালিয়ে রইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও ধরা পড়ল এবং ওর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে, 'বিচারাধীন বন্দি' হিসেবে আটক হয়ে রইল। সেখানে ও দু'বছর থাকল। শ্রুতি আছে যে একজন সশস্ত্র কারারক্ষীকে আঘাত করার জন্যে এক মাস সাধারণ অপরাধী হিসেবে নির্জন কারাবাসসহ অন্য মহিলা কয়েদিদেরকে পড়িয়ে কাটিয়েছে। এতে ওর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহ জেগে উঠল এবং একজন কারা-দর্শনার্থী আমাকে জানাল যে 'না' এমএ পরীক্ষা দেয়ার জন্যে তৈরি হতে চায়, আমি কি তাকে দেখতে যাওয়ার জন্যে ছুটি নেয়ার চেষ্টা করব এবং তার পড়াশুনোর পরিকল্পনা করতে সাহায্য করব? খুশি হয়েই আমি সেটা করব। একটি ডিগ্রি নিয়ে ও হয়ত কলেজের প্রভাষক হয়ে যেতে পারে ; আর তা না হলে ও হয়ত একজন প্রথম শ্রেণীর আন্দোলনকারী হবে, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও আমার মনে হলো ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটা হবে একটি ভুল। কিন্তু স্পষ্টতই সরকার অন্যরকম ভেবেছে অথবা আমাকেই খুব সন্দেহজনক কোন প্রভাবক মনে করেছে, কারণ সাক্ষাৎকারের অনুমতিটিই পাওয়া গেল না।

রাজনৈতিক চাকার একটি ঘূর্ণনে 'না'র মুক্তির আগেই আমি ঢাকা ছেড়েছিলাম। সে এম এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগের তালিকার সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার জন্যে এগিয়ে গেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হয়ে গেল। আমি যখন ফিরে এলাম সেখানে তার সাথে আমার দেখা হলো, প্রায় দুবছর পরে একজন বহিস্থ পরীক্ষক হিসেবে, কিন্তু ততদিনে ও বিবাহিত ও সন্তানের জননী এবং মনে হলো রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে।

যেভাবে ঘটতে দেখেছি সেভাবেই আমি এইসব গোলযোগপূর্ণ ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করেছি, একটি কুৎসিত ঘটনা হিসেবে, বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত, লক্ষণ হিসেবে, নিমিত্তবাচক ঘটনার চেয়ে, পূর্ব ও পশ্চিমের ভেতরে ঘনিয়ে ওঠা সংঘর্ষের ফসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে। সেখানে বিরোধের কারণ ছিল ; এই অগ্নিশিখা তারা ১৯৪৯ সালে জ্বালিয়েছিল এবং এভাবেই তা জ্বলে উঠেছে আর ছড়িয়ে পড়েছে। কুশলী হাতে হয়ত এটাকে নেভানো যেত, কিন্তু আধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছা এবং তা প্রতিরোধের ইচ্ছাকে দমন করা যেত না এবং কোন-না-কোনভাবে আগুন জ্বলে উঠতই। আমাদের এটা বোঝার জন্যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক ধীশক্তির প্রয়োজন ছিল না যে, এ সবই অর্থহীন ছিল সেখানে, ছিল দৃশ্যত গভীর এক বিরোধ, যার কোন শেষ ছিল না। আত্মসমর্পণ করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব ছিল, জয়কে দেখতে পাওয়ার মতো যুক্তিসঙ্গত দূরদৃষ্টি ছিল না, সেই সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টির কোন চিহ্নই ছিল না, যা ভবিষ্যৎকে অতীতের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখতে পায়। আমার নিজের চিন্তাগুলোকে আবার বিশ্লেষণ করলে, যা নিশ্চিত ও প্রধানত আমার চারপাশের চিন্তাভাবনারই ছায়া ছিল, আমি দেখতে পাই যে, আমি বিষণ্নভাবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি এবং এ-অনুমানগুলো, যদ্দুর পর্যন্ত সেগুলো সঠিক, কতটা পরিপূর্ণ হয়েছে, অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেকথা ভেবে মর্মাহত হই।

কেউ যখন পরিণতির কথা ভাবে বা কল্পনা করে, তখন চলমান অভিজ্ঞতার আলোয় তার অর্থ ভেবে, কোন আশঙ্কা না করেই তা করে। কিন্তু তখন ব্যাপারটা এমন মনে হচ্ছিল ; সাতাশে এপ্রিল..... আমি যদ্দুর দেখতে পাচ্ছি সরকারকে কেউই পছন্দ করছে না। ছাত্ররা নিজেদেরকে জনমতের পুরোধা মনে করছে। কিন্তু তারা গঠনমূলক বিকল্পের ছায়ামাত্রও বহন করে না, তা তারা নয়ও। সাধারণ অসন্তোষের কথা বিবেচনা করলে, কিছু বোঝার মতো ব্যাপারে তা প্রকাশ হয়েছে—অবস্থাটা তা হলে কী ? না, এমন কোন ভাবনা আমি দেখিইনি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে চায়? জনগণ কী চায়? পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হতে? না, তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না, হয়ত নিজেদের খাপ খাওয়াতেও পারবে না। বার্মার সাথে মিশে যাবে? না। কমিউনিস্টরা হয়ত তেমন লক্ষ্যে কাজ করছে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে এমন কথা বলারও সুযোগ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত বার্মা তার নিজের পথে চলছে। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবি পুলিশ ও সৈন্যরা পূর্ববঙ্গ দখল করে রাখবে। যদি তাদের কোন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা দেয়ার থাকে, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা না শোনা হয়, নিজেদেরকে গোলযোগে ব্যস্ত রাখাই ভালো। কিন্তু তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হলো, এ-ধরনের গোলযোগ চলতেই থাকবে, বারবার, যতক্ষণ পর্যন্ত না—যা মনে হয়, হবে না—সরকার নিজের পক্ষে জনমত জয় করার জন্যে গঠনমূলক কিছু করবে। অথবা স্থানীয় সমস্যাগুলো বিদ্রোহ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সর্বোত্তম যা করতে পারি তা হলো, পড়াশুনো চালিয়ে যাবার চেষ্টা এবং যথেষ্ট পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের শক্তিকে ধরে রাখা আর আরও জ্ঞান লাভ করে গঠনমূলক অবদানে সাহায্য করা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে, এই ঝড়ের সম্ভাব্য পরিণতি হলো, সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা—যা একেবারেই বাজে একটি ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে অনেক আগেই বর্ষা এসে গেছে, ফসল বোনার আগেই। সুতরাং পরের ফসল তোলা হলো না। খোরশেদ জানাল ওর বাবা তিনটা ক্ষেত করতে পারেনি, গ্রামের বাকি লোকেদেরও একই অবস্থা। বঙ্গোপসাগরের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পুরো নোয়াখালী শহর। কেউ-একজন স্বপ্ন দেখেছে যে কালী তাঁকে তুষ্ট করতে একশো শিশুর বলি চান, এবং খোরশেদের গ্রামের মায়েরা ও অন্যান্য জায়গাতেও, মায়েরা তাদের ছেলেদের কান ফুটো করে দিচ্ছে যাতে তারা বলির অযোগ্য হয়ে যায়, আর সন্ধে বেলাতেই ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

শান্তিপূর্ণ বিরতি

প্রায় অলক্ষ্যেই চাপরাশিরা তাদের কাজে ফিরে গেল। আমার জন্যে ভীষণ আরাম হলো, কারণ কালীপদ একেবারেই অপরিহার্য ছিল। ছাত্রনেতাদের মধ্যে যারা চাহিদামাফিক ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে আর কখনও শান্তি বিঘ্নিত করবে না, তাদেরকে পুনরায় ভর্তি করে নেয়া হলো এবং অন্যরা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুই খুব স্পষ্ট করে পরিষ্কার হলো না কিন্তু হঠাৎই আমরা উন্মত্তের মতো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এর আংশিক কারণ হচ্ছে, পরীক্ষার সময় চলে আসছে এবং কেউ ফেল করতে বা এক বছর বসে থাকতে চাইছে না। কিন্তু আরও একটি কারণ হলো, বাঙালি ছাত্ররা সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ, অথবা বলা যায় তারা জীবনকেই সাহিত্য করে তোলে, তাই তারা ঘরে ফেরার আনন্দ নিয়ে ক্লাসরুমে ফিরে এল।

ঢাকা যখন পুরোদমে কাজ করে—যা খুব বিরল ঘটনা—শিক্ষকতার জন্য চমৎকার। আমাদের কিছু প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্র আছে, কিন্তু পরে, আমি যখন তুলনা করার মতো অনেক জায়গায় পড়িয়েছি, দেখেছি প্রায় সব জায়গাতেই একই ব্যাপার। খুব মেধাবী থেকে একেবারেই নির্বোধ। ছাত্রদের অতীত পটভূমি ভিন্ন ভিন্ন, বিশ্ববিদ্যালয় গুলো তাদের প্রত্যেককে প্রায় মৃত মধ্যমানের স্তরে সংকুচিত করার সহজাত ক্ষমতা রাখে। ঢাকা কোন নিষ্ঠুর পেষাই মেশিন ছিল না। রেজিস্টার খাতাটিতে ছাত্রদের নামের তালিকা বড় মনে হওয়ার মতো যথেষ্ট ছোট ছিল শহরটি। সংকীর্ণচিত্ত না হয়েও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সংকলনে যথেষ্ট পরিণত, এবং ইংরেজি বিভাগ তার প্রধানদের ব্যাপারে সবসময়ই সৌভাগ্যবান ছিল। প্রয়াত অধ্যাপক সিএল ওয়ারেন প্রথমদিকে এখানে ছিলেন। তারপরে এসেছেন ড. হাসান এবং আমি যদ্দুর তাঁকে জানি তিনি ছিলেন পুরোপুরি একজন প্রশাসক, যিনি একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশিষ্ট পণ্ডিতও ছিলেন বটে। আমার কিছু সহকর্মী, যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন জানিয়েছেন সেকথা। আমার ঠিক পূর্বসূরি এস এন রায় ছিলেন ঋষি ও পণ্ডিতের একটি সমন্বয়— যা বলে আমি কিন্তু একথা বোঝাতে চাইছি না যে, তাঁর বাস্তব প্রশাসনিক কোন বুদ্ধি ছিল না বা ভক্তি তাঁর সাহিত্যবিচারের ক্ষমতাকে খর্ব করেছে। যদি অহংবাদী হতেন তবে হয়ত চমৎকার রচনা তিনি ছাপাতে পারতেন কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, যা কিনা এত দীর্ঘ নয়, অবসর গ্রহণের পর বহুদিন পর্যন্ত, তাঁর কাজ ছিল প্রতিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ যে তাঁর সাহায্য ও পরামর্শপ্রার্থী হত, তাকে তা দেয়া। বিভাগীয় কার্যালয়ে একটি গ্রুপ ছবিতে তাঁর পোর্ট্রেট আমার মাথার ওপরে ঝুলত। প্রথম যখন এলাম ছাত্ররা কৌশলে সেটা সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিল, এই ভয় পেয়ে যে, এমন জনপ্রিয় পূর্বসূরির প্রতিকৃতি হয়ত আমাকে তাড়া করবে একটি স্থায়ী তিরস্কারের মতো। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পেরে ওদের বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছিলাম—এটুকু বাদে যে তাঁকে খুঁতখুঁতে সমালোচক মনে করা যায় না, বরং তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান পরামর্শদাতা। তিনি কলকাতায় একটি কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমাকে ঢাকায় তাঁর পুরনো ছাত্রদের ব্যাপারে আলাপ করতে হত। এমনটি কখনও হয়নি যে কারও নাম বা কাউকে ব্যক্তি হিসেবে তিনি মনে করতে পারেননি। বরং আমাকে ছাত্রটির মানসিক ধীশক্তি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন আর সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল চতুর ও সহানুভূতিশীল দুইই।

এখানে জীবনযাত্রার একটি মান ছিল, নিম্নস্তরে ইংরেজি পড়ানোর ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা বেড়ে উঠছিল সেসব সত্ত্বেও, শিক্ষকরা যাঁরা এই মানকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেতেন তাঁদের জন্য। তবে আমরা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে-আঞ্চলিক অসুবিধা থাকে তা থেকে মুক্ত ছিলাম না। সবচাইতে খারাপ ব্যাপারের একটি হচ্ছে, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায়, নির্বিচার মুখস্থবিদ্যার সঙ্গে মুক্তচিন্তার মতো কোন বিষয়ের ভীতি যুক্ত হওয়া। এর আংশিক কারণ হিসেবে বলা যায়, অল্প কিছু নিযুক্তির জন্যে যখন বেশি লোক কাড়াকাড়ি করে এবং সাফল্যের জন্যে যখন নম্বরই প্রধান চাহিদা হয়ে দাঁড়ায় তখন প্রার্থীরা নম্বরকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে ধরে নেয়। তখন মতপ্রকাশের মতো পরিণত হয়নি এমন ভাষায়, নিজে তুমি কী ভাবছ তা বলার চেয়ে তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত কোন বিশেষজ্ঞের সংকলিত উপলব্ধির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ। বিশেষত এমন সব বই সম্পর্কে যেগুলোর মানসিক পটভূমি তুমি জানতে পেরেছ অন্য বই থেকে। যেসব পরীক্ষক নিয়মিত খেদোক্তি করেন, 'নিতান্তই নির্বোধ পুনরাবৃত্তি' বা 'ধারকরা পুরনো মূল্যায়ন', সেই একই পরীক্ষক প্রায় সময়ই প্রশ্ন করেন এই পদ্ধতিতেই যাতে এভাবেই সবচাইতে ভালো ও বেশি উত্তর দেয়া যায় এবং যাতে সবচাইতে কম সাহসী প্রার্থী সবচাইতে বেশি ভালো করে। আমি এমন অনেক ছাত্র পেয়েছি যারা ইংল্যান্ড, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভালো ফল করেছে, যারা আমাকে বলেছে যে তারা চিন্তা করতে শিখতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। কারণ পশ্চিমা শিক্ষকরা শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিষয়ের চিন্তাভাবনাকে বুঝতে পারেন এবং তারা যদি আগে এটার চর্চা করত তা হলে কখনোই সমুদ্রের ওপারের বৃত্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবার মতো যথেষ্ট নম্বর তুলতে পারত না।

তবে, এই-ই সব নয়। এশীয় শিক্ষায়, একজন ছাত্রের মনে দুটো পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতিকে বেছে আলাদা করতে হয়। একটি হচ্ছে সঞ্চারিত করার সংস্কৃতি। অপশ্চিমা জীবন হচ্ছে দায়িত্ব ও ঔচিত্যবোধের কোষসমষ্টি, যেখানে বিকল্প প্রায় নেই-ই, জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব পর্যায়ে, এবং সে-ই সত্যিকারের সভ্য লোক যে কখনওই এইসব দায়িত্ব-পালনে ব্যর্থ হয় না। বিদ্যালয়ে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি এভাবেই একজন ছাত্র আকৃষ্ট হয় ; সবসময় পাঠ্যবইটিকে হৃদয় দিয়ে জানার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, বিন্দুমাত্র হঠকারিতা নয়, বরং সঠিক মনোভাবটিকে সঠিক ভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা নিয়ে সে এগোয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে থাকে যাকে বলা যায় উদ্যোগ বা উদ্যমের সংস্কৃতি। পশ্চিমা সমাজ থেকে দ্রুতগতিকে পরিবর্তিত হয়ে আসা একটি অত্যন্ত আধুনিক বিকাশ। এই পদ্ধতিটি ব্যক্তির ওপরে বেছে নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, ব্যক্তিগত বিপদ ও সামাজিক বাধা সত্ত্বেও যত বেশি পরিস্থিতিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় আশা করে যে ছাত্রটি কোনকিছুকেই বিশ্বাস করবে না বরং প্রতিটি কথিত সত্যকে অনুসন্ধান করবে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তকে নিজে সে পরীক্ষা করে গ্রহণ করবে। এতটা উদ্যম আমরা অর্জন করি না কিন্তু সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাই বা মনে করি যে তা করছি। যে তরুণটি জানে যে তার বোধগম্য সব প্রসঙ্গে—যেমন স্ত্রী-নির্বাচন থেকে প্রাচীন একটি পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা পর্যন্ত,—সঠিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই সঠিক, তার সম্পর্কেই আশা করা হয় সেইসব ক্ষেত্রে, নিজের মতামত দেয়ার মতো যথেষ্ট সুপরিচিত নয় যে-পটভূমি, সেখানে সে নিজস্ব মতামত দেবে, এবং তাদের পক্ষে দাঁড়াবে। খুব আশ্চর্যের বিষয় হবে না যদি সে কর্তৃপক্ষকেই বেছে নেয়। মেয়েদের জন্য ব্যাপারটি আরও কঠিন। কারণ আত্মসমর্পণ ও আত্মপ্রত্যয়হীনতাকে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতম গুণ বলে ধরে নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের সম্পর্কে আমি যা বলেছি তাতে একথার সত্যতা মেলে না বটে কিন্তু ব্যাপারটি তা-ই। একই মেয়েরা, যখন কোন নীতির জন্য লড়ছে ধর্মঘটের সময়ে পিকেটিং করবে, পুলিশকে অগ্রাহ্য করবে, এমনকি আহতদের হাসপাতালে দেখতে গিয়ে প্রচলিত নিয়মকে ভাঙবে—আবার এই মেয়েরাই পর্দায় অভ্যস্ত ছিল, সিনেমায় একজন বয়স্কা অভিভাবিকা ছাড়া যেত না, সাধারণত একই শ্রেণীকক্ষে বসে থাকা পুরুষ-ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলত না। এমনকি কোন টিউটরিয়ালে যখন কোন ছাত্রই প্রায় উপস্থিত নেই, কদাচিৎ কোন প্রশ্ন করতে সাহস করত। এই বশ্যতার মনোভাব অতিক্রম করতে অনেকটা সময় লেগেছে।

আমরা যদিও অব্যাহতি পাইনি, কিন্তু ঢাকা যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে শিক্ষাকে সক্রিয় করতে। কেবলমাত্র আমার নিজের অক্সফোর্ডের স্মৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েই বিচার করতে গিয়ে ছাত্ররা রচনা লেখে এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিত হয়, এটা এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলে আমি মনে করিনি। মনে করিনি যে, গ্রন্থাগারকে হবু পাঠকদের হাত থেকে উৎসাহের সঙ্গে রক্ষা করা হয় না, যে, বক্তৃতার একটি বড় অংশ ছেঁটে ফেললেও একটি ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারে যদি তার টিউটোরিয়াল রেকর্ডে দেখা যায় যে সে সময় নষ্ট করেনি। আমি নিজে বক্তৃতা দিতে পছন্দ করতাম, কিন্তু সাধারণত ছাত্র হিসেবে তাদের কথা শুনতে চাইতাম না এবং ব্যর্থদের জন্য একধরনের গোপন সহানুভূতি বোধ করতাম। রচনা ও টিউটোরিয়াল ছিল একটি ভিন্ন ব্যাপার। কারণ তাতে নিশ্চিত পরিমাণ কিছু মানসিক সক্রিয়তার প্রায়োজন হত। একজন নাছোড়বান্দা শিক্ষকের সামনে মুখোমুখি বসে থাকা দুজন ছাত্র সাধারণত শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করত তারা যা লিখেছে তা কি অর্থপূর্ণ কিছু, না নিতান্তই অর্থহীন। কিন্ত টিউটোরিয়ালগুলো তাদের অর্ধেক গুরুত্বই হারাত যদি গ্রন্থাগার ভালো ও সহজগম্য না হত। কারণ কেবলমাত্র গত সপ্তাহের বক্তৃতা দিয়ে তুমি খুব অর্থপূর্ণ কিছু ভেবে উঠতে পারবে না ; এবং উল্টো দিকে, খুব অল্প ছাত্রই শিখতে পারবে কেমন করে বই ব্যবহার করতে হবে যদি তাদের রচনাগুলো আলোচিত ও সমালোচিত না হয়।

ঢাকায় পদার্পণ করাটা আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল যেখানে এই ধরনের স্পষ্ট কাণ্ডজ্ঞানগুলোকে গ্রহণ করা হয়। সেগুলো দাপ্তরিক হৃদয়ের কাছে অত স্পষ্ট ছিল না যা কিনা বিশ্ববিদ্যালয়কে চালিত করত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার যন্ত্র হিসেবে এবং পণ্যগুলোকে সবচাইতে হিসেবি পন্থায় বিতরণ করার জন্য।

AMARBOI.COM

তবুও আমি যে কখন বোধগম্য হয়ে উঠেছি সেটা জানতে সময় লেগেছে এবং নিশ্চয়ই আমি যতটা শিখেছি তার চেয়ে বেশি ওরা জানিয়েছে। তখনকার দিনে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ছোটবেলা থেকে ইংরেজি বই পড়ত। তাই তাদের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগতের সঙ্গেও পরিচিত ছিল কিন্তু একটি সংখ্যা বাড়ছিল যাদের কাছে এইসব সূক্ষ্ম পূর্বধারণাগুলো তাদের নতুনত্বে বিভ্রান্তিকর ভাবে আনন্দময় ছিল যেগুলো হয়ত পশ্চিমা পাঠকের কাছে এবং লেখকের কাছেও গ্রাম্য ও অভব্য বলে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অন্যদিকে একজন আধুনিক ইংরেজের কাছ থেকে যা পাওয়া যেতে পারে বাংলায় সেসব যেন প্রায় পরিচিত ছিল অথবা তা-ই মনে হত, কারণ অর্থপূর্ণ পার্থক্যগুলো অলক্ষ্যেই রয়ে যেত। উদাহরণ হিসেবে চসারকেই ধরা যাক। একটি তীর্থযাত্রায় অদ্ভুত বা পুরোনো দুনিয়ার কোন ব্যাপার ছিল না এবং ধর্মভিক্ষুরা তো প্রতিদিনের দৃশ্য, যদিও ক্যাথলিক স্কুলে না এলে এদের ভেতরের সম্প্রদায়গত পার্থক্যের কথা জানাই যায় না। কিন্তু মদ খাওয়া মানেই যে অধঃপতনে যাওয়া নয় এটা বুঝতে অনেকটা সময় লেগেছে। একটি উজ্জ্বল ছাত্র জানাল যে, অক্সেনের ক্লার্ক (কেরানি)-কে কল্পনা করতে কেবল প্রয়োজন হবে নেতিয়েপড়া ঘোড়ার জায়গায় একটি মরচে-ধরা বাইসাইকেলকে ভেবে নেয়ার, যে-কেরানিটি বই কেনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য টাকা ধার করেছিল এবং ঋণদাতাকে সেই টাকা ফিরিয়ে দেয়ার বদলে তার জন্য প্রার্থনা করেছিল, যেমনটি ঢাকাতেও বেশ সাধারণ ঘটনা। যদিও ছেলেটির প্রাপ্ত মান বলছিল যে, সে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জন্যই বেশি উপযোগী, ইংরেজির চেয়ে।

কখনও কখনও সম্পূর্ণ নতুন একটি আঙ্গিক থেকেও খুব প্রাণবন্ত আলোচনা পাওয়া যেত যার টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও, বিশ বছর পরও আমার মনে গেঁথে আছে। অ্যাংলো স্যক্সান ক্লাসটি ছিল প্রথম বর্ষ সম্মানের জন্য একটি জুজুর মতো। দুর্ভাগ্যজনক একটি সময়সূচির জন্য ক্লাসটি পড়ে গেল একটি ঠাসা দীর্ঘদিনের শেষে। এবং যেহেতু সে-বছর এটি পরীক্ষার বিষয় ছিল না ছাত্ররা আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘোরাতে যে-কোন সুযোগই ব্যবহার করত। মাত্রই আমরা আঙুরক্ষেতে শ্রমিকদের রূপক কাহিনীটি শেষ করেছি, কেউ-একজন হাত-পা ছড়িয়ে আলাপের ভঙ্গিতে শুরু করল, 'ম্যাডাম, এগুলো হচ্ছে সবচাইতে বিখ্যাত এক নবীর কথা এবং এসবকে রীতিমতো পড়াশোনা না করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের কি মনে করতে হবে যে স্বর্গরাজ্য এমন সব অর্থনৈতিক নিয়মে চলছে যা মোটেই পৃথিবীর গুলোর মতো নয়?' আরেকজন ডেস্ক চাপড়ে বলে উঠল, 'আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের হৃদয় সম্পূর্ণ যুক্তিবর্জিত।' বাকি সময়টুকুতে আধ্যাত্মিকতাকে জায়গা করে দিল ব্যাকরণ। একটি হিন্দু মেয়ে গলসওয়ার্দির নাটক পড়ছিল। একদিন টিউটোরিয়ালে আমি তার মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছিলাম যে, আধুনিক নাট্যকারদের জন্য সামাজিক শক্তিগুলো সেই কাজ করে যা গ্রিক নাটকে দেব-দেবীরা করে থাকেন। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু সামাজিক শক্তিগুলো মানুষের সৃষ্টি!'—এবং আমার মনে হলো কোন পাশ্চাত্য ছাত্র ক্ষমতার ব্যর্থতার দিকে এমন নির্দ্বিধ তর্জনী তুলতে পারত না। অতিপ্রাকৃতের কাছে মানুষের পরাজয় হয়ত করুণ, নিজের সৃষ্টির সামনে মানুষের কাপুরুষতা করুণাযোগ্যর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না: কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তা দেখার জন্য তোমাকে জানতে হবে ঈশ্বররা কী।

বাংলায়, পূর্ব বা পশ্চিমে, ইংরেজি সাহিত্য পড়তে আসা ছাত্রদের মধ্যে তাদের নিজেদের সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতনতা থাকে যা হিন্দি ও পাঞ্জাবিভাষী এলাকার ছাত্রদের চেয়ে তীব্রতর, (সেসব এলাকায় আমি পরে পড়িয়েছি। যেহেতু দক্ষিণে আমি কখনও পড়াইনি, তুলনা করতে পারব না)। এর ফলে তারা হয়ত বেশি ভালো ছাত্র হয় না, কারণ সেসব নির্ভর করে একজনের মনের গুণাবলীর ওপর এবং কী পরিমাণে পরিশ্রম সে করতে প্রস্তুত তার ওপর, কিন্তু এটা তাদেরকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, আরও পরিশীলিত আগ্রহ দেয় প্রকাশভঙ্গি, মাধ্যম ও শৈলীর দিক থেকে। বাংলা একটি উন্নত ভাষা, নমনীয় ও গ্রহণেচ্ছু, যার আছে একটি প্রাচীন, জীবন্ত ও নিরীক্ষাপূর্ণ সাহিত্য-সম্ভার। লেখ্যভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার সম্পর্ক, কোন্ মাত্রায় আগেরটি পরেরটিকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে, নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা ও আবেগকে পুরনো ঐতিহ্যশালী আঙ্গিকে নতুন করে প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে, এ সবই সেখানে অত্যন্ত জোরালো প্রশ্ন ছিল এবং যেসব ছাত্র নিজেদের ভাষায় সৃষ্টিশীল রচনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, তারা ইংরেজি সাহিত্যের এসব বিষয়েও খুব সচেতন ছিল। তারা হয়ত ভালো ইংরেজি লিখত না, কিন্তু তারা ইংরেজি ক্লাস থেকে বাংলায় তাদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ে যেতে পারত। ঢাকায় প্রকাশিত প্রথম কবিতার সংকলন 'নতুন কবিতা'য়, কারণ এটিই প্রথম কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, বেশির ভাগ লিখিয়েই ছিল ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। আমি ওটার ভালো মূল্যায়ন করতে পারিনি, কিন্তু অন্য প্রভাষকরা জানিয়েছেন সংকলনটি প্রতিশ্রুতিশীল এবং মুরশিদ 'নিউ ভ্যালুসে' এর খুব কঠোর কিন্তু ধ্বংসাত্মক নয়, এমন একটি সমালোচনা করেছিল। শেকসপীয়রের পর সবচাইতে সম্মানিত হতেন, এখনও পর্যন্ত রোমান্টিক কবিরাই, কিন্তু সবচাইতে আগ্রহী ও অনুশীলনপ্রিয় হৃদয় সবচাইতে বেশি পাঠ করত ইয়েটস ও এলিয়ট। এলিয়টের ওপরে বক্তৃতা ও বেতারকথিকা শোনার এক অশেষ ও আকণ্ঠ তৃষ্ণা যেন ছিল। প্রথম প্রথম আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এটা কি আধুনিক প্রতিপন্ন হবার বাসনার চাইতে বেশি কিছু কি না, কারণ, আমার কাছে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ইউরোপীয়, যদিও তিনি ওয়েস্টল্যান্ড কবিতায় চারটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পালানোর জন্য তিনি যেন একটি জীবনরেখার মতো হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বাঙালিদের মতে যিনি ইংরেজিতে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন পাননি, নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের ভাষায় অত্যন্ত বড় একজন কবি ছিলেন। কিন্তু একজন বড় কবি একটি বড় গাছের মতোই তাঁর চারপাশের একটি সীমানা জুড়ে ছায়া ফেলেন। বাঙালি একজন তরুণ যখনই কবিতা লিখতে বসেছে, তার নিজের চোখ, কান ও অনুভূতিকে দখল করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কবিতার আর কোন ছন্দ নেই, আর কোন চিত্রকল্পের বিন্যাস নেই। কেবলমাত্র ভাষার একজন দক্ষ, কুশলি নিয়ন্ত্রণকারী, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সংবেদনশীলতা ও অনুভবশক্তি দিয়ে সেই মোহশক্তির জাল ছিন্ন করতে পারেন। এবং অন্য যে-কারও চাইতে টি এস এলিয়টই তাদেরকে সবচাইতে বেশি দেখিয়ে দিয়েছেন কী করে কাব্যের প্রদেশকে সম্প্রসারিত করা যায়।

ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে, জীবন কঠিন, জীর্ণ, যন্ত্রণাময় একঘেয়ে, নিষ্করুণভাবে অমানবিক, কিন্তু বাংলায় একই সঙ্গে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে শিল্প। আমার সহকর্মী ও ছাত্র উভয়ের জন্যই, ইংরেজিপাঠ্যের মধ্যে, তাদের নিজেদের সভ্যতার সৃষ্টিশীল যন্ত্রের মতো বাংলার উল্লেখ নিহিত থাকত। এটা কোন উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং প্রকৃত উপলব্ধি যে সাহিত্যের সমৃদ্ধি জাতীয় জীবনেরই সমৃদ্ধি। এর ফলে এটাও সহজেই বোঝা যায় জনগণের অসন্তোষগুলো কেন কোন বিশেষ অর্থনৈতিক বা সামাজিক দুর্দশার ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত না হয়ে ভাষার আবেগময় প্রতিরক্ষায় রূপ নিয়েছে যা ছাড়া বাঙালি যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলবে। নতুন রাষ্ট্রকে সংহত করার পদ্ধতিতে কোন কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য এতটা বোকামি হত না, যা হয়েছে বাঙালিদেরকে উর্দুর পর দ্বিতীয় স্থানে থাকতে বাধ্য করার চেষ্টায়।

যদি ঠিকঠাক মনে করতে পারি, সেই গ্রীষ্মে আমরা শেকসপীয়র উপস্থাপন করেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্ররা এজন্য চাপ দিচ্ছিল এবং নির্ভুল প্রতিভার স্বাক্ষর তারা রেখেছিল ড. ফাউস্টাসের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায়, যেটি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তড়িঘড়ি করে ওরা করেছিল এনইউএস বিতর্ক দলের সম্মানে। বলা যায়, প্রায় ভণ্ডুল বা ব্যর্থ একটি শুরু আমরা করেছিলাম, মাঝখানে ধর্মঘটে ছেদ পড়ল। কিন্তু এখন সময়টিকে উপযুক্ত মনে হলো, যদিও পরীক্ষা-ঘনিয়ে-আসা এই সময়টাতে একটি পুরো নাটক করা একটু বেশি বড় প্রচেষ্টা হয়ে যাবে। আমরা স্থির করলাম, ওথেলোর দুটো দীর্ঘ দৃশ্যের খোলা প্রদর্শনী করব (বিএ ক্লাসের ছাত্রদের জন্য নিশ্চিত হিট, কারণ এ-বছর সেটা পাঠ্য)—ক্যাসিওর অপমানের দৃশ্যটি এবং শেষ দৃশ্যটি। বিশাল কার্জন হলে, দর্শকপূর্ণ মিলনায়তনে মঞ্চায়িত হয়েছিল নাটকটি। খুব একটা খারাপ হয়নি: সজ্জা ও প্রযোজনার সবকিছু ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, যা হয় হোক বলে, কারণ, আমি বা অন্য কেউই, যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম, এসব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কিন্তু অভিনয় নাটকটিকে উৎরে দিল। শিশ্র অভিনয়, বাস্তব জীবনের ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে যতই নিয়মিত দেখা যাক না কেন, মঞ্চের ওপরে তা ইসলামি ঔচিত্যবোধকে ক্রুদ্ধ করত, জনগণ ও পত্রিকা সবাইকে নিয়ে হয়ত আমাদেরকে আক্রমণ করত। যেহেতু খ্রিস্টানদের কোন শুদ্ধতাবোধের বালাই আছে বলে জানা নেই, ক'জন ছাত্র খ্রিস্টান দুটো মেয়েকে স্থানীয় কনভেন্ট স্কুল থেকে নিয়ে আসার কথা বলল, কিন্তু আমার সন্দেহ হলো তাতে কাজ হবে কি-না, এবং যা করেই হোক, আমাদের মহড়ার সময়েরও কিছুটা সাশ্রয় হবে ভেবে আমরা সত্যিকার এলিজাবেথীয় ঐতিহ্যেই নাটক করলাম মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেদের দিয়ে। তাই শেকসপীয়রই জিতে গেলেন: ডেসডেমোনার মৃত্যুর সময়ে ওঠা রুদ্ধশ্বাসে কোন হাসি ওঠেনি।

আমাদের অনভিজ্ঞ অভিনেতাদের পুরোটা মঞ্চ ব্যবহার করতে কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি। চলাফেরার একটি স্বাভাবিক সাবলীলতা ছিল এবং তাদের অঙ্গভঙ্গি স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত, অনেক ইংরেজ নবিশের যেমন হাতগুলো ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত পাশে যেন আটকে দেয়া হয় তেমন নয়। বেশির ভাগ ভারতীয়ই হাত ও আঙুল নাড়িয়ে কথা বলে, কখনও মাথাও নাড়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি আছে। ইংরেজি নাটকে প্রধান একটি সমস্যা হচ্ছে কথা, কারণ স্বরভেদ আর উচ্চারণের ভঙ্গি একেবারে অন্যরকম ; অভিনেতা জানেন যে তিনি লেখকের ইচ্ছামতো বলতে পারছেন না, এবং সবসময়েই এই ভয়টা রয়ে যায় যে উচ্চারণের অতিরিক্ত বেশি সচেতন অনুশীলনী অঙ্গভঙ্গির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হারিয়ে ফেলতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা তখন উদ্ধার করতে এগিয়ে এল, একবার ছন্দ তাদের পেয়ে গেলে শেকসপীরীয় সঙ্গীত তাদের বয়ে নিয়ে গেল। ঐ প্রদর্শনীর যা আমি মনে করতে পারছি তা হলো ওথেলোর কণ্ঠস্বরের আন্দোলিত সৌন্দর্য, কবিতার ছন্দের প্রতিটি উত্থান-পতনের বিশ্বস্ততার সঙ্গে যা প্রতিধ্বনিত, আর ইয়াগোর অভিনয়। সে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিল না, উদ্দেশ্যহীন বিদ্বেষ সম্পর্কে কিছুই জানে না, অথবা অন্যান্য বিখ্যাত উক্তিগুলো সম্পর্কেও, খাঁটি বাংলা ভঙ্গিতে সে ইয়াগোর ভূমিকাটি অভিনয় করল, কবিতার স্বরবিভেদসহ। ফলাফল হলো ছদ্মবেশে শয়তান। ক্যাসিওর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে সে ভালোমানুষ, মোটা ভাত খাওয়া, সহযোদ্ধা ; একা স্বগতোক্তির সময়ে যেন দুই ইঞ্চি লম্বা হয়ে যায়, অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবৃত্তির সময়ে যেন নিজের মাতৃভাষার সহজ সাবলীলতায় ফিরে যাচ্ছে, স্বর্গের দৈবপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এক হয়ে যায়। আর ওথেলো যখন ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে, If thou be'st a devil I cannot kill thee. তার শয়তানি অবজ্ঞাপূর্ণ জয়, I bleed, sir but not killed, তার স্থান সম্পর্কে কোন সন্দেহই রাখে না।

* * *

সেই গ্রীষ্মের স্মৃতি আমার ডায়েরি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই একটি ছোট্ট ছুটির সময়ে যখন আমি এক ছাত্রীর বাড়ি বরিশালে গিয়েছিলাম নদীতে স্টিমারে করে। মেঘনা দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম, যে-নদীটা দুই মাইল বা সেরকম চওড়া। দুই তীরেই দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, পশ্চিম তীরে এর মধ্যে আঁধার নেমে এসেছে, কিন্তু পূর্বে সূর্যাস্ত একটি উজ্জ্বল সোনালী আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সবুজের ওপর। নদীর বুকে শান্তভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছে শত শত জেলে নৌকা, উঁচু করে বাঁধা পাল, লাল, নীল, সবুজ, সোনালি, বাদামি, বেগুনি বা গোলাপি, আলোয় যেন জ্বলজ্বল করছে, আর একটু পরপরই একটি বা দুটি করে নৌকা সঙ্গীদের ছেড়ে, কোন খাঁড়িপথে চলে যাচ্ছে যেখানে নারকেল সুপুরির গাছ সবুজ ছায়া তৈরি করেছে আর তারপর মেটে কোন কুঁড়ের পাশে নোঙর করছে।

আর কোন স্মরণীয় বিনোদন ছিল না। একটি চিঠি এল, হাতে-লেখা, আর পি সাহা নামে একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে। তাঁর একটি হাসপাতাল আছে, সংলগ্ন একটি মেয়েদের স্কুলও আছে। এটি একটি বিশেষ ধরনের স্কুল এবং আজকের দিনে সবচাইতে জরুরি হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষা, কিন্তু এখন সেখানে শিক্ষকের অভাব আছে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অবস্থানের ব্যাপারে আমি সতর্কতার সঙ্গে অবহিত। সেখানে কোন কাজ করা এখন অসম্ভব, কিন্তু যে-কোন সময় আমি নিজেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পারি, তখন আমিই হব তাঁর স্কুলের ভার নেয়ার ও ছাত্রীদের চরিত্রগঠনের সঠিক ব্যক্তিটি। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে ইচ্ছুক, যাতে আমি নিজের চোখে সব দেখতে পারি। ঢাকা থেকে জায়গাটা বেশ দূরে, কিন্তু শিগ্‌গিরই একটি ছুটি পাওয়া যাবে, যখন আমি একরাতের জন্য সেখানে যেতে পারি। আমি রাজি হলে তিনি গাড়ি পাঠাবেন আমাকে নিয়ে যেতে।

চিঠিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এটাই ছিল বক্তব্য। ইংরেজি আর বানানের কিছু খ্যাপামি ছাড়া, এর ভেতরে ছিল অদ্ভুত এক কর্তৃত্বের সুর এবং সাধারণ ভারতীয় রচনার আলঙ্কারিক ভাষার বিন্দুমাত্র উপস্থিতি ছিল না তাতে। আমি আগ্রহী হলাম, এবং উত্তর দিলাম যে যদিও এই মুহূর্তে আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাবার কথা ভাবছি না, কিন্তু তাঁর স্কুলে ভ্রমণের আমন্ত্রণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি।

আমি দেখতে পেলাম যে সবাই আর পি সাহার নাম জানে। তিনি একজন কোটিপতি, যিনি জীবন শুরু করেছিলেন কৃষক হিসেবে এবং শোনা যায়, বাংলার মন্বন্তরের সময়ে নির্দয় সুদের লাভের ভেতর দিয়ে ভাগ্য গড়ে তুলেছেন। কিন্তু হাসপাতালটি আছে, জঙ্গলের ভেতরে, বেশ দূরে, সহজগম্য নয় কিন্তু পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় সবচাইতে ভালোভাবে সজ্জিত বলে সুনাম নিয়ে। স্কুলটি সম্পর্কে কেউই বেশি কিছু জানে না, কেবল জানে স্কুলটি আছে।

মিস্টার সাহাকে নিয়ে গাড়ি এল, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, খুব লম্বা নন, কিন্তু শক্ত গঠন, সঙ্গে একজন ড্রাইভার ও আরেকজন লোক, যিনি হয়তবা ব্যক্তিগত সচিব বা দেহরক্ষী। আমাদের যাত্রা শুরু হলো, টঙ্গী নদী পার হলাম অদ্ভুতভাবে, একটি দুর্বল ফেরিতে করে যা কোনমতে পানির ওপর ভাসছিল আর বালুময় পথে শ্বাসরুদ্ধকরভাবে ঝাঁকাচ্ছিল, এভাবে চলল জঙ্গলের ভেতরে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় সবচাইতে উন্মত্ত জলভ্রমণ ছিল সেটি। এটি ছিল আত্মত্যাগের মতো, যদি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এটা না বুঝিয়ে দিত যে এই কোটিপতি তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করছেন না, সুতরাং আমি বসে বসে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম। জায়গাটি সম্পর্কে মনে করতে পারি কেবল যে, ভবনগুলো কৃচ্ছ্রসাধনের চিহ্ন নিয়ে সাধারণ, চারপাশের জঙ্গল তাদের ঘিরে আছে, একের পর এক উচ্চভূমি, পাশেই নদী বয়ে চলেছে। এমন জায়গায় কেন হাসপাতাল বানানো হলো? কিন্তু সেখানে পরিষ্কার ফিটফাট ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার, এক্সরে মেশিন, যা-কিছু একটি আধুনিক হাসপাতালের প্রয়োজন হয়, সবই ছিল। এটি ছিল আসলে ভক্তির একটি খেয়াল। এটা ওঁর নিজের গ্রাম, যেখানে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন, তিনি আমাকে জানালেন, একজন কামারের সহকারী হিসেবে, মাসে পাঁচ টাকা বেতনে, এবং তাঁর মা দারিদ্র্যের কারণে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন। এই হাসপাতাল তিনি তাঁর স্মরণে তৈরি ও উৎসর্গ করেছেন। স্কুলটি তিনি যোগ করেছেন কারণ প্রতিটি মেয়েকে নার্সিঙে প্রশিক্ষিত করা হবে ; সব ছাত্রী দিনে দুঘণ্টা হাসপাতালের কাজে সাহায্য করে। তিনি উড়োজাহাজ ওঠানামার জন্য একটি বিমানক্ষেত্রও তৈরি করতে চান, যাতে যে-কোন মেয়ে তেমন ঝোঁক থাকলে পাইলট হবার শিক্ষা পেতে পারে। শুরুতে তিনি স্কুলটি সিনিয়র কেমব্রিজ পর্যন্ত নিতে চান কিন্তু শেষ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটিকে পুরোপুরি ডিগ্রি কলেজ বানাবেন। তাঁর মেয়ে আমাকে স্কুলটি দেখাল। ওর বয়স আঠারো এবং আমার মনে হলো স্কুলের পুরো দায়িত্বই ওর একার ওপরে। বলতে গেলে পাঠাগার, বা শিক্ষা দেয়ার বা নেয়ার উপকরণও বিশেষ কিছু নেই, এবং মেয়েটিরও সেইভাবে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। কিন্তু সেই তরুণীর অন্যান্য যোগ্যতা বিস্ময়কর। সেটি হচ্ছে জীবনের জন্য শিক্ষা, একটি প্রকৃতিগত ভাবে কঠিন পৃথিবীতে। মেয়েরা, যারা শিশু থেকে তার বয়সের পর্যন্ত ছিল, নিজেদের রান্না নিজেরা করে, নিজেদের কাপড় ধোয়, নিজেদের হোস্টেল পরিষ্কার করে। মেয়েটি তাদেরকে ভোর চারটায় বিছানা থেকে তোলে, শীত বা গ্রীষ্ম, সবসময়েই, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করায়, শরীরচর্চা ও প্রার্থনা করায়। কোন কারণে ও উপস্থিত না থাকলে মেয়েরা নিজেরাই সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী কাজ করে। আমার জানতে ইচ্ছে করছিল ওদের এ-সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাগুলো, কিন্ত ওরা খুব লজ্জা পাচ্ছিল এবং আমাকে বলার মতো ইংরেজিও জানত না।

মেয়েটি কিন্তু লাজুক ছিল না। আমি যখন সাইকেল চালানোর কথা বললাম, ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ইস তুমি সাইকেল চালাতে পারো? আমরা তা হলে এক্ষুনি একটু সাইকেল চালাতে পারি? আমার বাইরে যেতে ভালো লাগে কিন্তু কখনওই কাউকে সঙ্গে পাই না, তাই যাওয়া হয় না।' ও আমাকে ছেলেদের একটি সাইকেল এনে দিল, আমি তাই পোশাক বদলে পাজামা পরে নিলাম এবং আমরা আঁকাবাঁকা হাঁটাপথ ধরে চললাম—শক্ত, পাথুরে মাটি অথবা গোড়ালি ডুবে-যাওয়া বালিতে। দীর্ঘ গাড়িভ্রমণের পর আমার জন্য সাইকেল চড়াটা ছিল মজার ব্যাপার আর মেয়েটির জন্য ছিল উল্লসিত পলায়ন। বোঝা যাচ্ছিল যে, একা বেড়ানো নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলায় ভয়ংকর জন্তু জানোয়ারের ভয় ছিল না (হতাশ হয়েছিলাম একটিও না দেখে) কিন্তু জায়গাটি জনঅধ্যুষিত এবং বাড়িগুলো শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভয়ংকর লোকেরা, একা কোন পথচারীকে আক্রমণ করতে পারে, যদি তারা নিশ্চিত হতে পারে যে কেউ তাদের চিনতে পারবে না, এমন ভয় ছিল। মেয়েটির মধ্যে বাবার উদ্যমটি ছিল এবং নিশ্চয়ই সে ওখানে বন্দির মতো বোধ করত, ঐ নির্জন জায়গায় যেখানে ঐসব মেয়েরা, যাদের সমস্ত দায়িত্ব ওর ওপরে ছিল, তারা ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিল না। কিন্তু আমরা কোন দুঃসাহসী অভিযানের অভিজ্ঞতা পেলাম না এবং অন্ধকারের আগেই ফিরে এলাম। এই ভ্রমণের সমর্থনে ওর বাবা কিছুই বললেন না। আমার দিকে বরং একটু বিস্ময়ের সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, 'ঐ পাজামা আপনি কোথায় পেলেন?' তিনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন। সেগুলো ছিল ঘরে তৈরি এবং তা বোঝাও যায়, ঢাকার একটি বাজার থেকে কেনা, সস্তা, এমারাল্ড সবুজ রঙের লুঙ্গি দিয়ে বানানো—বেড়াতে যাওয়ার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে, এখানে এই ঊষর প্রান্তরে যা-কিছুই ফুলের মত ফুটে উঠছে—হাসপাতাল, স্কুল, বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—যা-কিছুই গড়ে উঠছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুর ভেতরে আর পি সাহার বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করল নিশ্চিতভাবে এবং এ- ব্যাপারটাও আমাকে আত্মশ্লাঘা এনে দিল যে, ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে উনি আমাকেই তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হবার উপযুক্ত মনে করেছিলেন। হয়ত এই মোহ বেশিদিন স্থায়ী হত না। কিন্তু নতুন একটি পরীক্ষা করার প্রলোভন সত্ত্বেও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই নিজেকে জড়িত রাখলাম। যদি, তাঁর যেমন মনে হয়েছে—আমার অজ্ঞাতে আমি পরিত্যক্ত হওয়ার মতো বিপদে পড়েই যাই, তখন নিশ্চয়ই তার বাইরেও একটি জগৎ আছে ; ইতোমধ্যে আমার যোগ্য একটি জায়গায় চমৎকার ও সুযোগ্য সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার আনন্দ আমি পাচ্ছি। তাঁর প্রস্তাব তাই আমি ফিরিয়ে দিলাম এবং এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে ফিরে এলাম যে, একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর পি সাহাকে মনে হলো একজন বহুমাত্রিক মানুষ। হাসপাতাল তৈরি সম্পর্কে তিনি আমাকে যা বলেছেন, তা সত্য নয় এমন নয় ; কিন্তু একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তার মতে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান যার আর্থিক সমস্ত ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে, আয়কর ফাঁকি দেওয়ার খুব চমৎকার একটি পদ্ধতিও বটে। আয়কর সোজা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের খাতে চলে যেত এবং যেহেতু হাসপাতালটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সত্যিই সুবিধাজনক ছিল, কেউই সেখানে খুব একটি অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসাবাদ চালায়নি। তাঁর নিজের গ্রামে তিনি ঋষির মতো শ্রদ্ধেয় ছিলেন ; তাঁর সম্পদের উৎস দীর্ঘকাল হলো বিস্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। মালা গলায় তিনি বসে থাকতেন, পা আড়াআড়ি ভাঁজ করে , মহাসুখে হাস্যমুখে, আর ভক্তিভরে মহিলারা তাঁর পদস্পর্শ করত। কলকাতায় তাঁর সম্পর্কে কিন্ত অন্য ধরনের গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাঁর বাড়িতে যেসব লাগামহীন পানভোজনের উৎসব চলত সে-সম্পর্কেও। সততার সঙ্গে বলতে হয়, আমি যে-লোকটিকে দেখেছিলাম তাঁকে সন্ন্যাসীও মনে হয়নি, চরিত্রহীন রোমক সম্রাটও মনে হয়নি। তিনি কথা বলেছেন, একজন মার্জিত বৈষয়িক লোকের মতো, যিনি ক্ষমতা রাখেন এবং একটি অসম্ভব কিন্তু অবাস্তব নয় এমন কিছু স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে ইচ্ছুক। স্পষ্টতই তিনি একই ব্যক্তির একাধিক হিসেবে কাজ করার মধ্যে কোন অসুবিধা দেখতে পাননি। হাসপাতালের মেট্রন ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এবং পরে যখন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, আমার মনে হয়েছে আর পি সাহা হয়ত একই সঙ্গে হাসপাতালের ছবিতে তাঁকে এবং এই মহিলাকে আমি দেখতে পাই তা চাননি। কাজটির জন্য মহিলা ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য। চার বছর যেভাবে তিনি কাজটিতে লেগে ছিলেন নিশ্চয়ই উপযুক্ত ভেবেই ছিলেন। কিন্তু এর জন্য বিশ্বাস ও বীরত্বেরও প্রয়োজন ছিল। একজন আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বৈরাচার, যার ভেতরে যুক্ত হয়েছে অন্তর্দৃষ্টি ও সজাগ পর্যবেক্ষণ তাঁর নিজেরই স্বার্থে, একজন যোগ্য পেশাদার লোকের জন্য মনিব হিসেবে সহজ নন : জায়গাটির ভেতরেই প্রতিফলিত হচ্ছিল তিনি কী বোঝেন এবং কী বোঝেন না। তিনি জানতেন যে, ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন খুবই ভালো যন্ত্রপাতি এবং লৌহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুসফুস (যান্ত্রিক চাপকলের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার জন্য মাথা ছাড়া বাকি অংশ আবৃত করে এমন লোহার যন্ত্র)-এর মতো কাল্পনিক প্রকল্পের ব্যাপারেও উদার ছিলেন; আবার এটাও তাকে বোঝানো একটি ব্যাপার যে, চাদর পুরনো হয়ে যায়, চামচ ও তৈজসপত্র মাঝে মাঝে নতুন করে কিনতে হয় ; যে, প্রতিটি মহিলারই নার্সের প্রশিক্ষণ থাকা দরকার, খুবই ভালো একটি ধারণা, কিন্তু দুই ঘণ্টা করে শিফটে প্রতিটি মেয়েকে ওয়ার্ডের পাশে রেখে, তা শেখানো, যেখানে মেট্রন ছাড়া আর যোগ্য কেউ নেই, একটি অসুবিধার ব্যাপার। যোগ্যতাসম্পন্ন নার্স খুবই কম, এবং এখানে আসামাত্রই তাদের বেশির ভাগ আর একটু প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ জায়গায় চলে যেত। বাকি সকলেই প্রায় তা-ই করত। ওয়ার্ডের প্রতিদিনের বাঁধা কাজ করত অশিক্ষিত হিন্দু বিধবা মহিলারা যারা নদীর ওপারের গ্রাম থেকে প্রতিদিন নদী পার হয়ে সকালে আসত এবং মেট্রনকে তাদেরকে কাজ শেখাতে হত। তাঁর কাছে মনে হত এসব মেয়েরা আগ্রহী, দয়ালু এবং তাদের বোধক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। ভালো ডাক্তাররা কখনও কখনও ভালো কাজ করার আকর্ষণে আসত কিন্তু জায়গাটি ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও অসন্তোষে এমন পূর্ণ ছিল যে সেখানে সুখে থাকা সম্ভব ছিল না।

কেনই-বা তা হবে না? বিভিন্ন ধরনের লোকজন এখানে এসে জড়ো হয়েছে কিন্তু অসুখ ছাড়া কোন সাধারণ স্বার্থ ছিল না সেখানে এবং অসুখটা যদিও একটি মহৎ স্বার্থের ব্যাপার, কিন্তু সন্তুষ্ট সমাজ গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের কোন সামাজিক জীবন ছিল না এবং একজনের কাছ থেকে আরেকজনের পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। না ছিল তাদের কোন ধর্মীয় বা স্বেচ্ছায় গৃহীত অনুশাসন যা কিনা আশ্রম বা মঠের শৃঙ্খলার মতো একই ধরনের পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারে। হয়তবা আরেকটি কল্পনাপ্রবণ প্রতিভা অন্য ধরনের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারতেন কী করে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু এমন কিছু যদি কেউ চেষ্টা করে দেখতে চাইত, এটার স্রষ্টা এবং একমাত্র লগ্নিকারক কি জায়গাটিকে তাঁর চিন্তার বাইরে কোনকিছুতে রূপান্তরিত হতে দিতেন? যাহোক তবু সেখানে রোগীরা ছিল এবং সবসময়ই কিছু-কিছু নিবেদিত লোক ছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা করতেন এবং ধন্যবাদ হাসপাতালে ব্যয়িত অর্থকেও, সবসময়েই এই আশা নিয়ে যে এমন আরও কিছু সাহসী পরিকল্পনা হয়ত কাজ করবে।

যখন স্কুল ও হাসপাতালটি তৈরি হচ্ছিল আমি এমনটিই ভেবেছিলাম এবং এটাই যেন বুঝিয়ে দিল কোন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে অবমূল্যায়ন করা বোকামি। আমি ১৯৭২ সালে জায়গাটি আবার দেখতে গিয়েছিলাম। বনের ভিতরের মেঠোপথ তখন চওড়া মহাসড়ক, পরিষ্কার, শান্ত সমাহিত গ্রামের মাঝ দিয়ে, যদিও আবারও আমাদের গাড়ি ফেরি দিয়ে নদী পার হলো যেহেতু যুদ্ধে উড়িয়ে-দেওয়া একটি সেতু তখনও মেরামত হয়নি। স্কুল ও হাসপাতালটি এখন সুন্দরভাবে পরিকল্পিত পাথরের ভবন, যেগুলো তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচাইতে সংগঠিত, সবচাইতে ভালোভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ে তখনও ছাত্রীরা নিজেদের রান্না, ধোয়ামোছা ও কাপড় পরিষ্কার করে এমন নিখুঁতভাবে যা কোন গৃহপরিচালিকার পক্ষে করা সম্ভব নয়। হাসপাতালটি নিঃসন্দেহে সেই জায়গা যেখানে ডাক্তারা নির্বিঘ্ন পরিবেশে ভালো কাজ করতে পারে, রোগীর ভালো যত্ন নেওয়া হয় এবং অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা নেন এমন রোগী ছাড়াও কখনও কখনও দুরের কয়েক মাইলের মধ্যে গ্রামগুলো থেকে রোগীরা চিকিৎসা ও এ-সংক্রান্ত উপদেশ নিতে আসত। এর চাইতে নিপুণভাবে এর প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা ভাবা কঠিন ছিল।

কিন্তু আর পি সাহা মৃত, পাকিস্তানি সেনারা, যাদের কাছে সব হিন্দুই দুষ্কৃতিকারী ছিল, তারা তাঁকে মেরে ফেলেছে। আমি যদ্দুর জানি, প্রকৃত সত্য কখনও জানা যায়নি, কিন্তু আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন নিশ্চিতভাবে তিনি ফিরে আসতেন।

এই মানুষটি যিনি একজন কর্মকারের সহকারী হিসেবে পাঁচ টাকা বেতনে জীবন শুরু করেছিলেন ও কোটি কোটি টাকা করেছিলেন, যে-কোন প্রশ্নসাপেক্ষ ও নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই হোক-না কেন, যে-জায়গায় তাঁর মা চরম দারিদ্র্যের ভেতরে মারা গিয়েছিলেন সে-জায়গাটিকে সারা দেশের জন্য একটি নিরাময়ের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। এবং তিনি তাঁর এই সংগ্রামের জন্য নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু এই স্থানটিকেই তাঁর স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছেন—তাই এই মানুষটির এই কাহিনীর প্রতি সুবিচার করার জন্য চাই একজন বড়মাপের বাঙালি লেখক।

একেবারেই বানানো গল্পের মতো শোনালেও যতই ব্যাপারটির গভীরে যাওয়া যায়, ততই যেন এর ভেতরে দেখা যায় একটি কাল ও একটি জনগোষ্ঠির জীবন।

ঢাকায় টাকা যথেচ্ছভাবে খরচ করার মতো সময় ও প্রলুব্ধকর জিনিস কিছুই ছিল না। তাই আমি যেমন কাজ করছিলাম, তেমন সঞ্চয়ও করছিলাম। যুদ্ধের অনেক বছর আগে আমার মা ও এক বোন নিউজিল্যান্ডে স্থায়ী হয়েছেন। ইংল্যান্ড থেকে তাঁদের কাছে বেড়াতে যাওয়া সে-সময়ে প্রচণ্ড খরচের ব্যাপার ছিল। সময়ও একটি সমস্যা ছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সেদিক থেকে অনেক ভালো। পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও ক'সপ্তাহের ছুটি যোগ করে আমি সে-ব্যবস্থা করলাম (যা শেষ হলো অক্টোবরের শুরুতে)। আমি প্লেনে যেতে পারি এবং জাহাজে ফিরতে পারি ; বেতনসহ ছুটির আবেদন করলাম এবং অবাক কাণ্ড, পেয়েও গেলাম। জানা গেল, প্রতি বছর পুরোটা সময় কাজ করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ চমৎকার একটি ব্যবস্থা আছে যাতে তিন সপ্তাহের ছুটি পাওয়া যায় যা কিনা খণ্ড খণ্ডভাবেও নেওয়া যায়। একসঙ্গে এক বছরের সাবাটিক্যাল ছুটি হিসেবেও নেওয়া যায়। যেহেতু আমি একদিনও অসুস্থ হইনি, একদিনও এমনকি ধর্মঘটের সময়েও অনুপস্থিত থাকিনি, আমার ঝুলিতে তিন সপ্তাহের সময় জমা হয়েছে যার সঙ্গে চার সপ্তাহের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি যোগ হচ্ছে।

পাকিস্তান থেকে বেরুনো যেন ঢোকার চাইতে বেশি কঠিন। প্রথমত, একটি আয়করের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে। সেজন্য আমাকে উপাচার্যের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিয়মিত কর্মচারী, যে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামী বারো মাসের মধ্যে চিরকালের জন্য পাকিস্তান ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক নই (আমি তা করিনি, কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, তা হলেও ওরা আমার একটি উপেক্ষণীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা ছাড়া আর কিইবা করতে পারত?) যে, বিশ্ববিদ্যালয় আমার সমস্ত অপরিশোধিত পাওনাগুলোর জন্য দায়ী থাকবে। এসব কাগজপত্র যখন তৈরি হচ্ছিল, আমি তখন অর্ধেক টাকা দিয়ে সিডনি হয়ে অকল্যান্ডের একটি বিমান-টিকিট বুক করলাম। অবশেষে যখন সোমবার, উড়ালের আগে আমি প্রত্যয়নপত্রটি পেলাম এবং ভাড়ার বাকি টাকা ও কিছু ট্রাভেলর্স চেক তুলতে গেলাম, ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংক মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বন্ধ এবং যখন খুলল তখন দেবার মতো বৈদেশিক মুদ্রা তাদের নেই। 'এখন আমি কী করি?' কাউন্টারের কেরানিটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার ফ্লাইট বাতিল করো।'

১৯৪৯ সালে ব্রিটেন স্টারলিঙের অবমূল্যায়ন করে, ভারত সে-কাজটি অনুসরণ করে কিন্তু পাকিস্তান করে না। যেহেতু তার অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রতিটি ভারতীয় পাকিস্তানে লেনদেন করতে গিয়ে ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেহেতু ভারতীয়রা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ এবং পাকিস্তানিরা আনন্দিত। ভারত, তারা অনুভব করল যে, তাদেরকে অপমান করেছে বেশি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একথা ভেবে যে, তারাও একই ব্যাপার অনুসরণ করবে এবং এখন ভারতে প্রত্যেকে বলছে পাকিস্তান তার জেদ ধরে রাখতে পারবে না। যদি তারা তা করে তা হলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু মুদ্রাবিনিময়ের কোন আইনসঙ্গত হার নির্ধারিত হয়নি। ফলে সচরাচর যা হয়, পূর্ব পাকিস্তান সবচাইতে বেশি দুর্ভোগ সইল। কারণ এর প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য হচ্ছে কাঁচা পাট। কিন্তু পাটকলগুলো হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্বে শিল্পকারখানা প্রায় ছিলই না। এর বেশির ভাগ বেতনভুক লোকেরা বিভিন্ন মৌসুমে ভারতীয় কারখানায় গিয়ে কাজ করত। এখন তাদের পরিবারের জন্য তারা আর কিছুই প্রায় বাড়িতে আনতে পারে না। পরে আমি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি কিন্তু কেবলই আমার নষ্টপ্রায় ছুটির কথাই ভাবছিলাম। মার জন্মদিনে আমি তার করলাম: Happy returns sorry postponing visit ; প্লেনের টিকিট বাতিল করলাম। আর বসে বসে সান্ত্বনাহীন, বুড়ো আঙুল মোচড়াতে লাগলাম।

তখন আশাতীতভাবে, ঢাকার যুক্তরাজ্য হাইকমিশন এগিয়ে এল আমাকে রক্ষা করতে। এই অফিসের একজন কর্মচারী যিনি ছুটিতে কলকাতা যাচ্ছিলেন, দমদমগামী বিমানে আমার জন্য সোমবার সকাল ৪টায় একটি সিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। চট্টগ্রামের কুক শাখায় টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং তাঁর নিজের জামিনদারিতে হাতখরচ হিসেবে ১০পাউন্ডের ট্রাভেলার্স চেক এনে দিলেন। বেতারের মাধ্যমে আমাকে খবর পাঠালেন। আমি শনিবারে সন্ধ্যায় খবরটা পেয়ে কোনমতে সুটকেসে কিছু কাপড় পুরে, সময়মতো পাসপোর্টের কথা মনে করে, রোববারে প্লেন ধরে কলকাতায় এলাম। কলকাতায় কী করে প্রয়োজনীয় দরজাগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোববারে খোলা যায় আমি হয়ত জানতেই পারতাম না, যদি গত বছরের এম এ ক্লাসের ফণী মিত্র, যে এখানে এম এন রয়ের কলেজে কাজ করছে, নিজে এগিয়ে এসে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা না নিত এবং অক্সফোর্ড প্রেস একটি ফোন, গাড়ি ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য না করত।

শিক্ষার জগতে পারস্পরিক সাহায্যের একটি বিস্তৃত জাল ছড়ানো আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র কলকাতা হয়ে যাবার সময়ে তখনকার অক্সফোর্ড প্রেসের ম্যানেজার আর এল সেনের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছে, যিনি সবসময়ে তাঁর অফিসে থাকতেন, এমনকি রোববারেও, যিনি কখানোই অতিথিকে অবাঞ্ছিত অনুভব করতে দেননি। অসুবিধার সময়ে সাহায্যের ঘাটতি হতে দেননি।

নিউজিল্যান্ড এই কাহিনীর বাইরে, কিন্তু সমস্যা জড়িত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পরিবেশের এমন সম্পূর্ণ পরিবর্তন কল্পনা করাও কঠিন ছিল। এমন অলক্ষ্যে চলাফেরা করতে পারা সত্যিই বিশ্রাম ছিল। একদম অন্যরকম লোকদের মতো করে চলা ও কথা বলা, এমন একটি দেশে যেখানে মানুষ অভুক্ত নয়, যেখানে উপচে-পড়া ভিড় নেই। যেখানে আর্দ্র-উষ্ণতা শরীরের সব শক্তিকে নিঃশেষিত করে দেয় না।

এমন একটি দেশ যেখানে সুখী হওয়া যায় কিন্তু তবু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমার সেখানে থাকতে খুব একটি ইচ্ছে হলো না। বাংলা, যেখানে আমি সবসময়ই অর্ধ আগন্তুক হয়ে রইব যেন আমায় গ্রাস করে রেখেছে এখনও।

অস্ট্রেলিয়ায় আমি আকাশপথেই ফিরে এলাম। তারপর বম্বেতে পি অ্যান্ড ও স্টিমার হিমালয়ে করে ; খুবই সাধারণ একটি যাত্রা। কিন্তু সমুদ্র আমাকে কখনও ক্লান্ত করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটি তিমিমাছ ছিল, যার লাফালাফি আর ঝাপ্টার মতো জল ছোড়া আমি একান্তে উপভোগ করছিলাম যখন অন্যরা হয় মধ্যাহ্নভোজ নিয়ে ব্যস্ত অথবা পরবর্তী বিশ্রামের জন্য জাহাজের ডেকের ছায়ার আশ্রয় নিচ্ছিল।

আমরা কলম্বোয় থামলাম। যেসব ভারতীয় শহর আমি চিনি সেগুলোর তুলনায় এটি ছিল পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। কিন্তু দুজন অস্ট্রেলিয়ান তরুণী যাদের এই প্রথম এশিয়া দর্শন হলো, তারা পাটাতনের ওপরে এল, আমেরিকানদের ভাষায়, সাংস্কৃতিক আঘাত (Cultural Shock) খেয়ে, এত দারিদ্র্য, দৈন্য ও নোংরা আবর্জনা তাদের অসুস্থ করে তুলেছে। প্রাচ্যের প্রতি মানুষ ক্রমশ ও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

তারপর শুরু হলো বম্বে থেকে কলকাতায় দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা। আমি ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা স্পেশাল গোছের একটি কামরায়। প্রচুর জায়গা ও আরামদায়ক এবং প্রথমে কেবল আমারই ছিল সেটি। ভূপালে দুজন মুসলিম মহিলা উঠলেন যাঁদেরকে আমার মনে হলো সাবেক অভিজাত রাজপরিবারের বলে। ভ্রমণের জন্য তারা ছেঁড়া পায়জামায়, এলোমেলো সাজপোশাকে থাকলেও তাঁদের চেহারায় ছিল উন্নাসিক আভিজাত্য। তাঁদের ইংরেজি নির্ভুল এবং সাথের পরিচারকদের কামরায় তাঁদের যে-পরিচারকরা ছিল তারা যেন তাদের পেশায় রাজা। আমার মালপত্রে নামের লেবেল দেখে তাঁরা আমাকে আমার যাত্রা ও ভ্রমণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি জাহাজে শিশুদের জন্য ব্যবস্থাপনার কথা জানালাম এবং বিস্ময় প্রকাশ করলাম যে, শিশুদের সেবিকা হওয়া সাহসী ভারতীয় মেয়েদের, যাদের শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ আছে তাদের জন্য একটি নতুন দরজা খুলে দেবে। তাঁরা খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে আমরা সাগরে মুসলিম মহিলাদের পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা চিন্তায় মেতে উঠলাম। মহিলারা যদি কক্ষ পরিচারিকার কাজ করতে পারে তা হলে কেনই-বা তারা জাহাজের ভাঁড়ার-রান্নাঘর, বেতার ব্যবস্থার দেখাশোনা করতে পারবে না? হয়ত পুরো আন্তরিক ছিল না আলোচনাটি। কিন্তু এর মাঝে উচ্চশ্রেণীর মুসলিম নারীসমাজের ভেতরের স্বাধীনতাবোধের প্রতিধ্বনি ছিল পরিপূর্ণভাবে এবং ইংরেজ রেলকক্ষে যে-ধরনের আলোচনা হয় তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম বাক্যালাপ ছিল এটি।

পরের ঘটনাটিও তেমন ছিল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন একজন বৃদ্ধ মহিলা এবং একটি তরুণী, লাল শাড়িপরা। তাঁদের পেছনে পেছনে এল একজন প্রতিবাদী রেলরক্ষী। মনে হলো, তাঁরা 'বিশেষ' এই কামরার জন্য অগ্রিম ভাড়া দেননি। এবং এখন তাঁরা এর জন্য প্রত্যেকে বারো আনা করে বাড়তি ভাড়া দেবেন। তরুণীটি স্বচ্ছন্দে অনর্গল ইংরেজি বলছিল এবং দুষ্টু দুষ্টু চোখ ঘুরিয়ে কামরাটা দেখে নিয়ে নিশ্চিত হচ্ছিল যে, সে শ্রোতাদেরকে ধরে রাখতে পারছে।

সে তর্ক করছিল, অনুরোধ করছিল, হুমকি দিচ্ছিল এবং ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু রক্ষী নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পয়সাটা দিতে হলো। তার শেষ অস্ত্র ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার চেহারাটা ভালো করে দেখে রাখি, আমি একজন ডাক্তার, যদি কখনও অসুস্থ হয়ে আমার হাতে পড়ো—তোমাকে মেরে ফেলব।' রক্ষীটি যথোচিত আত্মমর্যাদা ও কৌতুকের সঙ্গে উত্তর দিল যে, সে পঁচিশ বছর ধরে চাকরি করছে এবং কখনও ডাক্তারের কাছে যায়নি। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই তোমরা আমাদের কাছে আসো। এমনকি আমাদের সাহায্য ছাড়া তোমরা মরতেও পারো না।' মেয়েটি জয়ীর মতো উত্তর দিল। বাদানুবাদের পুরো সময়টা ভূপালের মহিলারা এবং আমি নীরবতা পালন করলাম এবং দু-তিনটি স্টেশন পরে মহিলা দুজন নেমে না যাওয়া পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করলাম না। এর পর আমরা আমাদের মন্তব্য করলাম। সেদিন সন্ধ্যার আগে খাবার কামরাটি সরিয়ে নেওয়া হলো। এবং পরদিন সাড়ে এগারোটার আগে আমরা কিছুই খেতে বা পান করতে পারলাম না। তারপর আমরা একটি এমন বড় স্টেশনে পৌঁছলাম যেখানে খাবারঘর পাওয়া গেল। এরপর কীভাবে যে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী পাল্টে গেল! আমি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা উপভোগ করতে লাগলাম। কলকাতার কাছাকাছি পৌঁছতেই ভূপালের মহিলাদ্বয় স্নানঘরে প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন নরম উজ্জ্বল সিল্কে ভূষিত হয়ে, কেতাদুরস্ত হয়ে, প্ল্যাটফরম থেকে অনুগত গাড়িচালক দ্বারা অভ্যর্থনা পাবার জন্য। আমি তাঁদেরকে আর কখনও দেখিনি।

কলকাতার রুদ্ধশ্বাস ৪টি দিন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল এমন জীবনে সেখানে সব- দিকে নানারকম তত্ত্ব, প্রকল্প, সভা ও তর্ক-বিতর্ক যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অক্সফোর্ড প্রেসে একটি লাভজনক সন্ধ্যা কাটালাম সেখানে টাকার অবমূল্যায়ন পূর্ব পাকিস্তানে বই সরবরাহে যে-সমস্যার সৃষ্টি করেছে সে-ব্যাপারে ও ইংরেজির মান অক্ষুণ্ন রাখার সর্বব্যাপী ইন্দো-পাক সমস্যা নিয়ে শ্রী সেন এবং ওরিয়েন্ট লংম্যানের পক্ষে তার বিপরীত সংখ্যকদের মধ্যে একটি আলোচনা হলো। সবখানেই প্রায় একই কথা—স্কুলের সময়সূচিতে অন্যান্য বিষয়ের চাপে ইংরেজির জন্য সময় কমে যাচ্ছে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মান নেমে গেছে এবং আধুনিক চিন্তার সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে ইংরেজি ভালো করে পড়তেই হবে। কীভাবে? প্রায় বিশ বছর পরও প্রশ্নটি একটি মাথাব্যথা। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য অনেক ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে, ব্রিটিশ কাউন্সিল আধুনিক পদ্ধতি চালু করছে ইংরেজি শিক্ষার এবং নতুন নতুন নিয়মের ওপরে নতুন নতুন বই ছাপা হচ্ছে। এতে অবস্থার উন্নতি হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে কথা হচ্ছে বাষ্পের মতো, বিশাল বিশাল কথার পরিমাণ সারমর্ম করলে ছোট শীতল এক ফোঁটা কাজে রূপান্তরিত হবে এবং যতই বেশি ভাষাসমস্যা জড়িত হচ্ছে, ততই পরীক্ষা দৈত্যের মতো যেন মৃত্যুর ভার হয়ে পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করছে।

শান্তিসভার সংগঠকরা কলকাতায় তাঁদের পরিকল্পনা তৈরি করছিলো। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন আমার পুরনো বন্ধু রেজিনাল রেনল্ডস, যাঁর সঙ্গে আমি একই উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছি, ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি গান্ধীজির আশ্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ফিরে এলে পর। তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়াটা যেন ছিল পুরনো জীবনের সুতোগুলোকে বর্তমানের একটিতে বাঁধা। আমি যখন ভারতের উদ্দেশে রওনা দিই তখন তিনি ইউস্টন প্ল্যাটফরমে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগে আবার তাঁকে আমি দেখি অস্ট্রেলিয়ার পথে এক যাত্রার সময়ে। টেরেন্স মিউক্স নামে বন্ধুদলের একজন তরুণ ছিলেন যিনি ঢাকায় বন্ধুকেন্দ্রের দায়িত্ব নেবেন যত শিগ্‌গির এখানে একটি বাড়ি পাওয়া যাবে।

তখন একটি পিইএন সভাও চলছিল। আমি কোন পরিচয়পত্র ছাড়া অনাহূতের মতো সেখানে গেলাম, এবং নিজেকে দেখতে পেলাম একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে এবং তাঁরা সবাই যেন আমার উপস্থিতিকে যথাযোগ্য মনে করেছিলেন (আমি কখনওই নিজেকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হইনি)। একজন ছিলেন শামসুল হুদার শ্বশুর কাজী আবদুল ওদুদ , যিনি আমাকে তক্ষুনি নাশতা সেরে নিতে বললেন। তিনি 'নিউ ভেল্যুজ' যেটা মাত্র তার দ্বিতীয় সংখ্যায় পৌঁছেছে, তা নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, মুরশিদের প্রথম সম্পাদকীয়টি ছিল প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত ; 'পুরনো মুক্তবুদ্ধির দিনগুলোর মতো। কেবল আমরা যদি এটাকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে পারি, এটা পূর্ব পাকিস্তানকে সাহিত্যের মানচিত্রে জায়গা করে দেবে।'

ফণী মিত্র এলেন এবং আমায় বললেন, আমি যেন চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্রদের কাছে আমার নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞতা ও ধারণা সম্পর্কে বলি। আমি তাঁর কথা মেনে নিলাম। কলেজটি কলকাতার স্বাভাবিক সব ধরনের সমস্যায় ভুগছিল—বিশাল বড় বড় শ্রেণীকক্ষ, যেসব ঘরে দিনের বেলায় মানবিকের ছাত্ররা ক্লাস করতো এবং রাতের বেলায় বাণিজ্যের ছাত্ররা, যারা বেশির ভাগই দিনে বিভিন্ন অফিসে চাকরি করত। প্রচুর খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন যাঁরা এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে ছুটতেন, যাঁদের সামাজিক জীবনের জন্য কোন সময় ও স্থান ছিল না। ফণীকে একান্ত হুকুমবরদারের মতো সঙ্গে নিয়ে ড. রয় বীরের মতো চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন এসব বস্তুগত বাহুল্য থেকে একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলতে।

আমি একটি মুক্তবায়ু সভায় এমন একটি বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে কথা বলছিলাম, যেখানে আমাকে চিৎকার করতে হচ্ছিল। এবং তাঁদেরকে আমি এমন একটি দেশের কথা বললাম যেখানে মানুষ বা পশু কাউকেই অভুক্ত দেখা যায় না, সেখানে কাউকে ছেঁড়া কাপড়ে দেখা যায় না (এমনকি গবাদিপশুরাও শীতের সময় গরম জামা পায়), সেখানে সবার জন্য জায়গা আছে, একই ভাষা এবং একই মানের জীবন তাদের। যেখানে সবচাইতে আশ্চর্য ব্যাপার ছেলেরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বড় হয়ে কৃষক হতে চায়। আমি তাদের চোখে অবিশ্বাস দেখতে পাচ্ছিলাম। তবু আমার মনে হলো, অন্য বক্তৃতাগুলোর মাঝে একটি মজার বিরতির মতো ছিল এটা এবং তারা আমাকে তাদের বিনীত মনোযোগ দিয়েছিল। মিসেস এম এন রায় ছিলেন রেগ রেনল্ডের The White Sahibs in India বইটির অনুরাগী ভক্ত, আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি হলাম যে, তিনি আমাদেরকে কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে তিনি যে-বিদ্যালয়টি তৈরি করছেন সেটা দেখে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং এক রাত সেখানে থাকতে অনুরোধ করলেন। আমার জার্নালে বিবরণ লিখেছি : 'তারাভরা বিশাল আকাশের নিচে খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। জাদুঘর বানানোর জন্য বিশাল একটি ভবন ছিল, বর্তমানে সেটিকেই মিসেস রায় তাঁর স্কুল হিসেবে আংশিক ব্যবহার করছেন। এই জায়গাটিই ব্রতচারী শরীরচর্চা কেন্দ্রও বটে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা ঐতিহ্যবাহী নাচের মুদ্রা ও গান শিখতে আসে। এখন সেখানে একটি ক্যাম্প চলছিল যেখানে পক্ষকালব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল, সকালে আমি তাদেরকে একটি গোলাকার বৃত্তে শরীরচর্চা করতে দেখলাম যা মনে হচ্ছিল অসহ্য দীর্ঘ সময়। তাঁদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষক, কেউ-কেউ ছিলেন কারারক্ষী। দৃশ্যতই সরকার ব্রতচারী নৃত্যকে নবীন অপরাধীদের প্রশিক্ষণের একটি অংশ হিসেবে অনুমোদন করেছিল। তারা তাঁবুর নিচে বাস করত কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে খেত।

মিসেস রায়ের বিদ্যালয়টি তাঁর হৃদয়ে দীর্ঘদিনের একটি ধারণা হিসেবেই ছিল এবং বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু-সমস্যা তাঁকে এই সুযোগটি দিল। তিনি বয়স বারো থেকে আঠারোর ছেলেদেরকে নিতেন আবাসিক হিসেবে। কখনও তারা ছিল উচ্চবর্ণের উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে এবং অনাবাসিক ছেলেরা স্থানীয় হরিজন।

সরকারের কাছ থেকে তিনি সামান্য কিছু অনুদান পেতেন, সাময়িকভাবে সেগুলো নবায়ন করতে হত কিন্তু নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেত। ছাত্রদের জন্য প্রতিমাসে আঠারো টাকা হিসেবে খরচ হত এবং যে পারত মাসিক পাঁচ টাকা হারে বেতন দিত। খুব অল্প টাকাতে পুরো ব্যাপারটা চলত। তাদের ম্যাট্রিক ক্লাসে ঢোকার কথা তখন, কিন্তু তিনি সন্দিহান ছিলেন কেউ পাশ করবে কি না। কিন্তু তারা তাঁত চালানো, ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ ও হাতেকলমে বাগানের কাজে খুব ভাল প্রশিক্ষণ পাচ্ছিল। তারা আনন্দ করার জন্য কিছু খুব মজার ছোট ছোট মাটির পশুপাখি বানিয়েছিল। তারা মাত্রই তাদের নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে তাদের খরচের কিছুটা অংশ তুলতে শুরু করেছিল এবং মনে হচ্ছিল বেশ আনন্দময় একটি গোষ্ঠীজীবন তারা যাপন করছিল। তখনও মিসেস সেন নিশ্চিত ছিলেন না তাদের জন্য বিদ্যালয় শেষে কী ধরনের জীবনের দ্বার খোলা থাকবে।

আমার দেখা ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে, পরীক্ষা পাশভিত্তিক পড়াশোনা ছাড়াও বাস্তব জীবনের উপযোগী শিক্ষার এটিই ছিল প্রথম প্রয়াস। আমি জানতাম, এমন ব্যাপার আছে। কাছাকাছি একটি মৌলিক বিদ্যালয় ছিল—আমরা সেখানে যেতাম ও দেখতাম—সেখানে বারো বছর পর্যন্ত বাচ্চারা পড়তে যেত।

মিসেস সেনের বিদ্যালয়টি ছিল তার পরবর্তী ধাপে কিছু করার চেষ্টা। এবং এর পরে আমার মনে হয় সমবায় কলোনি ধরনের কিছু হবে।

তাঁরা চেষ্টা করছিলেন কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত একটি সমাজ গড়ে তোলার, বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নও নয়, পরজীবীর মতো নির্ভরশীলও নয়। উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল সেই গ্রামীণ দারিদ্র্য থেকেও কিছু একটি করা যেখানে হয়ত বেশির ভাগ লোক প্রজন্ম ধরে বসবাস করতে থাকবে। এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে আমার পেশা সম্পর্কে এখনও অবশিষ্ট আত্মতৃপ্তির মধ্যে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে যায়, এদের সঙ্গে যোগ দেবার আহ্বান না জানিয়েও। আমার বিচ্ছিন্ন কাণ্ডজ্ঞান আমাকে বলে দেয় যে, তারা সঠিক পথে আছে, আর আত্মজ্ঞান আমাকে তিরস্কার করে যে সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে অযোগ্য। আমি পুরনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথেই থাকব। কারণ সেটাই আমাকে মানায়, এমন কোন বড় বিশ্বাস নিয়ে নয় যে তা 'ধ্বংসের শহর' থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।

বড়দিনের ছুটি শুরুর এক সপ্তাহ আগে আমি ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম। দেখতে পেলাম আমার ফ্ল্যাটটি অঙ্কের নতুন জার্মান অধ্যাপক তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে দখল করেছেন। তাঁরা মাত্র দুদিন আগে কোন মালপত্র ছাড়াই এসে পৌঁছেছেন এবং যেহেতু নিচতলায় তাঁদের নামে বরাদ্দ করা ফ্ল্যাটটিতে কোন আসবাব ছিল না তাঁদেরকে সাময়িকভাবে অন্য কোথাও দেয়াও যায়নি। কোনরকমে খুঁজেপেতে আমরা ব্যবস্থা করলাম : একটি বিছানা কেনা হলো, বাচ্চাটির জন্য একটি শিশুখাট জোগাড় করা হলো, ফ্ল্যাটের বিভিন্ন বাসিন্দাদের কাছ থেকে কিছু-কিছু আসবাবপত্র ধার করা হলো, যতক্ষণ না ওঁরা নিজেদের জিনিসপত্র পান। এঁদের আগেও একজন বেড়াতে এসেছিলেন বলে জানা গেল। একজন ইংরেজ, মফস্বল কলেজের একজন অধ্যক্ষ, যাঁর ওখানে আমি একবার গিয়েছিলাম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি পদে যোগ দিতে এসেছিলেন এবং দৈবক্রমে আমার একটি খালি কামরা দখল করে নিয়েছিলেন। বিনয় বাদে বাকি সব গুণ তাঁর ছিল। মদ বা পানীয়ের যোগানদার হিসেবে ঢাকা খুব সুবিধাজনক ছিল না, কিন্তু তিনি ঠিকই খুঁজে বের করেছিলেন এবং সপ্তাহব্যাপী পানোৎসবের পর অনবধানবশত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, যিনি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, তাঁর কার্যালয়ের ঠিক উল্টোদিকের প্রাঙ্গণে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। উপাচার্যের সহ্যক্ষমতার জন্য ব্যাপারটি বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাঁর কলেজে ফিরে গেলেন। ঢাকায় আতিথেয়তাকে নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া হত এবং যে-কোন ইউরোপীয় অপর একজন ইউরোপীয়ের জন্য অবশ্যই একটি শয্যার ব্যবস্থা করত। অতএব এসব অভিযানে খুব চমকপ্রদ কিছুই ছিল না। আবদুল তার অচঞ্চল ও প্রচলিত সৌজন্যবোধ দিয়ে এসব ব্যাপারগুলোকে গ্রহণ করত। কিন্তু যেহেতু আবদুলকে তার পরিবারকে দেখাশোনা করার জন্য বাড়ি যেতে হবে, এম এ ক্লাসের একজন পরিণত ছাত্র মাহমুদ এই উপলক্ষে একজন সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠল। সে রান্নাঘরের মেঝেতে একটি তোশক পেতে শুত। যতদিন না ঐ মাতাল ভদ্রলোক ছিলেন, যাতে কোনক্রমে আগুন লাগা বা ভাঙচুরের মতো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। একটি অদ্ভুত বাড়ি ফেরা বটে, তবুও মনে হলো নিজের জীবনেই যেন ফিরে এলাম।

শান্তি সম্মেলনের দুজন সদস্য, একজন ইহুদি জার্মান ও একজন ফরাসি মহিলা ঠিক মেয়াদ শেষ হবার পরপরই ঢাকায় বেড়াতে এলে শান্তি সম্মেলনে একটি অতিরিক্ত বিষয় যোগ হয়। ড. জ্যানডারস দেখতে চান প্যালেস্টাইনিদের সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃত অনুভূতিটা কী—যে-কোন মুসলিম দেশের জন্য এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুসন্ধান। আমার যদিও সন্দেহ ছিল তিনি একজনও ইহুদিবাদী পেয়েছিলেন কি না, তিনি নিশ্চিত কিছু বন্ধু পেয়েছিলেন। আমার বন্ধু রহমান, সেই আন্দোলনকারী, নিজের চেষ্টা ও উৎসাহে তাঁর তেজস্বিতা প্রমাণ করলেন এই মধ্যছুটির মাঝে ছাত্রদের এক বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী সংগঠিত করে, যারা পূর্ণ সমর্থন দিয়ে মাদাম ত্রোকমের (Trocme) উৎসাহী বিবরণ শুনল অক্রিয় প্রতিরোধ ও জনগণের অসহযোগিতার ব্যাপারে এবং কিছু-কিছু ইউরোপীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে। শ্রোতারা বিষয়টি সম্পর্কে কতটুকু জানে তা তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক সমঝোতা বাড়াতে এর চাইতে ভালো কোনকিছু তিনি করতে পারতেন না। তাঁরা সে-গ্রামে তাঁদের শেষ অধিবেশনে একজন বাঙালি পণ্ডিত কাজী মোতাহার হোসেনকে তাঁদের সাথে নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রসারিত সাদা দাড়ি এবং তাঁর সরলতা, সৌজন্যবোধ ও চিরায়ত বিষয়সমূহে সুগভীর জ্ঞান নিয়ে তিনি যেন দেখতেও আসলেই ছিলেন পূর্ববঙ্গে ইসলামের সারবত্তা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর তিনি যে-বক্তৃতা করলেন সেটি এমনই সম্প্রসারিত ও আন্তরিকতাপূর্ণ যে তা ক্যালকাটা স্টেটসম্যান-এ পুরোটা প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও বিশ্বশান্তির সদস্যবৃন্দ পারস্পরিকভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব্যাপারটি তাঁদের মনে ছাপ ফেলেছিল ভালোভাবেই।

বড়দিনে আমি প্রধান প্রশাসকের (চিফ কমিশনার) বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। কমিশনার সাহেব, পুরনো আইসিএস যিনি দীর্ঘদিন তাঁর চাকরিতে আছেন এবং শিগ্‌গির ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন। আমার জার্নালে এমন মন্তব্য করে নোট লিখেছি :

একটি আনন্দদায়ক সন্ধ্যা। সবসময়েই যেমন হয়, আমি যখন এসব লোকের দেখা পাই আমি যেন দেখতে পাই, যে-পূর্ববঙ্গের কথা আমি ছাত্রদের কাছ থেকে শুনি তাঁরা সে-পূর্ববঙ্গের কথা বলেন না। মিস্টার স্টুয়ার্ট মনে করছেন এই মুহূর্তে দেশটি একটি সমৃদ্ধিশালী সময় অতিক্রম করে যাচ্ছে। তিনি এমন জায়গায় আছেন যে তা জানতেই পারেন। আমি বলতে পারতাম যে ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং দারিদ্র্য জনগণের ওপর চেপে বসছে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চেহারাটা খুবই অশুভ ইঙ্গিত করছে। এর মানে কি আমি বাংলাকে চিনি না?

সত্যিই আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি। নিশ্চয়ই মিস্টার স্টুয়ার্টই সঠিক ; কয়েক বছর আগের দুর্ভিক্ষের কথা তুলনা করলে বা পরে যে-রক্তপাত ঘটেছিল তার সাথে তুলনা করলে এটি একটি সমৃদ্ধিশালী সময় বটে। কিন্তু পৃথিবীর আর কোন দেশেই এটাকে সমৃদ্ধি বলা হবে না এবং সবচেয়ে অলক্ষুনে কথা হলো আশা উদ্দীপ্ত করার মতো কিছুই ছিল না সেখানে।

শিক্ষাবর্ষ শুরু হলো, করণীয় কাজসমূহের স্বাভাবিক জরাগ্রস্ততা নিয়ে। যেন ভুলে যেতে হয় প্রাত্যহিক জীবন কী, যেমন ভুলে যেতে হয় দাঁতে ব্যথার কথা। কিন্তু জানুয়ারির ৮ তারিখের জার্নালে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চাকরিতে কোন প্রথাবদ্ধতার ভেতরে ঢোকার আশা আর নেই। মাত্রই আমি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার এক উন্মত্ত অবস্থার ভেতর দিয়ে এলাম, যা আমাকে একরকম মানসিক অবসাদ এনে দিয়েছে। বক্তৃতা দেয়া ও পড়ানো তুলনামূলকভাবে বিশ্রামদায়ক :

দপ্তরে বসে ক্লাশ বিহীন একটি দিনে অন্য কাজ করার চেষ্টা যেন দুঃস্বপ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মত, যেখানে একটি কাজ অবিরাম অন্যকিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যবসায়ী একটি চিঠি লেখার সময়ে কেউ এসে অন্য কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল এবং এক ছাত্রের জন্য শিক্ষক দেখে দিতে হলো এবং বৃত্তির আবেদন নাকচ করলাম এবং গত বছরে যে অকৃতকার্য হয়েছে তার জন্য সিলেবাস দেখে দিলাম—সবই একই সময়ে করতে হবে। একটি নির্জীব মস্তিষ্ক নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করতে বসলাম পাঠ্যবইয়ের ওপরে, যেগুলোর ওপরে আমি ইতিমধ্যেই কল্পনায় সম্ভাব্য সব রকমের প্রশ্ন করেছি।

অন্য কোন অধ্যাপকের চেয়ে বেশি কিছু আমার করণীয় ছিল না। অসহিষ্ণু চিৎকারগুলো বোঝাচ্ছিল যে আমি প্রশাসক হবার জন্য তৈরি হইনি এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম আর কতদিন আমি সহ্য করতে পারব। এমনও সম্ভব যে, সরকারও ভাবতে শুরু করেছে তারা আমাকে কতদিন সহ্য করতে পারবে। কিছু ছাত্র আমাকে 'একান্ত গোপনীয়' বিষয় হিসেবে জানিয়েছে যে গোয়েন্দা বিভাগ আমার চিঠি মাঝপথে খুলে পড়ছে এবং মনে করছে আমি পাকিস্তানবিরোধী কাজে লিপ্ত। গোপন সেন্সরশিপ যদিও আপত্তিকর, বরং পাকিস্তানি সরকারের কাছ থেকে তা প্রত্যাশিতই ছিল কিন্তু আমার মনে হলো আমার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের কথা আমার ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে গোয়েন্দা বিভাগ তার কর্তব্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছিলাম আমার কী করণীয় হতে পারে। আমার মা চিঠিগুলো খুব উপভোগ করতেন তাই প্রায়ই আমি তাঁকে লিখতাম। আমি এবং মা মোটামুটি সব ব্যাপারে একমত ছিলাম কিন্তু কোনদিনই রাজনীতির বিষয়ে একমত হইনি এবং দীর্ঘদিন হলো তর্ক করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। তাঁর সাধারণ মত ছিল যে, সব চেহারার বা নীতির সব রাজনীতিবিদই হচ্ছে এক-একটি আস্ত বিড়ম্বনা এবং আমি তাঁকে যা আনন্দ দিত তেমন করে লিখতাম, যেমন আমার ঢাকায় আসার বিবরণ। সম্ভবত, সেসব একজন লাল চৈনিক মাও সেতুঙের গৌরবময় অর্জন নিয়ে যে-সুরে কথা বলবে বলে আশা করা হয়, সে-সুরে ছিল না। কিন্তু আমি রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে আমার মায়ের সাথে মিলে কোন ষড়যন্ত্র করছিলাম না, যিনি নিউজিল্যান্ডে তাঁর অরাজনৈতিক ক্ষুধাকে মেটাচ্ছিলেন, অথবা অন্য কোনখানে অন্য কারও সাথে।

যখন জানুয়ারির শেষে আমার মা আমাকে তার করলেন যে, ঢাকায় আমার নিরাপদে পৌঁছানোর কোন খবর তিনি এখনও পাননি তখন ব্যাপারটি হাস্য-পরিহাসের সীমা অতিক্রম করে গেল। যেহেতু সমুদ্র পারের সব চিঠিই করাচি হয়ে যেত আমি সেখানে পোস্টমাস্টার জেনারেলকে চিঠি লিখলাম, এই বলে যে, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তাঁর কর্মচারীদের সবাই আমার চিঠি পড়তে পারেন। কিন্তু আমি এটি একটি সৌজন্যের প্রকাশ বলে মনে করব যদি ঐ কাজটির পর তাঁরা ঐ চিঠিগুলো সঠিক ঠিকানায় পৌছে দেন। অবশ্যই সে-চিঠির কোন উত্তর আমি পাইনি। তবে এর পর থেকে এমন হলো যে, আমার চিঠিগুলো নিয়মিত তাদের গন্তব্যে পৌছুত।

বিভাগে ছাত্র ও শিক্ষক সবাই উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছিল। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে একটি বিব্রতকর চিঠি এল, দৃশ্যত আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন পাঠানো একটি চিঠির উত্তরে। উৎসাহের সাথে চিঠিটি একাত্মতা প্রকাশ করেছে আমাদের সাথে, যে, আমাদের অবশ্যই ওয়ার্ডসওয়ার্থ শতবর্ষ পালন করা উচিত এবং স্মারক রচনা সমৃদ্ধ একটি ছোট গ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত। কাউন্সিল আবার সামনের গ্রীষ্মে ওয়ার্ডসওয়ার্থ উৎসব পালনেরও প্রস্তাব দিল। তারা একজন প্রতিনিধি পাঠাবে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রদর্শনীর জন্য জিনিসপত্রসহ, প্রতিকৃতি লেখা ও ছবির মুদ্রণ, গ্রাম ও নদীর ছবি এইসব নিয়ে, কবিতা আবৃত্তি ও রচনার জন্য এরা পুরস্কারও দেবে। আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের গীতিকবিতা গুলো বাংলাতে অনুবাদ করার চেষ্টাও করতে পারি। নিঃসন্দেহে এমন প্রস্তাব আমার নিজের থেকে না করাটা অসাবধানতারই লক্ষণ ছিল ; তবু আমার মনে হলো যে-ই করে থাকুক-না কেন তার বিষয়টি জানানো উচিত ছিল। কিন্তু আমি যখন প্রভাষকদেরকে চিঠিটা দেখালাম তারা যেন আমার চাইতেও বেশি হতভম্ব হয়ে পড়ল, কেউই তারা এ-ব্যাপারে কিছু জানে না। শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখা গেল দ্বিতীয় বর্ষের একজন উৎসাহী ছাত্রের কাণ্ড এটা, যে মনে করেছিল যে আমরা আমাদের কর্তব্যপালনের একটি উপলক্ষকে বিস্মৃত হচ্ছি। এরকম গরমে এবং পরীক্ষার ঠিক আগে-আগে একটি উৎসব আয়োজনের সম্ভাবনায় আমরা কেউই খুব আনন্দিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা সবাই একমত হলাম যে, এমন প্রতিশ্রুতিশীল একটি উদ্যমকে নিরাশ করা খুবই রূঢ়তার পরিচায়ক হবে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এগিয়ে যাবার এবং তরুণ জাহেদীকে প্রদর্শনীটি আয়োজনের দায়িত্ব দিলাম। আমি নিজেকে, নিজেরই বিস্মিত মনের সামনে দেখতে পেলাম, 'ওয়ার্ডসওয়ার্দিয়ান মানুষ' নামে রচনা তৈরি করতে।

'বন্ধুসেবা' বাড়ি খুঁজে পেল এবং টেরেন্স মিউক্স দুই মার্গারেটকে নিয়ে—মার্গারেট জোনস ও মার্গারেট ও ব্র্যাডলি—এসে পৌছুলেন ও কাজ করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। কিছু ছাত্র, যাদের মধ্যে খোরশেদ ও রহমান ছিল, তক্ষুনি কেন্দ্রের মধ্যে নানা সম্ভাবনা দেখতে পেল। ছোট ছোট দল ইতিমধ্যেই শহরে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। তারা পাশে পেছনের রাস্তায় একটি পাঠগৃহ খুলবে এবং যদি উৎসাহী ছাত্রছাত্রী পায়, নিরক্ষরদের জন্য সান্ধ্য ক্লাস খুলবে। তাদের মধ্যে ক'জন নতুন সাক্ষরদের জন্য একটি পত্রিকা ও সাময়িকী বের করার চেষ্টা করছিল। আমাকে বিলেত নিয়ে কিছু গল্প লিখতে অনুরোধ করা হলো, যেগুলো তারা খুব সহজ বাংলায় অনুবাদ করে দেবে। এটা ছিল সমাজসেবা এবং দেশপ্রেমের তীব্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রোতে আপ্লুত এবং এ-ব্যাপারটিতে হাত লাগাতে প্রস্তুত অনেকেই। ব্যাপারটি আরও একজন পৃষ্ঠপোষককে আকৃষ্ট করল। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি --- বিভার, যিনি ছিলেন ইংরেজ অভিভাবকের বাঙালি সন্তান, দোভাষী, তিনি একটি প্রতিশ্রুতিশীল পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন : কমবেশি 'বেসিক ইংলিশ' বা 'মৌলিক ইংরেজি' নিয়ে নবিশদের বাংলা শেখানোর জন্য।

শ্রেণীকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে নানা ধারণা, উৎসাহ ও উদ্যম ছিল বাস্তবায়িত করার মতো। ছাত্রদের ও শিক্ষকদের উভয়ের দিক থেকেই উদ্যোগ ছিল এবং তাতেই পরিবেশটি কাজ করার ও কথাবার্তা বলার জন্য খুব উদ্দীপক হয়ে উঠল। অর্ধেক সময় আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিলাম, আমি কতটা চাপ সহ্য করতে পারব এবং সারাক্ষণই মনে-মনে ভালোভাবে জানতাম যে, আমি থাকতে চাইতাম, কারণ এখানকার সঙ্গটি ছিল ছেড়ে যাওয়ার জন্য বড্ড বেশি ভালো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

ধর্মীয় উন্মত্ততা

১৯৫০ সালের জানুয়ারির কোন এক সময়ে গত বছরের এম এ ছাত্রদের একজন বাগেরহাটে তার নতুন নিযুক্তির কর্মস্থল একটি কলেজ থেকে লিখে জানাল তার সেখানে কতটা ভালো লাগছে। অধ্যক্ষ (একজন হিন্দু ব্যক্তি) এমন একজন ব্যক্তি যাঁর অধীনে কাজ করতে পারাটা একটি সুযোগের মতো। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য তিনি অনেক কষ্ট করেন, তাদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মেশেন ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। শহর ও কলেজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। অধ্যক্ষ গাঙ্গুলী সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম সেসবের সঙ্গে প্রশংসাবাক্যগুলো মিলে যাচ্ছে, কিন্তু হোসেনের চরিত্রের সঙ্গে তার এই উচ্ছ্বসিত সুরটি মিলছিল না : সে ছিল খুবই বুদ্ধিমান ও শক্ত প্রকৃতির, যে আবেগে ভেসে যেত না। কিছুদিন পরেই যখন পত্রিকায় খবর এল যে বাগেরহাটে গোলমাল চলছে এবং তাদেরকে আখ্যায়িত করা হলো হিন্দু বিক্ষোভকারী বলে তখন আমার মনে হলো ও হয়ত এই সূক্ষ্ম উপায়টি বেছে নিয়েছে আমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যে যে-যা পড়ব তা-ই যেন বিশ্বাস না করি। কিছু স্থানীয় গোলমাল চলছিল, কিন্তু তার কারণ ধর্ম নয়, কর বা খাজনা।

মাঝে মাঝে যখনই সামাজিক অস্থিরতা বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে তখনই হিন্দু বিক্ষোভকারীদের কথা বলা হয়। এটা খুব গতানুগতিক বিশ্বাস যে, আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে বিনষ্ট করতে বাইরের হুমকির মতো আর কোনকিছুই নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা একটি ইসলামি রাষ্ট্রের অংশ হতে চেয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা হয়ত বৈষয়িক দিক থেকে লাভ করেছে অল্পই, কিন্তু হারিয়েছে বেশি, হয়ত তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রকাশ্য হেয় দৃষ্টিকে ঘৃণা করে কিন্তু তারা আবার হিন্দুদের পুনরুত্থানও চায় না। ইসলাম বিপন্ন এই ধুয়া সরকারের দিক থেকে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে সরিয়ে দিতে পারে। সরকার এই বিপদটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে। পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট বড় একটি সংখ্যায় হিন্দু সংখ্যালঘুরা বাস করে যাদের নিজেদেরকে সুখী বা নিরাপদ ভাবার কোন কারণ ছিল না ; একই ভাষা দেশটিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়েও বেশি কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ছিল (তাদের অপ্রশমিত ঔদ্ধত্যই যে আরও শক্তিশালী বাধা ছিল তারা তা দেখতে পাবে এমন আশা করা যায় না), অরক্ষণীয় সীমান্ত। আমার অনবহিত বিচারবুদ্ধির কাছে যা সঠিক বলে মনে হয়েছে তাতে আমি বিশ্বাস করি না যে ভারতের পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে কোন অভিসন্ধি আছে অথবা এমন একটি সমস্যাসংকুল প্রদেশকে উপহার হিসেবে পেলে সে খুব খুশি হত, কিন্তু যদি ধরেও নিই যে খুশি হত, তা হলে ভয়ের কারণ ছিল। ভারতেও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ছিল, যা কিনা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডেই প্রমাণ হয়েছে। জওহরলাল নেহরু ও তাঁর সরকার একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু তবুও ঐ কারণ সত্ত্বেও তাঁরা হৃদয় থেকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে নেননি, যদিও দেশবিভাগের সময়েই তাঁরা সেই বিভক্তিকে সমর্থন করে এই অধিকারকে মেনে নিয়েছেন। এবং এই মনোভাব তাঁদের প্রত্যেক কাজকর্মেই প্রকাশ পাচ্ছে। দুটো দেশই একে অপরের জন্য ক্ষতিকর ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। আমি কোনটাই বিশ্বাস করি না— এবং করিওনি সেই সময়ে—যদিও সন্দেহ তখন বাতাসে ভাসছিল যে, পাকিস্তান সরকার একটি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে, সে চাচ্ছে নিজের দেহ থেকে অসন্তোষের শিরশ্ছেদ করতে। কিন্তু অসন্তোষ প্রশমিত করার বদলে 'ইসলাম বিপন্ন' এই চিৎকার করে যেন পরিবেশের মধ্যে বিস্ফোরক বায়ুই ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যাহোক, এ সবই জল্পনা, কল্পনা। আমি জানি না, দলীয় বৈরিতা কীভাবে তৈরি হয়, সব সমাজেই যা সুপ্ত থাকে সর্বকালে, কখনও যা হত্যাকাণ্ডেও রূপ নেয়, কখনওবা নেয় না। প্রত্যেকেরই জন্মগত প্রবণতা থাকে এসবের জন্য খারাপ লোকের গোপন ষড়যন্ত্রকে দায়ী করার : এই প্রবণতাটি অন্ধ কিন্তু তার মানে এ-ও নয় যে, খারাপ লোকেরা কোথাও নেই। কেবলমাত্র প্রত্যেকের স্বার্থের ও পারস্পরিক সন্দেহের পরস্পর বিরোধীতাই তাদেরকে ছাড়াও আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। ঠিক কীভাবে ১৯৫০ সালের এই রক্তপাতের সূচনা হয়েছিল আমি তা-ও ঠিক জানি না, যদিও আমি ঘটনাস্থলেই ছিলাম এবং অনেকেরই মতো সত্য জানার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পরস্পর বিরোধী প্রতিবেদনের সংখ্যা খুব বেশি ছিল, খুব বেশি গুজব যা সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, অতিরঞ্জিতও হতে পারে, যে-কারণে আমরা কেউই সত্যটাকে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন আমি কী কী দেখেছি ও ভেবেছি আমি বলতে পারি, এবং অন্যদেরকে কী বলতে শুনেছি তা-ও, কিন্তু বেশির ভাগটাই হবে একটি ধাঁধার মতো, যেহেতু অনেক কাগজই হারিয়ে গেছে, অনেকগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জার্নাল : শুক্রবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ : গতকাল যখন গুহঠাকুরতা অফিসে ছিল, কালীপদ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল এখন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়া খুব বুদ্ধির কাজ হবে কি না। ও বলেছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে ওর কোয়ার্টারটি সুবিধার নয় এবং ও খুব উদ্বিগ্ন। যখন গুহঠাকুরতা আমাকে সেকথা ভাষান্তর করে বলল আমি কালীপদকে বললাম যে, যদি কোন সমস্যা হয় আমি এসে ওর বাড়িতে বসে থাকব, আমার মনে হয় আমি থাকলে কেউ ওর বাচ্চাদেরকে কোন উৎপীড়ন করতে পারবে না। গুহঠাকুরতা এবং আমি কিছু কথাবার্তা বললাম। আমার মনে পড়ছে, আমি বলেছিলাম যে আমার মনে হয়নি যে ঢাকায় কোন হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে : সে একমত হলো কিন্তু বলল যে আবহাওয়া নিশ্চিতভাবেই খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে, সীমান্তের দুদিক থেকে এসব খবর দুদিককে উত্তপ্ত করে তুলছে।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বিভাগীয় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে ১৯৪৮ সালে। পদটির জন্য সে-ই ছিল যোগ্যতম প্রার্থী কিন্তু যেহেতু সে হিন্দু তাকে নিযুক্ত করতে আমাকে প্রচুর যুদ্ধ করতে হয়েছে। অন্যসব হিন্দুদের মতোই তাকেও অঙ্গীকারপত্র দিতে হয়েছে যে, সে অন্তত দুবছরের আগে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করবে না। সত্যিই সে কখনও ত্যাগ করেনি এ-বিশ্ববিদ্যালয়কে। সে ছিল একজন চমৎকার সহকর্মী, এবং ছাত্ররা আমাকে সবসময়েই বলে আসছিল, প্রথম মানের একজন শিক্ষক ছিল সে। তার স্ত্রীও কম জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন না। মেয়েদের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের তিনি অধ্যক্ষা ছিলেন। ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকায় পড়াশোনা করার জন্য প্রভাষকরা একটি পর্যায়ে সবেতন ছুটি পেতেন। বেশির ভাগ মুসলিম প্রভাষক যথেষ্ট তাড়াতাড়ি তা পেয়ে যেতেন। কিন্তু গুহঠাকুরতাকে, যেহেতু সে হিন্দু, তার পালার জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং যখন ছুটি পেল তা-ও অর্ধবেতনে, এই কারণে যে, যেহেতু সে হিন্দু, বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিত নয় সে ফিরে আসবে কি না।

আমার মনে হয়, যদি বাসন্তী তখন তাঁর স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে না যেতেন এবং তাঁর পড়ার সময়টিতে স্কুলে পড়িয়ে সংসার না চালাতেন তা হলে তাঁকে হয়ত ইংল্যান্ডে না খেয়েই থাকতে হত। কলকাতা থেকে ছুটির সময়ে ১৯৫৮ সালে সেখানে তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ইংল্যান্ডে ভালো শিক্ষকের সংকট ছিল এবং তাঁদেরকে সেখানে থেকে যাওয়া থেকে বিরত করার মতো কিছুই ছিল না, এমন কোন সম্ভাবনাও ছিল না যে ঢাকায় তাঁদের জীবন দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে বা ছাত্ররা ছাড়া কেউ তাদের কাজকে মূল্যায়িত করে স্বীকৃতি দেবে: একমাত্র কাজের প্রতি নিষ্ঠাই তাঁদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল। এটি আমি লিখছি স্মৃতিকথা হিসেবে। কারণ ১৯৭১ সালের বসন্তে যখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তখন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

কালীপদর আকস্মিক প্রশ্নটি ছিল আমি যে-সমস্যার কথা শুনছিলাম তার প্রথম সংকেত ; যেমন মাঝে মাঝে হয়, গরিবরাই আসন্ন বিপদের গন্ধ পায়। গুহঠাকুরতা অল্প অল্প জানত, কিন্তু সে নিজেও খুব চিন্তিত ছিল না এবং মুসলিম প্রভাষকরা আমার মতোই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। ঐ শুক্রবারের ডায়েরিতে ফিরে যাইঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমি সারা সকাল বাড়ি ছিলাম, সুতির একটি জামা বানানো শেষ করলাম। একটি দিন ছুটি পেয়ে খুশি লাগছে। তিনটার দিকে মাহমুদ এল। ফেনিয়ে-ওঠা খবর নিয়ে। খবর এসেছে যে, ফজলুল হকের ভাইপো, পশ্চিমবঙ্গের একজন সরকারি কর্মচারী, তাঁকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে, বরিশালে সংঘটিত কোন ঘটনার খবর পেয়ে। কলকাতায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্য। কারফিউ দেয়া হয়েছে। ঢাকায় ক্রুদ্ধ মিছিল হচ্ছে, পুলিশ ও সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে এবং নবাবপুর রাস্তা (বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে মূল রাস্তা যেটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে গেছে) খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

আমি কথা দিয়েছিলাম, যদি 'বন্ধুসেবা'র বাসায় যেতে পারি তবেই নিচে নামব। বন্ধুসেবার বাড়িটি কায়েতটুলি পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই। সেখানে একটি সভা হবে। সেখানে মিস্টার বিভার বয়স্কশিক্ষার কিছু পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবেন। আমি তাই গেলাম এবং পথে কালীপদর বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে ওর সঙ্গে দেখা করে গেলাম। ওর বাচ্চার পাল এবং অন্য চাপরাশিরা ও তাদের পরিবার আমায় সম্ভাষণ জানাতে বেরিয়ে এল। সে আমাকে জানল যে, ঐ রাতে ওর কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু পুরো অবস্থাটা খুবই খারাপ এবং সে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছে। আর কখনও ফিরবে না। আগামীকালও নয়। সে খুবই দুঃখিত, কিন্তু বাচ্চাদের কথা তো ওকে ভাবতেই হবে।

আমি কায়েতটুলি গেলাম। একদল লোক উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। পথ জানা ছিল না বলে বারবার জিজ্ঞেস করতে হয়েছে : প্রত্যেকে বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছে। একজন তরুণ আমাকে যেতে মানা করলো কিন্তু আমি যখন জানালাম যে আমি যাচ্ছি, সে নিজের পথ ছেড়ে আমার সঙ্গে এল। সে মুসলমান এবং পাকিস্তান অবজারভার অফিসে চাকরি করে। সে বলল, ঐদিন ঐ অফিসে কিছু লুটপাট হয়েছে এবং সাবধান করে দিল যে আমি ফেরার সময়ে অসুবিধায় পড়তে পারি।

টেরেন্স ও দুজন মার্গারেটই সেখানে ছিল ; শামসুল হুদা ও তার ভাই হায়দার এসেছিল। বিভার ও তার একজন বন্ধু কর্নেল লিন্ডলে মাত্রই পুলিশ ফাঁড়ির বাইরে তাঁদের গাড়ি পার্ক করছিলেন। জ্যোতির্ময়ের আসার কথা ছিল কিন্তু এল না। কেরামতও নয়। হয়ত ও ওর হিন্দু বাড়িওয়ালীকে পাহারা দিচ্ছে। বিভার ও লিন্ডলে নবাবপুরের রাস্তায় একটি লোককে মৃত পড়ে থাকতে দেখেছে।

আমরা একটু চা খেলাম ও কথা বললাম কিন্তু বয়স্কশিক্ষার বিষয়ে আলাপ করার উৎসাহ পেলাম না। শামসুল হুদা কলকাতায় তার স্ত্রী ও শ্বশুরের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। আমি কালীপদর কথা ভাবছিলাম : আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, আগামীকালই তার পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়া শারীরিকভাবে অসম্ভব— দুদিকেই উদ্বাস্তুর ঝাঁক দেখা যাবে। বিভার জানাল, কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সন্ধ্যার আগেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। সে হায়দার ও শামসুল হুদাকে গাড়ি করে নিয়ে গেল এবং টেরেন্স ও আমি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে জ্যোতির্ময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। পথে আমি বিভারের শিক্ষাপ্রকল্প সম্পর্কে কিছু জানতে পেলাম। সে কাজ করে বের করেছে যে, তিনটি স্বরবর্ণ ও খুব অল্পসংখ্যক কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ শিখে এবং তার ব্যবহার করে একজন লোক পঞ্চাশ শতাংশের চেয়ে বেশি সাধারণ বাংলা শব্দ পড়তে পারবে। সে সফলভাবে এটা চেষ্টা করে দেখেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রকল্পটি সরকারের ভ্রূকুটির মুখোমুখি হতে পারে এবং হচ্ছেও, যে কিনা আরবি হরফের প্রচলন করতে চায় এবং সেজন্যে তার সরলীকৃতরূপ দেওয়ার কোন চেষ্টাও করা হয়নি।

পথে আমরা কোনকিছুই ঘটতে দেখিনি—কেবল কিছু লোকের দাঁড়ানো জটলা ছাড়া। জ্যোতির্ময় ও তার স্ত্রী বাড়িতেই ছিল। দুজন মুসলিম বন্ধু ছিলেন তাদের সঙ্গে, একজন জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক, যাঁর নাম আমি মনে করতে পারছি না। জ্যোতির্ময় বলল যে, এ-পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল এবং সে তার পরিবারের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিল ; হয় কোন মুসলিম বন্ধুর বাড়ি যাবে অথবা ভারতীয় হাইকমিশনারের ওখানে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সে আতঙ্ক ছড়াতে চায় না। জগন্নাথের শিক্ষকটির সঙ্গে আমরা বিদায় নিলাম। অপর মুসলিম বন্ধুটি রয়ে গেল যদি তাকে কোন প্রয়োজন হয় তাই। আমরা অন্য পথে ফিরতে চাইলাম। ছোট ছোট কিছু বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখনও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। একজন হিন্দু শিক্ষক, প্রিয়নাথ স্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন। জানালেন, তিনি স্টেশনে যেতে চান, সেখানে তাঁর স্ত্রীর ৬টার ট্রেনে পৌঁছানোর কথা। আমরা তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলাম (আশপাশে লোকদের জটলা দেখে আমরা অবাক হইনি যে, তিনি একা ধুতি পরে যেতে ভয় পাচ্ছেন)। পথে আমাদের মুরশিদের সঙ্গে দেখা হলো, যে অসুস্থতার জন্য ছুটিতে ছিল কিন্তু এক্সরে করাতে হাসপাতালে যায়নি। আমাদের সঙ্গে ও কিছুদূর হেঁটে এল, জানাল যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষকের পরিবারকে একটি লুণ্ঠনকারী দলের হাত থেকে রক্ষা করছিল। সে বলল, যে, সে সেখানে একবার বাধা দিয়েছে তাই ঐ জায়গায় আবার দেখা দেওয়া তার জন্য ভালো হবে না। সে অন্যপথে অমিয় চক্রবর্তী (আমাদের বিভাগের একজন হিন্দু সহকর্মী) কেমনভাবে আছেন দেখে যাবে বলে চলে গেল।

আমরা যখন মূল রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একজন পুলিশ আমাদের আটকাল। হিন্দু মালিকানাধীন একটি কেমিক্যাল কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বড় বড় হোসপাইপ দিয়ে পানি দিয়ে সেটা নেভানোর চেষ্টা করছে। আমাদের ওটার পাশ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়, বরং মাঠের ওপর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে হেঁটে যেখানে রাস্তাটা রেলওয়ে ক্রসিঙে মিশেছে সেখানে যেন উঠি। রেলওয়ে ক্রসিঙের দিকের রাস্তায় যাবার সময় হঠাৎ করে হিন্দু ভদ্রলোক খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলেন।

তিনি বললেন যে, তিনি আর স্টেশনে যেতে চান না। আমরা কি অনুগ্রহ করে তাঁকে আবার স্কুলে পৌঁছে দিতে পারি? আমি অন্যদের সঙ্গে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে আসতে কিছুটা ইচ্ছুক ছিলাম যেহেতু সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু টেরেন্স আমার সঙ্গে আসতে চাইল এবং জগন্নাথের শিক্ষক একা ঐ ভদ্রলোককে রক্ষা করতে পারবেন মনে হলো না। তাই আমরা সবাই গেলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম না তাঁর স্ত্রী কী করবেন ; হয়ত তিনি নিজেই নিজেকে সামলে নেবেন। স্টেশনে উদ্বাস্তুরা আসছে যাচ্ছে, অনেক অনেক গল্পে ভরা তাদের সে যাওয়া-আসা কোন হিন্দু ভদ্রলোকের জন্য মোটেও সুখকর স্থান নয়। ফেরার পথে হঠাৎ আমরা নবাবপুর রাস্তার কোণে মানুষের পায়ের শব্দ পেলাম। পুরো জনতার নয়, কিন্তু বুঝতে পেলাম না তারা কি কোন অঘটন ঘটাতে দৌড়ুচ্ছে না তার থেকে পালাচ্ছে। অন্ধকার বাংলো পেরিয়ে আমরা দেখতে পেলাম বিভার এবং লিন্ডলে বসে আছে। আমরা তাদের কাছে গেলাম। তারা আরও একটি মৃত মানুষকে দেখেছে। তারা আমাদেরকে গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইল এবং রেসকোর্সের পথ ধরল। ভেবেছিল সেখানে জনতার ভিড় কম হবে।

একসার বাড়ির পাশে একটি চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। দুজন বড় মানুষ একটি ছোট মানুষকে মারছিল এবং একজন ইংরেজ, তাঁকে আমি কোথাও দেখেছি, হয়ত ক্লাবে— মনে হলো তত্ত্বাবধান করছে। গাড়ির জানালা দিয়ে লোকেরা বোঝাল যে কিছু মহিলা লাঞ্ছিত হয়েছে এবং পুলিশ লাঞ্ছনাকারীকে ধরছে। মহিলাদেরকে পুলিশের গাড়িতে করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আওয়া হয়েছে।

আজ সারাদিনে যা গোলযোগ দেখেছি, এই তার সব। যখন বাড়ি ফিরে এলাম জানতে পেলাম যে আবদুল তিন হাজার উদ্বাস্তু মহিলার গল্প শুনেছে, যাদের স্বামীদের মেরে ফেলা হয়েছে। তাঁরা বিহার থেকে আসছে এবং শহরে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে। মাহমুদ এল। সে ব্রিটানিয়া সিনেমার কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। ও ভেবেছিল হ্যামলেট ছবিটা আবার দেখবে কিন্তু সিনেমা হলটি ভাঙচুর হয়েছে, ছবি বন্ধ হয়ে গেছে। ও জানাল, ময়মনসিংহ থেকে প্রায় শ'খানেক বা আরও বেশি লোক এসেছে গোলযোগ করার জন্য। খোরশেদ এল। এসএম হলের কিছু ছেলে একটি শান্তিবাহিনী তৈরি করতে চেয়েছিল। অন্যরা আপত্তি করেছে এই বলে যে, এটা অর্থহীন। সে রেসকোর্সে ছিল এবং দেখেছে হিন্দুরা প্রার্থনা করার সময়ে সেখানে একটি মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি, যেটা পুলিশের ভিড়ে ঘেরা ছিল, সেখান থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখা গেলেও পুলিশ কিছুই করেনি। এবং সে দেখেছে পুলিশ উন্মত্ত জনতাকে আরও উস্কে দিচ্ছে খারাপ কাজগুলোতে। সে রিকশাওয়ালা এবং আরও অনেককে দেখেছে যারা এসব হত্যাকাণ্ড ও লুটপাটে অংশ নিয়েছে এবং গর্ব করে প্রকাশ্যে সেকথা বলছে।

খোরশেদের ভাষ্য হচ্ছে, যখন কলকাতার দাঙ্গা এবং হত্যার খবর ঢাকায় সচিবালয়ে এসে পৌঁছুল তখনই এখানে গোলযোগ শুরু হল। কেরানিরা কলম থামিয়ে দিল এবং মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করল। তখন কিছু হিন্দু দোকান লুটপাট হলো, মালিকরা আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুড়ল এবং চারজন মুসলিম গুলিতে মারা গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ্ডাদের জনদরদি হৃদয়ের জন্য ঢাকায় মুসলিমদের গুলি করে হত্যা করা যায়— এ-সত্য খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল— তা ছাড়াও তারা কিছু লুটপাট করার জন্য তৈরিই ছিল।

সাড়ে ৫টার দিকে টেরেন্স যখন বাইরে আমার সঙ্গে তখন খোরশেদ বন্ধুসেবার ওখানে গিয়েছিল। ও দুই মার্গারেটকে দেখেনি—আমি ভাবছিলাম ওরা কি বাইরে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য গেছে? কিন্তু ও দেখতে পেল যে সেই এলাকায় তক্ষুনি কেবল একজন লোককে হত্যা করা হয়েছে।

রাতের খাবার পর উত্তর দিক থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। ছাদ থেকে দেখতে পেলাম বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড যা মনে হচ্ছে ভারতীয় হাইকমিশন (পাকিস্তানি হাইকমিশনকে কলকাতায় আক্রমণ করা হয়েছিল)।

আমি শামসুল হুদাকে বললাম সে যেন ফেরার পথে কালীপদর সঙ্গে কথা বলে এবং ওর কী পরিকল্পনা তা জেনে নেয়। যদি সত্যিই তেমন কিছু থেকে থাকে আদৌ।

ওর ঐ পরিবার সঙ্গে নিয়ে, আগামীকালই পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করার ধারণাটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু সে যদি মনে করে সে তা করতে পারবে তা হলে ওকে থাকার জন্য জোর করাটা ভুল হবে।

আজকের রাতটা বিপজ্জনক। মনে হচ্ছিল যদি সত্যিসত্যিই তেমন করার ইচ্ছাও থাকে তবু পুলিশের পক্ষে এসব গলিতে কারফিউ বলবৎ রাখা সম্ভব হবে না। আমি যতটুক বুঝতে পারি যদি পুলিশ ও বন্ধুভাবাপন্ন মুসলিমরা সাহায্য না করে হিন্দুরা অসহায়। তারা যথেষ্ট শান্তিকামী, তাদেরকে তা হতেই হচ্ছে। আবদুল খুব খুশি যে একটি মুসলিম কোয়ার্টারে ওর পরিবার ভালোই আছে— এবং সে ভাবছে যে মুসলিমরা যা-কিছুই করছে তা কেবলই প্রতিশোধ। ও স্বীকার করল যে হিন্দুরা চারজন আক্রমণকারীকে গুলি করে উচিত কাজ করেছে। এখন মধ্যরাতে সবকিছুই যথেষ্ট শান্ত। কোন চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে না— কেবলমাত্র মাঝে মাঝে লরি ছুটে যাবার শব্দ।

ক'দিন পর আমরা জানতে পেলাম যে ফজলুল হকের ভাইপোকে আক্রমণ করা হয়নি। কিন্তু নিশ্চয়ই বেতারে খবরটা এসেছিল এবং তাতেই গোলাগুলি ও লুটপাটের সূত্রপাত হয় যা আবার কলকাতায় প্রতিক্রিয়া রেখেছে। কোথা থেকে খবরটা এল? আমি জানি না। যেমন জানি না মাহমুদের সেই ময়মনসিংহ থেকে শ'খানেক হাঙ্গামাকারীর আসার খবরটির ব্যাপারে (যা হয়ত সত্য হতেও পারে)। আরো জানিনা আবদুলের তিন হাজার বিহারী মহিলার ব্যাপারটি— সংখ্যাটি এমনই বড় যে তাকে ছোট করে ভাবাই যায় না, এবং বিহারে এমন বিরাটসংখ্যক মুসলিমের হত্যাকাণ্ড, সেইসব দাঙ্গাকারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যারা মহিলাদের বীরোচিতভাবে ছেড়ে দিয়েছে, এগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে আগামীকালের পত্রিকার শিরোনাম না হয়েই যায় না। কিন্তু পরে একজন ঠাণ্ডামাথার সহকর্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন একদল মহিলাকে ঢাকার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাদের বসন বিস্রস্ত, নিজেদের জখম দেখিয়ে যারা প্রতিশোধের জন্য চিৎকার করছিল। এমনটি হতে পারে, কিন্তু যদি এমন হয়েই থাকে, তাবুও মনে হচ্ছে এটা একটি সাজানো প্রদর্শনীও হতে পারে। প্রতিশোধের ন্যায়যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার জন্য। ঢাকায় কয়েকশো বিহারি মুসলিম আছে, যারা দেশভাগের সময় এসেছে। তাদের অনেকে এখনও পরিত্যক্ত রেলগাড়ির বগিতে বাস করে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কিছুই করা হয়নি, তাদের কোন কাজকর্মও দেয়া হয়নি, তাই তারা এখন গুণ্ডা, ফকির ও চোর—দাঙ্গা বাধানোর জন্য চমৎকার উপাদান।

নিশ্চিত করে যা বোঝা গেল,তা হলো কালীপদ বেতার-ঘোষণার আগেই বিপদের আঁচ পেয়েছিল এবং যদি ঐসব মহিলা এসেও থাকে, তারা আসার আগেই। গুজবের জন্য বাংলা একটি উপযুক্ত দেশ, কিন্তু তবু কিছু মুহূর্ত থাকে তা কেবল বাংলাতেই নয়, যখন বাস্তব,কল্পনা ও অনুমান সবকিছুর একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কে জানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ট্রেনে বোঝাই রাশান সৈন্যদের উত্তরপূর্ব রেলওয়ে ও লন্ডন হয়ে আর্কঅ্যাঞ্জেলের দিকে (আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল যে তখনও তাদের পায়ের জুতোয় খড় লেগে ছিল) আসার সময় ফ্রান্সে জার্মানিদের আক্রমণ করার অবাস্তব কাহিনীর পেছনে কী কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল?

সে-রাতে আমি যে আগুনের কুণ্ড দেখেছিলাম তা ভারতীয় হাইকমিশনের চেয়ে আমার বাড়ির অনেক কাছাকাছি। সেটা ছিল নীলক্ষেতের রাস্তায় কিছু কুঁড়েঘর, যার একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্ডের কেরানীর। সে রেজিস্ট্রার সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল।

পরদিন শনিবার সকালে যেহেতু বাড়িতে থাকার জন্য কোন নির্দেশ দেয়া ছিল না, আমি কলেজে যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলাম, তখন এক মুসলিম ভদ্রলোক, শান্ত রোগাটে চেহারা, লম্বালম্বা কুঞ্চিত দাড়ি, গেট দিয়ে ঢুকলেন। মুহূর্তখানেক পরে তাঁকে চিনতে পারলাম, মফস্বলের একটি কলেজের উপাধ্যক্ষ, যাঁর ওখানে আমি গত বছর গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে ও ইংরেজ অধ্যক্ষকে নাশতা খাইয়েছিলেন।

তিনি একটি নালিশ নিয়ে এসেছেন। এক তরুণ, যে মাত্র সাত মাস হলো কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে, তাঁকে সরিয়ে উপাধ্যক্ষ হতে চায় এবং জেলা প্রশাসকের কাছে এই পরিবর্তন দাবি করে লিখেছে, অধ্যক্ষকে পাশ কাটিয়ে। অধ্যক্ষ মহোদয় (যদিও আমি জানি যে তাঁর উপাধ্যক্ষ সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা ছিল না), এই ধরনের কৌশল মেনে নেবার লোক নন। এই ক্ষুব্ধ লোকটিকে আমার কাছে একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁকে উপাচার্যের কাছে নিয়ে যাবার ও ব্যাপারটি পরিষ্কার করার অনুরোধ জানিয়ে।

আমি যখন তাঁকে বললাম যে আজকের দিনটি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ শোনার ঠিক অনুকূলে নয় তখন তিনি উত্তর দিলেন যে যেহেতু তিনি মুসলমান, তাঁর কোন বিপদ হবে না। রাতটা তিনি ঢাকার একটি হোটেলে কাটিয়েছেন এবং চারপাশে কী ঘটছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাও নিশ্চয়ই তাঁর জানা, তার পরও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অবিচলিত ভাব ভয় পাওয়ার মতোই। যাহোক, তাকে আমি উপাচার্যের কার্যালয়ে নিয়ে গেলাম, সেখানে দেখতে পেলাম ড. হোসেন ও রেজিস্টার প্রচণ্ড ব্যস্ত খাদ্য ও অন্যান্য যা-কিছু প্রয়োজনীয় সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষক ও অন্যান্য হিন্দু কর্মচারীদের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে, যাঁরা কেউই সেদিন নিরাপদে বাড়ি ছেড়ে যেতে পারেননি। তাঁরা এসব কথা মাথাঠাণ্ডা করে শুনলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে একজন পরিদর্শককে কলেজে ব্যাপারটি দেখার জন্য যত শিগ্‌গির সম্ভব পাঠাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে কাজ চালিয়ে যাবে, অন্তত নামমাত্র হলেও, যাতে বর্ধমান আতঙ্কের আরও বৃদ্ধি না ঘটে। যদি সীমান্তের ওপারে খবর চলে যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে তা হলে কলকাতা মনে করবে যে ঢাকার অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এর মানে আমি বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কাজটা কঠিন হয়ে পড়ছিল যদিও ছাত্রসংখ্যার অল্প বাদে সবাই মুসলমান ছিল ; কিন্তু হিন্দু শিক্ষকরা, যাঁদেরকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাইরে আনা যাবে না, তাঁদের অংশটি ছিল বিরাট। আমি কলেজে পৌঁছে দেখি বিভাগে আমিই একা। চারজন হিন্দু প্রভাষক ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। খ্রিস্টান শিক্ষক আর. এ. গোমেজেরও কোন পাত্তা নেই। জানতে পেলাম, তিনি ঝামেলার মধ্যেই রওনা দিয়েছিলেন, কিন্তু পথে কিছু ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয় এবং তারা তাঁকে সাবধান করে দেয় যে হিন্দু ভেবে ভুল করে তাঁকে ছুরি মারা হতে পারে ; তিনি হিন্দু ও মুসলিম অভিজাতদের মতো পশ্চিমা পোশাক পরতেন, কিন্তু নিখুঁতভাবে কামানো দাড়িতে ও ছোট চুলে তাঁকে মোটেই ইসলামিক চেহারার লাগত না ; তাঁকে ঝুঁকিপূর্ণ দীর্ঘ পথ পার হয়ে আসতে হবে যেখানে 'সংশয়ের সুবিধা' না-ও পেতে পারেন। মুসলিম তিনজন প্রভাষকের মধ্যে আলী আশরাফ কেমব্রিজে শিক্ষাছুটিতে, সাজ্জাদ হুসেনের আজ ক্লাস নেই, আর মুরশিদ এক মাসের অসুস্থতাজনিত ছুটিতে। মনে হয়েছিল অসুস্থতাকে ও যেন স্থগিত করে রেখেছিল কিন্তু গতকালকের বিপদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে ছুটির সদ্ব্যবহার করতে শুরু করেছে। অবশ্য বেশির ভাগ ছাত্রই এসেছে, তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশ নেয়নি কিন্তু কেউই এসব থামানোর জন্য সক্রিয় উদ্যোগে এগিয়েও আসেনি। যে-সমস্ত ক্লাস একই সময়ে নয় সেইসব ক্লাসই নিতে শুরু করেছিলাম আমি, কিন্তু প্রথমটি যখন শেষ করেছি তখনই উপাচার্য আমাকে ডেকে পাঠালেন। মহিলা ছাত্রীনিবাসের অধ্যক্ষ, আমার সহকর্মী মিস বোস, যেখানে একমাত্র হিন্দু ছিলেন, তাঁর নিজের ও ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য উপাচার্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি ঢাকা হলে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত হিন্দু শিক্ষক-কর্মচারী, যাদের বাড়িঘর নিরাপদ নয়, এবং যাদেরকে সেখানে আনা সম্ভব, তাদের জন্য, সেটিকে একটি প্রহরাধীন আশ্রয়-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমাকে এক্ষুনি ছাত্রীনিবাসে গিয়ে তাঁর স্থানটি নিতে হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন মেয়েকেই বাইরে বেরুতে দেয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব এই হলো ব্যাপার। আমি আবদুলকে খবর পাঠালাম, বাজার থেকে ফিরে ও যেন আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে আসে, সাজ্জাদ হুসেনকে একটি চিরকুট লিখে পাঠালাম যেন রোজ কলেজে আসে এবং যত বেশি ক্লাস ওর পক্ষে নেয়া সম্ভব নেয় ; নোটিসবোর্ডে নোটিস দিলাম, 'আজ আর ক্লাস হবে না'। এবং জানিয়ে দিলাম কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে, এবং অতঃপর ছাত্রীনিবাসের আধোপর্দার ভিতরে ঢুকে গেলাম। সে-রাতে যে কী ঘটতে পারে কেউই জানতো না। খবরে জানা গেছে যে, শহর আয়ত্তের বাইরে। একটি ভয় ছিল যে গুণ্ডারা হিন্দু মহিলাদের খোঁজে ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করতে পারে এবং যদি খুন করার মতো কাউকে না পায় তা হলে সম্ভবত ধর্ষণ করে সে-ক্ষতি পূরণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় সশস্ত্র পাহারার জন্য বলেছিল কিন্তু বলা হয়েছে কাউকেই দেয়া যাবে না; স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমার মনে পড়ে গেল অক্সফোর্ডের একটি অদ্ভুত ঘটনা। যখন সমারভিলের একদল মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পোশাক ছাড়া বেরিয়েছিল (১৯২০ সালের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন এমনই ছিল)। প্রক্টর তাদেরকে চিনে ফেলায় তারা দল বেঁধে পালাতে গেল। শিগ্‌গিরই তারা ধরা পড়লো এবং একটি মেয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে ভর্ৎসনার সুরে তিনি যেন দলপতি বুলডগের মতো বাবা-সুলভ গলায় বললেন : 'তরুণীরা, তোমাদের কাছে আমার উপদেশ, এর পরের বারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে।' আমি তাই ছাত্রীদেরকে বললাম, যদি অন্ধকারে আমরা আক্রান্ত হই, তা হলে আমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে যাব, টর্চ ব্যবহার না করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করব এবং কোণায় উপাচার্যের বাগানে মিলিত হব সেখানে যথেষ্ট মুসলিম চাকরবাকর থাকে যারা আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। খুব মেধাবী কোন পরিকল্পনা এটি ছিল না। কিন্তু একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে এই বোধটাই যেন আশ্বস্ত করল এবং সৌভাগ্যক্রমে এই পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা আমাদেরকে করতে হয়নি।

ছাত্রীনিবাসে বেশ ক'জন হিন্দু মালী ছিল, এবং চাকর ছিল, তারা তাদের কোয়ার্টারে পরিবার নিয়ে বাস করত। প্রক্টর তাদের সবাইকে পরিবারসহ ঢাকা হলে গিয়ে উঠতে বললেন। তারা তাদের গরু ছেড়ে যেতে আপত্তি জানাল, তখন তিনি তাদেরকে উপাচার্যের চাকরদের কোয়ার্টারে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকতে বললেন, যেহেতু সেখান থেকে গরুদের গোয়ালগুলো খুবই কাছে ছিল। এতে তারা রাজি হলো কিন্তু ঠিক কারফিউর সময়ে নোমি, প্রধান কুলি, ঠিক করল তার পরিবার এখানে রেখে নিজে সে ঢাকা হলে যাবে। আমি বললাম হয় সে পরিবার নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবে অথবা তাদের নিয়ে যাবে। কারণ বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তাকেও আর আসতে দেয়া হবে না, এদেরকেও যেতে দেয়া হবে না। অনিচ্ছুকভাবে সে রয়ে গেল কিন্তু তাকে নিরাপত্তার জন্য পুরো পরিবার নিয়ে চাকরদের কোয়ার্টার থেকে হোস্টেলে উঠতে হলো। আমাকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতেই হয়েছে, সঠিকটি হয়ত ছিল, অন্যদের সঙ্গে তাদের সবাইকেও পাঠিয়ে দেয়া। যে-দুজন মুসলিম কর্মচারীকে সশস্ত্র প্রহরী না পাওয়ায় নিয়োজিত করা হয়েছে রাতের প্রহরী হিসেবে, তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল ওর উপস্থিতিতে, কারণ হিসেবে তারা জানাল যদি উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করে তাদের করার কিছুই থাকবে না। বেচারা নোমিকে তাই ভিতরে বন্দি হয়ে থাকতে বলা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়।

এই সমস্ত অশুভ আশঙ্কা এবং উদ্বেগ নিতান্তই অর্থহীন ছিল যেহেতু কেউই আসেনি। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এল, ছাত্রীদের বিছানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো ; আমি মধ্যরাত পর্যন্ত বসে রইলাম, তারপর শুয়ে ও জেগে রইলাম কান পেতে, কিন্তু রাতটি খুবই নীরব ও শান্ত মনে হলো।

'আমরা বন্দি, চাবি ঘোরানো হয়েছে
আমাদের অনিশ্চয়তার ওপরে। কোথাও
একজনকে খুন করা হয়েছে, একটি বাড়িতে আগুন'

এমনই মনে হলো। একটি শান্তিপূর্ণ বাগান, দরজায় পাহারাদার, আর গুজব, গুজব, গুজব, গুজব। কিন্তু রবিবারে একটি মেয়েকে তার প্রথম পর্ব এম এ ইতিহাসের মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হতেই হবে। দুজন বান্ধবীকে নিয়ে বেরুতে পেরে সে খুবই খুশি ছিল, আমি তাকে কলেজে নিয়ে গেলাম। আমরা ঢাকা হলে মিস বোসকে দেখতে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে সেটি একটি ছোটখাটো উদ্বাস্তুশিবিরে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু ছাত্রে পূর্ণ, কিছু শিক্ষক, চাপরাশি এবং ছড়িয়ে-থাকা অসংখ্য লোক যারা কোনমতে সেখানে ঢুকতে পেরেছে।

জগন্নাথ কলেজে সাময়িকভাবে ক্লাস স্থগিত রেখে অধ্যক্ষ খানবাহাদুর সাহেবের তত্ত্বাবধানে শহরের জন্য একটি উদ্বাস্তুশিবির খোলা হয়েছে। সেদিনকার ঐ বেড়ানো থেকে এবং দুএকজন ছাত্র যারা আসছিল দিনের বেলায়, তাদের কাছ থেকে আমি গুজবের চেয়ে বেশি কিছু খবর জানতে পেলাম। রাতে কোন উন্মত্ত গণহামলার ঘটনা ঘটেনি তবে ছুরি মারা ও লুটপাটের কিছু ঘটনা ঘটেছে, পুরনো ঢাকার ছোটখাটো সরু চাপা গলিতে একজন লোক একটু বেশিই সাহসী, ধুতি পরে একা যাচ্ছিল, তাকে ছুরি মারা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পেটে জখম নিয়ে, অর্থনীতির একজন প্রভাষকের বাবাকে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর এসেছে। অর্ধেক ছাত্র একটি শান্তিমিছিল সংগঠিত করতে চাইল এবং অন্যরা বলল তাতে লাভ হবে না বরং হয়ত মারামারির মধ্যে শেষ হবে। এদের মধ্যে কেউই, কোনক্রমেই দাঙ্গায় অংশ নেয়নি যদিও, এদের কেউ-কেউ চায় পরিস্থিতি নিজেই মোড় নিক যেহেতু 'কলকাতা এটা শুরু করেছে' (কিন্তু তাই কি? যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজবে সবসময়েই এটাই নিশ্চিত দেখা যায় যে অন্যপক্ষই আগ্রাসী)। ঢাকার অনেক নাগরিক, হয়ত সত্যিই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে না, তবে আবদুলের মতো ভয়ানক আত্মতৃপ্তি নিয়ে ব্যাপারটি দেখছে। এটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামানোর কোন সংগঠিত প্রচেষ্টা ছিল না, এবং যখন কোন হিন্দুর পক্ষে কোন মুসলমান বলছে তখন সে ব্যক্তিগতভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে যদিও তার পরও অনেকেই তা করছে।

পুলিশ হয় এই গোলযোগ থামাতে পারছিল না অথবা থামাতে আগ্রহী ছিল না। তাদের ধারণা হয়েছিল যে, সরকার এটা চায়। যাহোক, এটা একটি ভুল বিচার ছিল। যখন দেখা গেল পুলিশ নিজেদের অযোগ্যতা প্রকাশ করেছে, তখন শনিবার সন্ধ্যায় শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হলো। তারা তখুনি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সান্ধ্যআইন জারি করল, রাস্তাঘাট থেকে লোকজন সরিয়ে ফেলল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুরনো ঢাকার ঐ গোলকধাঁধার ভেতরে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে ঢাকাকে শৃঙ্খলার ভেতরে এনে ফেলল। পাঞ্জাবি সৈন্যদের কোন কাজের নির্দেশ দিলে তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু ততক্ষণে গোলযোগ মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়েছে। লাশবাহী ট্রেন ও বাস শহরে আসছে।

কয়েক বছর আগে, আমার মনে পড়ছে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার ওপর তথ্য সংগ্রহ করছিলাম এবং পুরোটাকেই 'অর্থনৈতিক' বলে মনে করেছিলাম। বিশ্লেষণটির বেশির ভাগই সঠিক ছিল, কিন্তু এই হত্যার বদলে হত্যার মত্ততার মধ্যে যেন অদ্ভুতভাবে অসংলগ্ন মনে হতে লাগল ব্যাপারটিকে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে দিচ্ছে যে, ঢাকায় হিন্দু মৃতদেহের কোন সংখ্যাই কলকাতায় মুসলমান মৃতদেহের সংখ্যা কমাতে পারবে না, কিন্তু অযৌক্তিক যোগসূত্র রয়েই যাবে। একদিকের হত্যাকাণ্ডের খবর তা সত্যমিথ্যা যা-ই হোক অপরদিকে ধ্বংসলীলা ত্বরান্বিত করবে এবং যদি একদিকে শৃঙ্খলা ফিরে আসে তা হলেই অন্য প্রান্তেও শান্তি আসবে।

সোমবার সকালে অনার্সের এক ছাত্র সৈয়দ মাহমুদ আলী এল যতটুকু খবর জোগাড় করেছে তা-ই আমাকে জানাতে। দুটো বিমানবন্দরের মধ্যে সবচাইতে বড় যেটি (ঢাকা বিমানবন্দর, সাধারণত যেটি যাত্রী পরিবহণেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে) সেটি কাজ করছে না। আরেকটিতে রাতে কিছু রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছে যখন ক'টি হিন্দু পরিবার পালানোর সময়ে বাধাগ্রস্ত ও ছুরিকাহত হয়েছে। মুরশিদ ও জনাব বিভার অর্ধরাত তাদের উদ্ধার করতে সেখানেই কাটিয়েছেন। (পরে আমার সঙ্গে দেখা হলে বিভার সংবাদটির সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন এবং মুরশিদের সাহসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন)। ইংরেজি বিভাগের সমস্ত হিন্দু শিক্ষকই নিরাপদ ছিলেন। তাঁদেরকে রক্ষা করতে মুরশিদ ও অন্য ছাত্ররা রাতে তাঁদের বাড়িতে থাকত এবং তাঁদের বাজারঘাট করে দিত যতক্ষণ না বের হওয়া নিরাপদ মনে হত। অমিয় চক্রবর্তী ইউরোপীয়ান সুট পরে শহরের একটি বিপজ্জনক এলাকায় ভ্রূক্ষেপহীন হেঁটে গেছেন, তাঁর এক আত্মীয়াকে দেখতে এবং পরে তাঁকে তাঁর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বাড়ির আশ্রয়ে নিয়ে এসেছেন। এর জন্য নিশ্চয়ই অসাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নায়ুশক্তির প্রয়োজন ছিল। অন্য ছাত্ররা যখন ক্লাসে বা শিক্ষকদের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত থাকত না, তখন আশ্রয়শিবিরে সাহায্য করত।

আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যতদিন সম্ভব হোস্টেল ত্যাগ না করার, যদিও আমি বন্দি অবস্থায় থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সেদিন স্বল্প সময়ের জন্য আমি কলেজে গেলাম কিছু অসমাপ্ত কাজ সেরে ফেলার জন্য এবং পথে কোন ভয়ের কারণ দেখতে পেলাম না। সাজ্জাদ নির্দেশমতো যতগুলো সম্ভব ক্লাস নিচ্ছিল, কিন্তু স্পষ্টত ক্লাসের পরিমাণ ওর একার পেরে ওঠার পক্ষে বেশি ছিল। আমি যখন সেখানে ছিলাম, এম এ শেষ পর্বের এক ছাত্র এল, ভীষণ পড়ুয়ামতো চেহারা নিয়ে যেন কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। আমাকে অনুরোধ করতে এল তার স্বরচিত কিছু বাংলা কবিতার ইংরেজি রূপান্তর দেখে দিতে। ভালোই ছিল কবিতাগুলো কিন্তু কোন বাঙালির পক্ষে কি সম্ভব ছিল অমন একটি আরোপিত অবসর কবিতা লিখে কাটানো! এর পরও অনেকবার যখনই বাংলা কোন গভীর সংকটে পড়েছে, আমার মনে হয়েছে সৃজনশীল শিল্পের প্রতি এর অটল আগ্রহই এর অবিনাশী অস্তিত্বের মূলে।

পরদিন সকালে আমি উপাচার্যের কাছে গেলাম এবং ছাত্রীদের জন্য ক্লাস করার অনুমতি নিয়ে এলাম এই শর্তে যে, তারা একা যাবে না বা ফিরবে না। কালীপদকে ধন্যবাদ, সে তখনও যায়নি। গত চারদিনের স্নায়ুর চাপে সে অশ্রুসজল হয়েছিল এবং ভাবতে শুরু করেছিল যে, ওর সর্বনাশ হয়ে গেছে। কারণ, গরুর জন্য এক গোয়ালা ওর কাছে কয়েকশো টাকা পেত, এখন ও বুঝতে পারছে না লোকটি কি বেঁচে আছে না মারা গেছে এবং কোথায় তাকে পাবে। আমি ওকে সংকটের সময়টুকু পার করতে অগ্রিম বেতন দিলাম এবং তিনটি ক্লাস নিলাম। অর্ধেক ছাত্রই বাইরে হয় আশ্রয়শিবিরে কাজ করছে, নয় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা তাদেরকে ডেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু কাজে ফিরে এসে আমার ভীষণ স্বস্তিবোধ হলো।

জর্নাল

মঙ্গলবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : খোরশেদ এল চায়ের সময়ে, ডঃ রয় (ইংরজির রীডার) এবং অন্য হিন্দু প্রভাষকদেরকে দেখে এবং হাসপাতাল ঘুরে। তার ও অন্যদের কাছে থেকে আমি জানতে পারলাম, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ভালোভাবেই ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে (যদিও আজকে একজন হিন্দু যিনি ভেবেছিলেন সব ঠিক হয়ে গেছে, প্রিয়নাথ স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ছুরিকাহত হয়েছেন ঠিক সেই জায়গাতে, যেখানে আমরা গত শুক্রবার ঐ শিক্ষকটির দেখা পেয়েছিলাম)। কিন্তু গুণ্ডারা শহরতলিতে ও আশপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে তাদের কাণ্ডকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছিল। মীরপুরে প্রায় নয়জন কি তার বেশি মারা গেছে। খোরশেদ নিজেই আজকে কিছু বীভৎস দৃশ্য দেখেছে। এস এম হলের ছাত্রদের সামনেই একজন লোক নাড়িভুঁড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের হওয়া অবস্থায় পড়ে ছিল। কিন্তুওরা সময়মতো তাকে বাঁচানোর জন্য পৌঁছুতে পারেনি। লোকদের ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুড়ে মারা হয়েছে, ছুরি মারা হয়েছে এবং তার পরও তারা বেঁচে আছে। আজকাল হিন্দুদের নিয়ে যাওয়া কোচগুলো ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং কঠোর পাহারা থাকছে। এর আগের রাতে ও নিজে এবং আরেকজন ছাত্র হুমকি শুনেছিল রেসকোর্সের কাছাকাছি জায়গায়, একটি মস্ত গুণ্ডার কাছ থেকে, যে তাদের একজনকে হিন্দু ভেবেছিল। হয়ত মিস বোসকে আরও দুই-একদিনের জন্য সরে থাকতে হবে।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি শুনে ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক বললেন, এখানে এগারোটা থেকে দুজন শক্তিশালী মুসলিম পাহারাদার রাখা হবে। আমার ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রতি এটি একটি অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধা নিবেদন বলে ধরে নিলাম। দিনটির সমাপনী সংলাপ হিসেবে এল শেষবর্ষ এম এ'র আজিজ তার এক বন্ধুকে নিয়ে, তার টিউটোরিয়াল শেষ করতে।

বুধবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি। তিনটি মেয়েকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। শান্তি- শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ক্লাস শুরু হয়েছে। এম এ প্রথম পর্ব ও অনার্স তৃতীয় বর্ষে উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় পূর্ণ। এম এ শেষপর্বের মাত্র দুজন এসেছিল। আমি তাদের চলে যেতে দিলাম, কারণ একজন বলল যে, সে বরং আশ্রয়শিবিরে কাজ করা ভালো মনে করছে। আমি যুক্তরাজ্যের দূতাবাসে গেলাম ওয়ার্ডসওয়ার্থ শতবর্ষের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে। ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব ডাউনিং বিপৎকালীন অবস্থায় ছাত্ররা যে-সমস্ত সেবামূলক কাজ করেছে, সে-ব্যাপারে জানতে পেরে খুব চমৎকৃত হয়েছেন।

চায়ের সময়ে টেরেন্স ও মার্গারেট একটি জিপ চড়ে এল। শুক্রবারে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর থেকে তারা অবিরাম কাজ করে গেছে। টেরেন্স স্টেশনে ফিরে গেছে। সেখানে পূর্ণোদ্যমে ছুরি মারামারি চলছিল। তারপর কায়েতটুলীও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ও জানাল, পুলিশ দিব্যি ব্যাপারগুলো ঘটতে দিয়েছে। সে ও অন্য দুজন ছোরাধারী ও লুটেরাদেরকে রাস্তায় বাধা দিয়েছে (যারা কেউ তাদেরকে রুখে দাঁড়ালেই দৌড়ে পালিয়েছে), আহতদের তুলে নিয়েছে এবং এইসব কাজ করে গেছে। এর পর থেকে তারা আশ্রয়শিবিরে সাহায্য করছিল। তারা এখানকার মেয়েদের জন্য প্রচুর কাপড়ের গাঁট এনেছিল, সেগুলো শাড়ি, লুঙ্গি ও বাচ্চাদের কাপড়ের আন্দাজে কেটে নেয়া যায় এবং মেয়েরা সেগুলো নিয়ে তক্ষুনি কাজে গেলে গেল। টেরেন্স জানাল, বিশেষ করে মুরশিদ খুবই ভালো কাজ করছে। অনেক গল্প জমা ছিল ওর। কী করে বিভার মেশিনগানের মতো শব্দ করে এমন একটি খেলনা দিয়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, কী করে জনাব হিক তাঁর গাড়িতে একটি বন্দুক দিয়ে তিন লুটেরাকে সরাসরি পুলিশ- প্রধানের বাগানের ভেতর দিয়ে ধাওয়া করেছিলেন এবং আরও অনেক এমনি ঘটনা। তাঁদের চেহারায় উত্তেজনা ও উদ্বেগ খুব স্পষ্ট ছিল। কিন্তু একটি উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে ছিল, যেন পৃথিবীর জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর চেয়ে বেশি কিছু তাঁরা করতে পারতেন না। এক ছাত্রী এসে এখন জানাল, বরিশালে একটি দাঙ্গার খবর। আরেকজন শুনেছে নোয়াখালীর ফেনীতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা এবং জেনেছে যে, দাঙ্গাকারীদের ভেতরে ছাত্ররাও আছে। সেনাবাহিনী ঢাকাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে, কিন্তু তারা কি সারা প্রদেশকে দেখে রাখতে পারবে?

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৬। আজ ছুটির দিন— একটি হিন্দু পরব। আমি আজই প্রথম শহরটি ঘুরে দেখার একটি সুযোগ পেলাম। আর তাই বিভাগের হিন্দু শিক্ষকদের বাড়ি বেড়াতে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। নওয়াবপুর রোডের বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ ছিল এবং অনেকগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু খোলা ছিল, দোকানদাররা হাসিমুখে পসরা সাজিয়ে বসেছিল।

অমিয় চক্রবর্তীর গলির কাছে এসে বুঝতে পারলাম যে, এখানে অনেক বাজে কাণ্ড ঘটে গেছে। কিন্তু এখন হিন্দু-মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করছে। ছোট ছোট ক'টি জটলাও দেখলাম, বেশ যেন উত্তেজিত, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, কেন। অমিয় বাড়ি ছিলেন না। আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত কথা বলে ডঃ রয়ের ওখানে গেলাম। তিনি খুবই হাসিখুশি ছিলেন এবং ছাত্রদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য, যাতে তাঁরা শিগ্‌গিরই পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে যেতে পারেন। গুহঠাকুরতার বাড়ি তাঁর বাড়ির কাছেই, কিন্তু তিনিও বেরিয়ে গেছেন জগন্নাথের আশ্রয়শিবিরে সাহায্য করতে। তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছিলেন। এরপর মিস বোস। তিনি জানালেন, কিছু ছাত্র তাঁর ওখানে এসেছিল কিন্তু তারা তাঁকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য না বেরুনোর পরামর্শ দিয়ে গেছে।

চায়ের সময়ে রহমানকে দেখা গেল। সে সরদারদের ওখানে ছিল এবং তাদেরকে নিয়ে মোহাজের নেতাদের সাথে মিটিং করেছে। ওর মনে হচ্ছে, এতে কিছুটা উপকার হবে। মোহাজেররা হচ্ছে মুসলিম উদ্বাস্তু, আর সরদাররা হচ্ছে প্রতি গলির এক-একজন নেতা ; বয়োজ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা, মুখপাত্র ও প্রতিবেশী নেতাদের মাঝ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত। মনে হলো, কাজ হতেও পারে। লোকেরা এখন মনে করছে যে, মোহাজেরিনরাই সমস্যার মূলে এবং সরদাররা যদিও প্রথমে এটাকে উৎসাহিত করেছিল, এখন বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত। তারাই এইসব রুক্ষ ও রূঢ় লোকজনদের প্রভাবিত করতে পারবে। গভীর শ্রেণীবৈষম্যের শিকার এই সমাজে যারা ওপরের তলায় আছে, তারা নিচুতলার লোকদের সাথে যোগাযোগ করবে, ভাবতেই অসম্ভব বলে মনে হয়।

রাতের খাবারের পর ছাত্রীরা কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা করল। ওদের একটি 'পাঠচক্র' আছে যা প্রতি বৃহস্পতিবার রাতেই এটি আয়োজন করে। গত সপ্তাহে ছিল বিতর্ক। এবারে তারা একটি উন্নতমানের মঞ্চ তৈরি করেছে। সব ছাত্রী এমনকি গৃহপরিচারিকারাও সেখানে উপস্থিত ছিল। একটি একক নৃত্য, একটি ব্যঙ্গ-কবিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবৃত্তি (নজরুল ইসলামের একটি কবিতার) এবং রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক ছিল। পুরো ব্যাপারটিই চমৎকার ও সুন্দর। ইংরেজ মেয়েরা এমন উপস্থিত প্রদর্শনীর আয়োজন করতেই পারত না হাসি-ঠাট্টাপূর্ণ কোন কিছু বাদ দিয়ে। এইসব মেয়ের মধ্যে শিল্পের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে এবং সৌন্দর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আছে।

আমি যখন বিকেলে রহমানের সাথে কথা বলছিলাম, তখন হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক এলেন। তিনি জানালেন আজ ঢাকা হলের ভেতরে একজন হিন্দু শিক্ষকের ওপরে এক লোক ছুরি দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে, দশটার দিকে যখন তিনি প্রাধ্যক্ষের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। ক'জন ছাত্র তাঁকে সময়মতো উদ্ধার করেছে। কিন্তু মিস বোস এখন যেখানে আছেন সেখানেই আরও ক'দিন তাঁকে থাকতে হবে। অন্তত যতদিন না বিপদের আশঙ্কা কেটে যায়। আমিও তা-ই মনে করি।

গোলমালের পুরো সময়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা তাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখল, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করল, কখনও কখনও ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে। যে-মুসলিম ছেলেরা হিন্দু শিক্ষকদের বাড়িতে রাতে থাকছিল, নীরব বীরত্বের একটি কাজ তারা করছিল। উদ্বাস্তুশিবিরগুলোতেও তারা সাহসের সাথে কাজ করে যাচ্ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবন স্বাভাবিক রাখার জন্য তৎপরতা চালাচ্ছিল, যাতে কোনক্রমেই ত্রাসের সৃষ্টি না হয়। তাদের দলের একজন হয়ে আমি গর্বিত কিন্তু নিজের জন্য নয়। 'আমি উত্তপ্ত তোরণদ্বারেও ছিলাম না, উষ্ণ বৃষ্টিধারায় যুদ্ধও করিনি।' আমি সাহসের সাথে উপস্থিতি রেখেছিলাম, কিন্তু কখনওই সাহসের পরীক্ষা দিতে হবে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি।

এই সহিংসতার শিকার অসংখ্য হিন্দু—যাঁদের বাড়িঘর, দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন উদ্বাস্তুশিবিরে। হাজার হাজার লোক পাড়ি দিচ্ছেন সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে তাঁদের দুর্দশা বর্ণনার অতীত কিছু যে কেবল তৈরি করবে এমনই নয়, অন্যদিকেও আগুন জ্বালিয়ে দেবে। অন্য প্রান্তেও মুসলিম উদ্বাস্তুদের জন্যে আশ্রয়শিবির ছিল। সেদিকে আশ্রয়শিবিরের সংখ্যা কম ছিল এবং এ থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম যে, ঐদিকের সংহিসতার খবর কিছুটা বাড়িয়ে প্রচার করা হচ্ছিল। কিন্তু তখন এটুকু যুক্তিও কারও কাছে খতিয়ে দেখার মতো মনে হয়নি। লক্ষণীয় ছিল এই যে, তাদের মাঝে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং তাদের সংখ্যার বেশির ভাগটিই ছিল অবাঙালি মুসলিম অভিবাসীর। ঢাকার গণ্যমান্য নাগরিকের বেশির ভাগ এবং ছাত্ররাও এই সহিংসতার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, লজ্জিতও। কারণ, এতে পূর্ববঙ্গের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়েছে। এবং হিন্দুদের জন্য ত্রাণকার্যে আন্তরিকভাবে অংশ নিয়ে তাঁরা সে-ভাবমূর্তি রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় সবাই বলতে লাগল যে, অবাঙালি অভিবাসীরাই এই গোলমালের মূলে। এটা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না, কারণ সচিবালয়ের কেরানিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটি—যাদের সবাই অবাঙালি ছিল না, সত্যিই ঘটেছিল। আর বিহারি ঐ অভিবাসীরা, যাদেরকে কেউ পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেনি, তারা ছাড়াও ঢাকায় একশ্রেণীর বেকার ও অপরাধীগোষ্ঠী ছিল, যারা গোলমাল বাধাতে সদাপ্রস্তুত ছিল। এইসবেরও পিছনে ছিল একটি ইচ্ছা। দুই বাংলার মধ্যে একটি ঐক্য আছে যা যে-কোন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধের চেয়ে দৃঢ়। কিন্তু যেমন আমি বলেছি, পুরো সত্য আবিষ্কারের বাইরেই রয়ে গেল। ২৩ ফেব্রুয়ারির আমার নোটটি আমার আগের অনুমানের সাথে যোগ করা যায়।

বাগেরহাট ও খুলনায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবং ঘটনাটি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং আত্মরক্ষার্থে একটি বিলম্বিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। কলকাতা এতে খুবই বিরক্ত। অবশ্য প্রচুর দুষ্কৃতকারী আছে যারা এই ব্যাপারটিকে আরও খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। আইনসভায় এই ব্যাপারে আলোচনা না করে ওয়াকআউট করার জন্য হিন্দু সদস্যদেরকে দায়ী করছিলেন মুসলিম সদস্যরা। তাদের বরং সরকারকে দায়ী করা উচিত ছিল উদ্দেশ্যপূর্ণ বিদ্বেষের জন্য নয়, যেভাবে তারা ঘটনাগুলোকে লুকাতে চেয়েছে ও না দেখার ভান করেছে সেজন্য।

এই তথ্যের ব্যাপারে আমার নিজের নির্ভরযোগ্যতা এখনও আমার জানা নেই। 'অপ্রীতিকর ঘটনাবলী'ই-বা কী তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু এই খবরগুলোর সাথে বাগেরহাট থেকে জানুয়ারিতে লেখা হোসেনের চিঠির একটি মিল আছে। পরে যখন ক'মাস পর ওর সাথে দেখা হলো, ও জানাল যে, সত্যবিকৃতির অশুভ চেষ্টাকে ইঙ্গিত করে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে লেখা। এখানে দুই বাংলার কৌশলপূর্ণ সম্পর্কের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই নোট আমাকে যে-ধারণা দিল তা হলো, ঐসব এলাকায় কিছু হিন্দু, সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তায় অন্য লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল (যেহেতু সরকারকে সবসময়েই দায়ী হতে হয়)। ঘটনাগুলো খুবই বাজে ছিল, যেজন্য আইনসভার হিন্দু সদস্যরা যেমন প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনি তা জঙ্গি পশ্চিমবঙ্গীয়দেরকেও ক্ষুব্ধ করেছিল যারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের স্বধর্মীয়দের স্বার্থরক্ষা করাকে তাদের একটি কাজ বলে মনে করত। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় হিন্দু সদস্য আছেন, এই সত্যই হিন্দু সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের গুরুত্ব প্রমাণ করে। তাঁরা ছিলেন সেই সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক প্রকাশের খুবই সংকীর্ণ একটি মাধ্যম। কিন্তু সেহেতু সীমান্তের ঐ পারেও এইসব কণ্ঠস্বর পৌঁছাত, তাই কেন্দ্রীয় সরকার ও তার সমর্থকদের কাছে তারা খুবই অস্বস্তিকর ছিল।

নানা রকম বাধা বিপত্তি, ভয়ভীতি, গুজব ও অনুমান মুখে মুখে ছড়িয়ে রইলেও ঢাকা এখন ক্রমশঃ নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। হিন্দু প্রভাষকেরা কাজে যোগ দিয়েছেন, গুহঠাকুরতা এবং মিস বোস এঁদের মধ্যে প্রথম,— আমার হৃদয়ের গভীরে ভীষণ আনন্দ অনুভব করছিলাম; কারণ কেবল এই নয় যে, সাজ্জাদ ও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তাহের ছয়দিন সবগুলো ক্লাশ নেয়ার প্রচণ্ড চাপ বোধ করছিলাম; সেই সাথে ছিল আমার নিজের ফ্ল্যাটটি ও তার ভেতরে স্বচ্ছন্দ চলাফেরার অবাধ স্বাধীনতার জন্যে মন কেমন করা। আমি সেখানে ফিরে গেলাম। ২৪ তারিখে মিস বোস ছাত্রী নিবাসে ফিরে আসার পর আমি লিখেছি ঃ

"তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হননি যে, স্বাভাবিক নিরাপত্তা ফিরে এসেছে। অবশ্যই হিন্দুদেরকে একথা বিশ্বাস করাতে যথেষ্ট সময় লাগবে। আমি নিজেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু আমি যত জন মুসলমানের সাথে কথা বলেছি তাদের বেশীর ভাগই বিশ্বাস করেন ও খুশী এই ভেবে যে, সরকার সর্বতোভাবে এবং আন্তরিকভাবেই আইনশৃঙ্খলার সপক্ষে। অনেকে আবার খুব আনন্দের সাথে বিস্ময়ও প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে যে, এ ব্যাপারে তারা খুবই নিশ্চিত। অনেকে আবার এমনভাবে কথা বলছেন যেন দাঙ্গাটা একটি ভাল ব্যাপারই ছিল। কারণ এতে সরকারের মনোভাবটি খুব স্পষ্ট হয়ে গেল এবং এর ফলে মুসলিম ছাত্র ও অন্যান্যরা এতো ভাল কাজ করার সুযোগ পেল। কল্পনা শক্তির কি অবিশ্বাস্য অভাব! কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, অচিরেই, অনেক মুসলমান এই দেখে আহত বোধ করবেন যে, হিন্দুরা পাকিস্তানকে বাসযোগ্য একটি দেশ ভাবতে খুব ইতিবাচকভাবে উৎসাহিত বোধ করছে না।"

তবুও যে মানসিকতার কথা আমি এমন সমালোচনার সুরে বলছি তা খুব বিরল ছিলনা। আমরা সাধারণতঃ স্বল্প প্রাধিকার প্রাপ্তদের ব্যাপারে আমাদের উদার মানসিকতা প্রকাশ করতে এতো বেশী উৎসাহী হয়ে উঠি যে, আমরা ভেবেই নিই যে আমাদের এই উদারতার কারণেই তারা নিজেদের প্রাধিকার প্রাপ্ত বলে বোধ করবে বা করা উচিৎ। মিস বোসের ব্যাপারে যদিও তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তা কোন সমস্যা হয়ে ওঠেনি ঃ তাঁকে কেবল ঢাকা হলে সরে থাকতে হয়েছিল কারণ তিনি এত বেশী শৃঙখলাবোধ সম্পন্ন ছিলেন যে, একটি জরুরী অবস্থায় যে ধরনের নির্দেশাবলী মেনে চলতে হয়, তা হয়ত মেনে চলতে পারতেন না; কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল তাঁর কাকাকে নিয়ে। তাঁর কাকা ছিলেন খুবই বৃদ্ধ ও দুর্বল এবং তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর অন্তত এক সপ্তাহের ছুটি দরকার কোলকাতায় কাকাকে নিরাপদে রেখে আসার জন্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব হিন্দু প্রভাষকই ছুটি চাইছিলেন, এবং যে-প্রচণ্ড চাপের ভেতর দিয়ে তাঁরা গেছেন সেকথা ভাবলে কেইবা তাঁদের সেজন্যে দোষ দিতে পারে? কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু তাঁদের ছাড়া স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে পারছিল না, হৃদয়হীনের মতো সমস্ত বিভাগীয় প্রধানকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, এক সপ্তাহের বেশি ছুটি কাউকেই দেয়া যাবে না। আবারও ১৯৪৭ সালের মতোই আমি নিজেকে আমার প্রভাষকদের অধিকারের জন্যে লড়াই করতে দেখলাম, বিভাগকে তাঁদের অনুপস্থিতি দিয়ে পঙ্গু করে হলেও। পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ববোধের টানাপোড়েনে পড়ে মিস বোস জানালেন তাঁকে হয় ছুটি নিতে হবে নয় পদত্যাগ করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডঃ রায়ের, যাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার বয়স অতিক্রান্তপ্রায়, স্পষ্টতই মাস-খানেকের ছুটির প্রয়োজন ছিল সুস্থ হবার জন্যে। গোমেজ, যে মাত্রই কলকাতা থেকে এসেছে, তার কিছু আর্থিক ব্যাপারে জটিলতা নিরসনের জন্যে সময়ের দরকার ছিল, এবং কোন জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হবার আগেই আমার কাছ থেকে পবিত্র প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে আমি তার ছুটির আবেদন সমর্থন করব। আর মুরশিদ ছিল অসুস্থ যদিও সংকটকালে সেকথা ভুলেই গিয়েছিল। ওর এক্সরে পরীক্ষাই বলছিল ওর মাসখানেক হাসপাতালে থাকা দরকার। তার পরও অন্য অনেক বিভাগের চেয়ে আমাদের অবস্থা ভালো ছিল। কারণ, গুহঠাকুরতা ও অমিয় চক্রবর্তী সোজা কাজে চলে এলেন এবং ছুটি তো নিলেনই না; বরং বললেন তাঁদের কোন অবস্থাতেই দেশত্যাগের ইচ্ছে নেই। সুতরাং এখন দুজনের বদলে অন্তত: চারজন ছিলাম সমস্ত কাজের বোঝা টেনে তোলার জন্যে, যতই আমরা পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

কালীপদ আপাতত দেশত্যাগ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এই সংকট ওকে একটি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে দিল। আবদুলের কাছে ওর প্রিয় গরুটি, গাঢ় বাদামি রঙের সুন্দর প্রাণীটিকে তার সদ্যোজাত শিশুসহ বেচে দিল। ওর কাছ থেকে বিদায় নেয়া কালীপদের জন্যে অসম্ভব ছিল কিন্তু এই সংকটসংকুল পৃথিবীতে একটি পবিত্র পশুর দায়িত্বের জন্যে এতটা কষ্ট পাওয়া যেন ওর পক্ষে বেশি হয়ে যাচ্ছিল, কারণ, যদি কোন মুসলমান গরুটিকে চুরি অথবা হত্যার চেষ্টা করে তবে ওকে প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করা ওর ধর্মীয় দায়িত্ব হয়ে উঠবে। আবদুল ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, পশুটিকে ও মারবে না এবং কালীপদ গরুটিকে আমার আশ্রয়ে রেখে আবদুলের হাতে তুলে দিল আর আমাকে তার সাক্ষী রাখল। নেয়া-দেয়ার এই ব্যাপারটি ঘটল আমার অফিসে বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে, যেন এটি প্রতীক হয়ে উঠল হিন্দুদের চরম পরীক্ষার এবং আপাত-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রীতির আড়ালে তাদের হারিয়ে-যাওয়া নিরাপত্তার। কালীপদ আবেগের অশ্রু ঝরাল এবং আবদুল, যে কিনা খুবই চমৎকার একটি চুক্তি করেছে, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তার একগুঁয়ে নীরবতাই বুঝিয়ে দিল এইসব পৌত্তলিক কুসংস্কারের প্রতি তার ঘৃণা। ঐ মুহূর্তে তাকে আমার সবচাইতে খারাপ লাগছিল যেমনটি আর কখনও লাগেনি। তবে সে সত্যিই তার কথা রেখেছিল, গরুটি ও বাছুরটি খুবই নিরাপদে বেঁচে রইল এবং যদিও গরুটি তার দেবীত্ব হারাল কিন্তু তাতে তার প্রভাতী দুধের গুণগত মানে কোন হেরফের হলো না।

ইতিমধ্যেই, যদিও ঢাকা তার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে, গোলমাল প্রায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগের খবর আসছিল সব জায়গা থেকেই। সেইসব প্রতিহত করার সাহসী প্রচেষ্টার খবরও মাঝে মাঝে আসছিল। আমি একজন মুসলিম ভদ্রলোকের কথা শুনেছিলাম, মনে হয় বরিশালের দিকে হবে, যিনি তাঁর নিজের বাড়িতে অনেক হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং ক্রুদ্ধ জনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোষ থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন যতক্ষণ না ওরা তাঁকে এবং তাঁর আশ্রিতদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। সচরাচর যেমনটি হয়, যখন আবেগ ফেনিয়ে উঠেছিল তখন শান্তিকর্মীদের চেষ্টাগুলো অত ফলাও প্রচার পায়নি, অতিরঞ্জিত তো হয়ইনি ; বরং পলাতক প্রত্যেকেই তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে আরও ভয়ংকর করে বর্ণনা করেছে এবং বিভিন্ন জায়গার এই ভয়াবহ গল্পগুলো বারবার বলা হচ্ছিল যার ফলে মনে হতে লাগল পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দুকে সব মুসলমানরা মেরে ফেলেছে। ঘটনার গুরুত্বকে খাটো না করেও বলা যায় যে, গুজবের জন্যে প্রচণ্ড খিদে একে যেন দ্বিগুণ করে তুলছিল। গুজব সীমান্ত পার হয়ে গেল যতক্ষণ না পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ ভাবতে শুরু করল যে, বোধহয় এখন সামরিক হস্তক্ষেপের সময় হয়েছে। এরপর একটি গুজব ফিরে এল যে, হিন্দু সৈন্যের একটি বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দিকে রওনা দিয়েছে। সম্ভবত আর কোনকিছুই সংকটকে অমন গভীর করতে পারত না। সীমান্তবর্তী মুসলিম গ্রামগুলোতে এই গুজব একটি অপরাধবোধপূর্ণ ত্রাসের সঞ্চার করল বটে কিন্তু হিন্দুরা আরও ত্রাসিত হয়ে পাগলের মতো ওপারে যেতে গিয়ে পদপিষ্ঠ হতে লাগল, কারণ তারা একথা বিশ্বাস করার কারণ খুঁজে পেয়েছিল যে, একবার যুদ্ধ শুরু হলে তারাই সবচাইতে আগে গুলি খাবে।

বন্ধুসেবা দুদিকের আশ্রয়কেন্দ্রেই কাজ করছিল। সংখ্যায় তাদের সদস্য খুবই কম ছিল, কলকাতা বা ঢাকা কোথাওই চারজনের বেশি নয়, কিন্তু মানুষের দুর্দশা মোকাবেলা করার মতো কিছু প্রশিক্ষণ তাদের অন্তত ছিল, বিশেষ করে এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে, এবং তারা ইচ্ছুক সাহায্যকারী ছাত্র ও অন্যান্যদের সংগঠিত করতে পেরেছিল। আমরাও একটি দলে তাদের ঢাকার বাড়িতে মিলিত হতাম, শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রচারণা চালাতে। একটি প্রস্তাবের কথা আমার মনে পড়ছে যেটি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছিল, সেটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মিশ্র গ্রামগুলোতে যাবে যেমন মীরপুরে, যেখানে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে অথবা যেখান থেকে তাদের বিতাড়ন করা হয়েছে, এবং মুসলিমদের বুঝিয়ে রাজি করাবে যাতে তারা হিন্দুদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং তাদের বাড়িঘর আবার তৈরি করে দেয়। প্রথমে শুনতে ব্যাপারটাকে চমৎকার মনে হলো। কিন্তু আমরা কিসের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি? আমাদের কারওই গান্ধীর মতো নৈতিক শক্তি নেই, আমরা কেউই হিন্দুদের ফিরে আসতে উৎসাহিত করার পর, সেখানে থেকে তাদের জন্যে জীবন দিতে পারব না, যা তাদের জন্যে সত্যি হয়ে উঠতেও পারে যদি এই পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয়। শেষে আমরা বুঝতে পারলাম অন্যের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ভেতরে নিহিত দায়িত্বহীনতার সমস্যাটিকে।

একটি ঘটনা পুরো বাস্তবতাটি আমার সামনে ঘনিষ্ঠভাবে তুলে ধরল এমন স্পষ্ট করে যা হয়ত অন্যভাবে হতই না। দাঙ্গার আগে এম এ প্রথম পর্বের পরীক্ষা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল। খাতা দেখা শেষ হওয়া ও মৌখিক পরীক্ষার জন্যে ডাক আসার মাঝামাঝি সময়টুকুতে সাধারণত ছাত্ররা বাড়ি চলে যেত, যদিও কদাচিৎ তারা কলেজে থেকে যেত পাঠাগারে পড়াশুনোগুলো ঝালিয়ে নেয়ার জন্যে। আমরা এখন একটি তারিখ ঠিক করে মৌখিক পরীক্ষার জন্যে তাদের ডাকলাম। একজন মুসলিম ছাত্র বাদে সবাই এল। ছেলেটি ছিল দুরবর্তী একটি জেলার এক গ্রামে আর কেউই ওর অনুপস্থিতির ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না। মৌখিক পরীক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। দাঙ্গার কারণে ডাকের কোন গোলমাল হয়েছে, যানবাহনের অসুবিধা ঘটেছে যে-কারণে ও আসতে পারেনি, এসব ভেবে আমরা পনেরো দিনের জন্যে ফলাফল ঘোষণা পিছিয়ে দিলাম। ঠিক হলো এই সময়ের মধ্যে ও এলে ওর পরীক্ষা নিয়ে ফল দিয়ে দেব। যদিও অসাংবিধানিক ছিল ব্যাপারটি কিন্তু ঢাকায় রেজিস্ট্রার অফিস অত কঠোরভাবে আমলাতান্ত্রিক নয় যে নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উপেক্ষা করবে না। সম্ভাব্য শেষ দিনটিতে ছেলেটি এসে হাজির হলো, বিধ্বস্ত চেহারা, কোনক্রমে মৌখিক পরীক্ষা দিল এবং পরে চা খেতে খেতে ওর কাহিনী আমাকে শোনাল। ১০ তারিখে, যেদিন ছুরি মারা শুরু হয়, ও কিছুই না জেনে, বিপদের কিছুই আঁচ করতে না পেরে, ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চড়ে ওর গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিল। হঠাৎ একদল গুণ্ডা ছুরি হাতে ট্রেনে উঠে পড়ল। দরজা বন্ধ করে তারা ধুতিপরা সব হিন্দুকে ছুরি দিয়ে মেরে ফেলল। অন্যরা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল যে তারা সবাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান, সবারই মুসলমানি হয়েছে। বিশ্বাসের রক্ষক'গণ এত অভব্য ছিল না যে তারা সেসব পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের ধর্মবোধ পরীক্ষা করার জন্যে তারা তাদের পবিত্র কোরান থেকে মুখস্থ বলতে বলল এবং অজ্ঞতা অথবা প্রচণ্ড ভয়, যে-কারণেই হোক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলেই তাকে ছুরিকাঘাত করতে লাগল। এই ছেলেটি ধর্মপ্রাণ মুসলিম হলেও মানসিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে রেখে সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিল। পরের স্টেশনে এই মৃতদেহ বোঝাই রেলকামরা থেকে গুণ্ডারা নেমে যাবার পর সে নিজে নামতে পারল এবং বাড়ি পৌছাল পুরোপুরি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায়।

এই ছিল ধর্মীয় রক্তপিপাসা এবং এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়েছিল। অবশ্য কোনরকমে তা করা হয়েছিল, এবং মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি, যা তখন আমাদের কাছে পাগলামির ও যুক্তিহীনতার চরম হবে বলে মনে হচ্ছিল, তাই যেন ব্যাপারটিকে ঠাণ্ডা করতে কাজে লাগল। পাকিস্তান ও ভারতের দুই সরকারই অনাকাঙ্ক্ষিত একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখতে পেল এবং পারস্পরিক ভীতি প্রশমনে নিজেদের বাধ্য করল। যদিও কোন সরকারের নির্দেশেই এইসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি, কিন্তু একজন আরেকজনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার ফলে এসব ঘটেছে এবং একান্ত নিজেদের আন্তরিক প্রয়াসই এখন এসব থামাতে পারবে। দুই বাংলার প্রশাসকদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং হঠাৎ করে এই রক্তপাত ও ত্রাসের অবসান ঘটল। আমরা আমাদের মতো করে শান্তিকে আবাহন করলাম, স্বতঃস্ফূর্ত, অনানুষ্ঠানিক, পুরোপুরি বাঙালি কায়দায়। আমি জানিনা কে একথা ভেবেছিল, বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে এই ভাবনার সূত্রপাত এবং হঠাৎ দেখা গেল ভাবনাটি খুব সঠিক। এখন যেহেতু সীমান্ত খোলা, এবং বন্ধুত্ব ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত, আমরা কলকাতার ক'জন কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঢাকায় একটি সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রণ জানাব। বিষয়বস্তু হবে " দুই বাংলার সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত "—তক্ষুনি একটি কমিটি তৈরি হয়ে গেল অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে।

এটা খুব সামান্য একটি ব্যাপার, অনানুষ্ঠানিকতার দিক থেকে অমনোযোগীই বলা যায়। কোন ভর্তুকি চাইনি বলে, আমাদের কোন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার ছিল না। বন্ধুসেবা মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ তাদের সদস্যরা নিয়মিত সীমান্ত পার হয়ে এপার-ওপার আসা-যাওয়া করত এবং তাদের কলকাতার আপার উড রোডের কেন্দ্রটি ঢাকার কেন্দ্রটির মতোই বুদ্ধিজীবীদের সব ধরনের আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এদের মাধ্যমেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কোন সাহিত্য সংগঠনকে নয়, যারা হয়ত কার্যকলাপগুলোকে খুব আনুষ্ঠানিক করে তুলতে পারে ; বরং সাধারণভাবে আগ্রহী যে-কাউকে। তাদেরকে খুবই আগ্রহী হতে হবে। কারণ আমাদের কারওই অর্থকড়ি বিশেষ নেই, এবং যদিও আমরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের আতিথেয়তা দান করব ও উষ্ণ অভ্যর্থনা দেব কিন্তু পথখরচ তাদের নিজেদের দিতে হবে। খুবই সাদামাটা হলেও ধারণাটা ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহকে উস্কে দিল। কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্যে একটি জনসভার আয়োজন করতে হবে এবং সেজন্যে আমাদেরকে কিছু বিপজ্জনক প্রান্তে আলোচনা চালাতে হলো। একজন শ্রদ্ধেয় ও গণ্যমান্য আদর্শবাদী ব্যক্তি, আধুনিক ও প্রাচীন বিশটি ভাষার পাণ্ডিত্য যাঁকে মনুষ্যচরিত্রের অনিশ্চিত দিকগুলো সম্পর্কে কোন জ্ঞান দেয়নি, প্রস্তাব দিলেন শান্তিরক্ষায় ও উন্নয়নে সাহিত্যের করণীয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার যা কিনা আরও বিবেচক ও প্রাজ্ঞ সদস্যদের অনুমানে বিতর্ক থেকে বিতণ্ডা ও বিতণ্ডা থেকে হট্টগোলের রূপ নেবে। আরেকজন প্রস্তাব দিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত বিশিষ্ট কবির জন্যে একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ বা কর্মসূচি নির্ধারণ করার, কিন্তু যেদেশে কবিতা এমন সম্মানের জায়গা নিয়ে আছে সেদেশে প্রত্যেকে সেই মঞ্চে ডাক না পেলে আরও বৈরিতার সৃষ্টি হবে। শেষ পর্যন্ত এসবের চাইতে কম প্ররোচণাদায়ক একটি পথ খুঁজে বের করা হয়েছিল মতৈক্যে পৌঁছাতে, কিন্তু সেটি যে কী ছিল আজ আমার মনে পড়ছে না।

এই আলোচনার ক্রমধারাটি ছিল একটি সীমাহীন সাফল্য। প্রায় তিন বছর ধরে ঢাকা ক্রমশ কলকাতা থেকে আরও আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং নিজস্ব একটি সাহিত্যিক পরিচয় গড়ে তুলছিল। কলকাতার অতিথিরা বাংলা সাহিত্যে এই নূতন অবদানকে আবিষ্কার করতে আগ্রহী ছিলেন এবং জীবনের যে-স্পন্দন তাঁরা এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিলেন তাতে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। ঢাকার লেখক ও ছাত্ররা রাজধানীতে শিল্পের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি জানতে আগ্রহী ছিলেন। প্রত্যেকেরই কিছু বলার ছিল এবং অন্যজন তা শুনতে চাচ্ছিল।

ফলাফল হয়েছিল এই যে, ঘটে-যাওয়া ঘটনার অনুপাতে এই উৎসাহ অনেক বেশি ছিল। যদিও সরকারের সম্পাদিত চুক্তির অন্তঃস্থিত বিশ্বাসকে কার্যকর করার জন্যে এই উৎসাহ ছিল চমৎকার একটি উপায়, আমার মনে হলো না যে, পাকিস্তান সরকার এই উৎসাহের অংশীদার হবে। "ধর্ম বা রাজনীতি কোনটিই" ইয়েটস লিখেছেন —"এমন হৃদয় সৃষ্টি করতে পারে না, যে-হৃদয়ের গ্রহণক্ষমতা এমন যথেষ্ট হবে যে, সে, নিজেকে প্রাজ্ঞতার স্তরে উত্তরিত করবে অথবা ন্যায়ানুগ ও উদার জাতি গড়ে তুলবে।" এবং এই সর্বজনীনকরণ আয়ারল্যান্ড ছাড়া অন্য প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। এই সিম্পোজিয়াম একটি বাঙালিবোধকে নিশ্চিত করল যেখানে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতপার্থক্য কোনক্রমেই প্রাসঙ্গিক নয় ; এই ঐক্য একেবারেই অন্যরকম ঐক্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়

বেরিয়ে এলাম

অল্প ক'দিনেই আমরা দাঙ্গার কথা বলা ছেড়ে দিলাম, কাজে ফিরে গেলাম প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠানিক পড়াশুনোর উৎসাহ নিয়ে, যেন আমরা একটি দুঃস্বপ্নকে ছুড়ে ফেলে দিতে চাইছিলাম। কেবলমাত্র জগন্নাথ হল, যেটি ছিল একমাত্র হিন্দু ছাত্রাবাস, সেটি একেবারেই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। সামান্য ক'জন শেষ পর্বের ছাত্র যাদের পরীক্ষা একেবারেই আসন্ন, তারা ছাড়া, প্রায় সবাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হয়ে গেছে। এমন হলো যে ইংরেজি এম এ ক্লাসে একজন মাত্র হিন্দু ছাত্র রয়ে গেল। আমি তার অপ্রগল্‌ভ স্থৈর্য স্বীকার করছি। ছেলেটি লাজুক, একটু বেশি আগোচরে থাকতে চায় এমন একজন তরুণ, যার পরিবার ইতিমধ্যেই সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। আমি জানতে পারলাম যে ওর এই থেকে যাবার সিদ্ধান্তটি ছিল নিজের মতো করে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার একটি একান্ত প্রয়াস। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বস্তি বোধ করার মতো কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ঢাকার পথে ধুতি পরে চলাফেরা করা, এক পক্ষ আগেও যে-অচেনা পথচারীর ক্রুদ্ধ গোপন ছুরি ওর পেট চিরে ফেলতে পারত, এখন তার পাশে পাশে অজ্ঞাতে উদাসীনভাবে হেঁটে যাওয়া, অবশ্যই স্বস্তিহীনভাবে নিরন্তর মনে পড়িয়ে দিচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনের এই মসৃণ বহিরঙ্গের নিচের একটি আগ্নেয়গিরিকে। তবুও ওর মনে কোন ক্রোধ ছিল না এবং কিছুটা সংশয়ের সাথে ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে গ্রামের অভিযানে যোগ দেয়ার প্রস্তাব জানাল, যদি ওর উপস্থিতি সেখানে কোন কাজে লাগে।

অন্য হিন্দুরা যারা চলে যেতে পারত এবং আমি যাদের চিনতাম তাদের বেশির ভাগেরই এই পরহিতব্রতী মনোভাবটি ছিল। হয়ত তারাই সাহায্য করেছিল, কারণ প্রায় দুবছর পর আমি যখন আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বহিঃস্থ পরীক্ষক হিসেবে ফিরে এলাম, জগন্নাথ হলকে আবার এর ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিলাম। তখন জ্যোতির্ময় ছিল এর প্রাধ্যক্ষ। হিন্দু পরিবারগুলো স্পষ্টতই নিজেদের আবার স্থিত করেছে এবং তাদের ছেলেরা যারা ঢাকায় ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা করছে, তারা নিশ্চয়ই এখানে থেকে যাবে, এই প্রত্যাশাতেই তা করছে। সরকারের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানি হিন্দুরা তাদের দেশকে ভালোবাসত এবং পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানরা অসংশোধনীয়ভাবে অক্ষম ছিল একথা শিখতে যে, ধর্মের প্রথম নীতিবাক্য হচ্ছে "ঘৃণা"।

আমার জার্নালে স্মৃতিগত ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে-বছরের বাকি সময়ের স্মৃতি আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই তুলনামূলক প্রশান্ত সময়ের কথা যার স্বাদ গন্ধ হারিয়ে যাচ্ছে এই লেখায়। ছাত্ররা পড়াশুনো করছিল, শিক্ষকেরা পড়াচ্ছিলেন, যেন তাঁরা এসব উপভোগ করছিলেন ; একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক কাজকর্ম যেন নূতন জীবন ফিরে পেল। ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনী লড়াই লড়ল প্রচণ্ড কোলাহল ও তুমুল হই হট্টগোল করে। গত দুবছরের দ্বন্দ্বের যদিও অবসান হয়নি, তা এখন স্থগিত রইল। এর কারণ, আমার মনে হয়, যদিও সরকার দাঙ্গাটা বাধানোর ব্যাপারে একেবার নির্দোষ ছিল না, এখন দ্ব্যর্থহীনভাবেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই ছাত্ররা কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে সাথেই আরও একবারের জন্যে নিজেদেরকে দেখতে পেল কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করতে। অবশ্য আংশিকভাবে আরেকটি কারণ হচ্ছে বাস্তবিকভাবে যা-ই হোক-না কেন ছাত্রদের বেশির ভাগই হৃদয়ের গভীরে ছাত্রই রয়ে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েই তারা প্রাণ ফিরে পেত। কেবল মাঝে মাঝে ক্রোধের টুকরো টুকরো ফুলকি জ্বলে উঠে আমাদের মনে করিয়ে দিত যে, প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যারই সমাধান হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের তেমনি একটি মুহূর্ত আমার মনে পড়ছে, হয়ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে, কিন্তু কিছুটা আলো ফেলবে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর স্যার ফিরোজ খান নুন ছিলেন পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। অত্যন্ত কর্তৃত্বপরায়ণ একজন পাঞ্জাবি এই ভদ্রলোকের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনগুলো বাঙালিদের হৃদয়ে কোন ছাপই ফেলতে পারেনি, এবং তাঁর দিক থেকে তিনিও বাঙালি-চরিত্র ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর নীচ ধারণা গোপন রাখার কোন চেষ্টা করেননি। যাহোক, তাঁকে মানিয়েই নেয়া হয়েছিল এবং তাঁর নিষ্পাপ গতানুগতিক সমাবর্তন-ভাবনাও শান্ত নীরবতা নিয়েই সবাই শুনছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী স্বল্পতার বিষয়টিতে এলেন। সংকটটি এখন চরমে, তিনি বললেন, তবে পর্যায়ক্রমে ভালো পাকিস্তানি পণ্ডিতরা উঠে আসবে এই শূন্যতা পূরণ করতে এবং এই সময়টুকু আমরা অবশ্যই প্রতিবেশী বন্ধুদেশগুলো থেকে যোগ্য শিক্ষকের সাহায্য নেব। ছাপার অক্ষরে মনোভাবটি সাধু মনে হলেও "বন্ধুভাবাপন্ন" কথাটির ওপর অনুষ্ঠিত দৃঢ়তা প্রসঙ্গক্রমেই এমন অর্থ করে দিল যা হয়ে উঠল, "ভারত থেকে নয়"। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো ছাত্ররা যেদিকেই বসে ছিল সেসব দিক থেকেই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ অসন্তোষের গর্জন। এর সাথে কোন ওয়াকআউটের ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটল না, কারণ কেউই কোন গোলমাল বাধাতে চায়নি। এই ক্রুদ্ধ গর্জন ছিল মতদ্বৈধতার একটি তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যার মাধমে তারা যতটা স্পষ্ট করে সম্ভব জানিয়ে ছিল যে, তাদের ভীষণ প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বহু হিন্দু শিক্ষককে সরকারের কারণেই তারা হারিয়েছে এবং তাঁরা চায় যে তারা ফিরে আসুন।

হরফের প্রজাতন্ত্রে (Republic of Letters) ইংরেজি বিভাগ ছিল অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ। আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ শতবর্ষ পালন করলাম বেশ জাঁকজমকের সাথে বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধপাঠ, তাঁর কবিতার বাংলা অনুবাদ ও তাঁর ওপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে যার মধ্যে ছিল তাঁর পোট্রেট, মুদ্রিত লেখার প্রতিরূপ, Lake country ও অন্যান্য জায়গার ছবি— যেগুলো করাচি থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর একজন প্রতিনিধি নিয়ে এসেছিলেন, যাঁর বক্তব্য সবাই এমন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনেছে যেন তিনি কবিরই একান্ত প্রতিনিধি। এটা যেন স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব সংরক্ষিত সম্পদ নন। অন্যান্য বিভাগের সদস্যরা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী, তরুণ, মধ্যবয়সী ও প্রৌঢ়, সববয়সের লোকেদের উৎসাহী অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেল এই আয়োজন। সবাই মনে হলো ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ভালোবাসে, কারণ তারা স্কুলজীবন থেকেই ড্যাফোডিল, লুসি এদেরকে চেনে। তা ছাড়াও পৃথিবীটা খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করছিল যেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম কবি নিজে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নিসর্গে তাঁর জন্যে এই গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ জনসমাগমকে কীভাবে দেখতেন। এখানে কোথাও একটি পাহাড়ও দেখা যায় না, না কোথাও একটুকরো মেঘ, যদি না তা হয় ধুলোর মেঘ। বাঙালি কবির সন্ধ্যা হচ্ছে " গো-ধূলি"— যখন গোরুর পাল ঘরে ফেরার সময়ে পায়ের আঘাতে মাঠের ওপর ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকায়। ভেতরে বিজলি পাখা চলছে, বাইরে রেসকোর্সের মাঠ পেরিয়ে রাস্তার পাশে দীর্ঘ গুলমোরের সারিসারি বেষ্টনিতে যেন আগুন লেগেছে, মৌসুমি ফুলের স্বর্ণচ্ছটা লাল শিখার মতো জ্বলছে গাঢ় নীল আকাশের বিপরীতে। পাতার সবুজ সমারোহ তাকে এতটুকু ফিকে করতে পারেনি। কবি হয়ত ভাবতেন এই ধরনের রং-বিন্যাসই তাঁর রুথ এর প্রতারক প্রেমিকের মন ভেঙে দিয়েছিল। সব মিলিয়ে তাঁর গার্হস্থ্য ভালোবাসা ও ভক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্যে গরমটা ছিল দুঃসহ। তা সত্ত্বেও হয়ত এই ভক্তি ভালোবাসা পরিমিত জলবায়ুরই একচেটিয়া নয় ; আর সেজন্যেই শুধু বাংলা নয়, পুরো উপ-মহাদেশেই কবির জন্যে পাঠকহৃদয়ে আন্তরিক ও গভীর ভালোবাসা উৎসারিত হয়। পশ্চিমা সাহিত্যে সামগ্রিকভাবে এই ভক্তি ভালোবাসা এত দর্শনীয়ভবে চোখে পড়ে না। এস্কাইলাসের পর থেকে আমাদের কাহিনীকাররা বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছেন বৈবাহিক জীবনের বিপর্যয়, বিদ্রোহী প্রেম, পুত্রঘাতী পিতা ও ভ্রাতৃঘাতী ভাইয়ের কাহিনীর প্রতি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেইসব স্বল্পসংখ্যক মহান কবিদের একজন, যিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাকে দেখেছেন অভ্যস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে। আর যদিও ভারতীয় ইতিহাস অন্যদিক দিয়েও খুব দরিদ্র নয়, তবু ভারতীয় চিন্তাধারায় এসব বিষয় কবিতার জন্যে সবচাইতে উপযোগী।

পাঠ্যবইগুলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও প্রকৃতি নিয়ে যা লিখতে বলে ছাত্ররা সাধারণত তাদের রচনায় তা-ই লেখে বটে কিন্তু আমার মনে হয় তারা যেন শুরুতে তাঁর সাথে অনেক সহজ বোধ করে কারণ তিনি এমন দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখেন যে দেখার সাথে তাদের নিজেদের দেখারও খুব একটা অমিল নেই।

আরও ছিলেন বার্নার্ড শ। আমার সন্দেহ হলো সে-বছর শেষের দিকে তিনি যখন মারা গেলেন ব্রিটিশ জনগণ খুব বিচলিত হয়েছিল কি না। কারণ তখনও তাঁর খ্যাতি অমন শিখরে পৌঁছায়নি। কিন্তু ঢাকায় সেদিন সব স্কুল কলেজ ও দোকানপাট শোক প্রকাশ করার জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের বেতার তার সমস্ত পূর্বঘোষিত কর্মসূচি বাতিল করে দিল যাতে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিচিত ব্যক্তিও তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা জানাতে পারে বেতারমাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্যের পর দুমিনিট নীরবতা পালিত হয়। কিন্তু তা-ও যথেষ্ট মনে হলো না। ছাত্ররা পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে তারা ইংরেজি বিভাগ থেকে টেলিগ্রামে একটি শোকবার্তা পাঠাবে। কিন্তু কোন্ ঠিকানায়? উত্তরটি কঠিন ছিল, কারণ শ, যাঁকে সত্যিই আমরা আমাদের শোক জানাতে চাই, তখন ডাকবিভাগের আওতার বাইরে এবং তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একাকীত্বের মাঝে আমরা এমন কাউকে ভেবে পেলাম না যিনি আমাদের সহানুভূতির উত্তরাধিকারী হবেন। শেষ পর্যন্ত শোকবার্তাটি পাঠানো হোলো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে, যাঁর মাধ্যমে ইংরেজিভাষী পৃথিবীকে আমাদের গভীর দুঃখ ও হারানোর ব্যথা জানানো হলো, এবং যথাসময়ে তার একটি বিনীত প্রাপ্তিস্বীকারও ডাকমাধ্যমে এল। এই কাজটির ভেতরে কোন রাজনৈতিক আবেগ ছিল না : স্বাভাবিক ও সহজভাবে : বাঙালিদের কাছে সাহিত্য জাতীয়তাবাদের প্রাণস্বরূপ, আর তাই তারা ভাবতেই পারে না যে কোন জাতি তার বিখ্যাত কোন লেখকের মৃত্যু একজন রাষ্ট্রনায়ক বা রাজার মৃত্যুর চাইতে কম দুঃখের সাথে গ্রহণ করবে। তারা কোনদিন শ'র কোন নাটক দেখেনি এবং হয়ত নিজেরা মঞ্চায়িত না করলে দেখবেও না, কিন্তু তাদের ক্রমাধিকারতন্ত্রে (hierarchy) যা কিনা প্রচলিত ফ্যাশনে আচ্ছন্ন নয়, শ-ই ছিলেন শেকসপীয়ারের পর সবচাইতে মহান নাট্যকার।

* * *

সে-বছর শরতের ছুটিতে আমি হিমালয়ের পাদদেশে গেলাম পাহাড়ে চড়তে। আমাকে একজন বলেছিলেন কালিম্পং থেকে শুরু করতে এবং মিসেস পেরি, যিনি সেখানে হিমালয় হোটেলটি চালান (আশা করছি, তিনি এখনও চালান, সঠিক জানিনা), তাঁর কাছে একজন নবিশের জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য চাইতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালিম্পং হচ্ছে উত্তরবঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে সাগরস্তর থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে। শিলিগুড়িতে পাহাড়ের পাদদেশে আপনি একটি অনিশ্চিত যাত্রা শুরু করবেন, বাস অথবা গাড়িতে প্রায় ত্রিশ মাইল বা তেস্তা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত, যা শেষ হবে আট মাইলের মতো পাহাড়ে চড়ে, আর সে এমনই খাড়া পথ যে একসময় মনে হয় এটা যেন নিজেই নিজেকে পেঁচিয়ে ধরেছে। সেখানে একটি পায়ে-চলা পথও আছে যা দিয়ে চার মাইল চড়লেই হয়ে যায় ; আমি যখন সে-পথ দিয়ে নেমে এলাম এবং একজনের গাড়িতে করে প্রধান সড়কের পেছনে আসতে পারলাম, তখন আমি এমনই শক্ত হয়ে গেছি যে পরের প্রায় তিনদিন আমি আর ওপরের দিকে হাঁটতে পারিনি। ভুল হয়েছিল গাড়িতে চড়াটা। আমি এখন শিখলাম যে খাড়া কোন জায়গা দিয়ে হেঁটে নেমে গেলে পেশির চাপের ভারসাম্য রাখতে আবার হেঁটে ওপরে ওঠাটাই বুদ্ধির কাজ।

কালিম্পংয়ের হিমালয় হোটেলে বিছানা থেকে না উঠেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়া দেখা যায়। তবে সেই গৌরবময় দৃশ্য বিছানায় শুয়ে দেখা মানব- প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। শহরটি ছোট, দার্জিলিংয়ের মতো অত অভিজাত বিনোদন কেন্দ্র নয় এবং যেহেতু কেউ সেখানে সাজানো আনন্দের উপকরণ খুঁজতে যায় না তাই বেড়াতে আসা সঙ্গীরা খুব মজারই হয়। শহরটি প্রধানত তিব্বতি, নেপালি ও সিকিমীজ-অধ্যুষিত। অনেক বৌদ্ধ আছে সেখানে। শহরতলি দিয়ে হেঁটে গেলে সেখানে দেখা যায় ছোট ছোট বাঁশের বাড়িগুলো ঋজু খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন কেবল ইচ্ছেশক্তির জোরেই ঝুলছে, সেখানকার বৈশিষ্ট্যময় সংগীত হচ্ছে বাতাসে প্রার্থনা-পতাকার পতপত শব্দ।

সমতল থেকে এ এক ভিন্ন পৃথিবী, বিশেষ করে মেয়েরা একেবারেই অন্যরকম। একজন ইউরোপীয়ের কাছে মনে হবে সমতলের শহরগুলো যেন কেবল পুরুষ-অধ্যুষিত এবং বিশ বছর আগে কথাটি আরও সত্য ছিল। রাস্তায় লোকেরা আড্ডা মারছে, কেনাকাটা করছে, কখনও কাঁধে বাচ্চা নিয়ে ঘুরছে। মেয়েরা, খুবই দরিদ্র অথবা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর খুব মুক্ত মহিলারা ছাড়া, বেশির ভাগই বাড়ির ভেতরে থাকে। বাড়ির বাইরে তারা খুবই সতর্ক এবং এমন একটি সন্ত্রস্ত চেহারা নিয়ে থাকে যেন স্বামী ও সন্তানের বাইরে কোন কিছু জানাটা নিতান্তই অভব্যতা। এইসব পাহাড়ি মেয়ের মধ্যে আবার গুটিয়ে থাকা বা বশ্যতার কোন ভাব নেই। তাদের চলাফেরা ও চেহারাই স্পষ্ট করে দেয় যে বাড়িতে তারা তাদের স্বামীদের শাসন করে এবং বাড়ির বাইরে তারা তাদের সমকক্ষ। তারা কাজ করে, শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ, ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মতো ঘাড়, তাদের দেখা যাবে খাড়া ফুটপাতে, সিলিন্ডার আকৃতির বড় বড় ঝুড়ি পিঠে নিয়ে, কপালের সাথে সেগুলো বড় ফিতা দিয়ে বাঁধা, কাঠ, কয়লা সবজি বা বাচ্চায় ভর্তি। অথবা তারা রাস্তায় কাজ করছে, লোহার বিশাল রোলার টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর টেনে নেয়ার সময়ে গান গাচ্ছে। ছেলেরাও কাজ করে কিন্তু এত গান গায় না। তারা শক্তসমর্থ এবং কখনওই নেতিয়ে পড়ে না। উঁচু চোয়ালে আর ঝোড়ো বাতাসে পীড়িত টসটসে চেহারায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদেরকে সৎ ও উৎফুল্ল দেখায়। কখনও কখনও আপনাকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়বে। কিন্তু সেই হাসিতে বন্ধুত্বের কোন অভাব নেই। মনে হবে বুঝি আপনিই তার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে কৌতুকের বিষয় এবং সেই মজাটি আপনার সাথে ভাগ করে নিতে সে খুবই অস্থির।

সিকিম পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পদযাত্রা করার জন্যে অনুমতির প্রয়োজন হয় যা কিনা সেই সময়ে চীনের তিব্বত দখলের আগে, পাওয়া তত কঠিন ছিল না, এমনকি যদি পাকিস্তান থেকেও আপনি আসতেন। পথে রেস্ট হাউসও আগে থেকে বুক করে আসতে হত এবং একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হত যে তিব্বতে কখনওই যাব না। আমি তখনও পঞ্চাশের নিচে এবং খুব দক্ষ পর্বতারোহী না হলেও আমার নিজেকে একজন ভালো পথচারী মনে হত, কারণ ইংল্যান্ডে আমি তেমন সমস্যায় পড়লে দিনে তিরিশ মাইলও হাঁটতে পারতাম, একটি ঝোলা ও তাঁবু নিয়ে। যেহেতু পাহাড়ি গ্রামগুলোতে কিছুই কিনতে পাওয়া যায় না, মিসেস পেরি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রতিবার আগে থেকে খাবার ব্যবস্থা করে খাবারটা সাথে নিয়ে বেরুতে, কোনকিছুই নিজের কাঁধের ওপর না নিতে এবং দিনে আট মাইলের বেশি না যেতে। মনে-মনে যদিও ভেবেছিলাম হয়ত উনি আমার প্রাণশক্তিকে একটু কম করে ভেবেছিলেন তবুও যেমন বলেছিলেন তেমনি করার মতো বোধ আমার ভেতরে ছিল। পথটি ছিল গ্যাংটকের ভেতর দিয়ে। আট দিনের যাত্রা দু'রাত সেখানে বিশ্রাম নিয়ে এবং দুদিনে কালিম্পং ফেরার জন্যে মোটামুটি একটি সমতল পথ ধরে। আমি দুজন কুলি ও একজন রাঁধুনি ভাড়া করলাম যারা টিনের স্যুপ, পনির, জ্যাম, গুড়ো দুধ, মাখন, চাপাতির জন্যে ময়দা, এগুলো দিয়ে ঝোলা বোঝাই করল, ওদের নিজেদের খাবারসহ। এগুলো সবই প্রয়োজন ছিল ; সামান্য কিছু ডিম, কিছু ভুট্টার শিষ ও গ্যাংটকে একটি মুরগি ছাড়া পথে আর কিছুই পাওয়া যায়নি। পুরো সাজসজ্জায় মোট কত পড়েছিল আমার মনে নেই কিন্তু পশ্চিমা ধাঁচের বম্বে হোটেলে দুদিন থাকবার খরচের চেয়ে কম লেগেছিল। আবহাওয়া ছিল পরিষ্কার, একটু হালকা একটি তুষারঝড় ও মাঝে মাঝে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ছাড়া, তুষারচূড়াগুলো সবসময়েই সেখানে, যেন দৃশ্যমান অলৌকিক। কখনও কখনও মনে হয় বাতাসের মাঝে দৃশ্যত পা রাখার কোন অবলম্বন ছাড়াই যেন দাঁড়িয়ে আছে। দিনগুলো গনগনে গরম, রাতগুলো ঠাণ্ডা। সন্ধেবেলায় আমি অতিথিশালায় পৌঁছে দেখতাম, কুলিরা ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে, কাঠের আগুন জ্বলছে এবং রাঁধুনি বুদ্ধিমান, মটরশুঁটি ও স্যুপ গরম করছে। তারপর রাতের খাবারশেষে অবিশ্বাস্য সেই সূর্যাস্ত শেষবারের মতো আবার দেখা, আগুনের কাছে খানিকক্ষণ বসা এবং কাঠের গুঁড়ির মতো পরে একটি ঘুম। সকালের নাস্তায় গরম গরম চাপাতি, একটি ডিম আর চা। আর বুদ্ধিমান সবসময়েই দুএকটি বাড়তি চাপাতি বানাত, দুপুরে পনির বা জ্যাম দিয়ে খাবার জন্যে, সেটি তখন ভারী আর ঠাণ্ডা। শুনতে মনে হচ্ছে বটে যেন মজাটা একটু কঠোর প্রকৃতির ছিল কিন্তু সেই উদ্দীপ্ত আনন্দ-উল্লাসের মাঝে, আর পাহাড়ের চূড়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্ছল সাথীদের মাঝে মনে হত জীবনে আর কিইবা চাইবার আছে, অন্তত ওই বারোদিন তেমনি লেগেছিল। কুলিরাও যারা ওই দূরত্ব দিনে দুবার অনায়াসেই পার হতে পারত ঝোলাঝুলি সবসুদ্ধ, দেখা গেল খুবই উপভোগ করছে,আমার মতোই। ওদের একজন হৈহৈ করে আমাকে ভোর পাঁচটায় ডেকে তুলল যাতে কিছুতেই সেই অবর্ণনীয় অবিস্মরণীয় সূর্যোদয় দেখার সুযোগ না হারাই।

কদিনেই আমি বুঝতে পারলাম মিসেস পেরির হাঁটার ব্যাপারে পরামর্শটি খুবই সঠিক ছিল ; সম্ভবত সমুদ্রস্তরে টার্কিশ গোসলও, যেটা পূর্ববাংলায় সবসময়েই সম্ভব, হিমালয়ের জন্যে কিন্তু সেটি সবচাইতে ভালো প্রশিক্ষণ নয়। আমার মনে হয় না আমি বারো হাজার ফিটের ওপরে উঠেছিলাম, কিন্তু ঐ অক্সিজেন-স্বল্প বাতাসে ঐ উচ্চতায়ও এক বা আধ মাইল ঐ সামান্য ঢাল বেয়ে ওপর-নিচে হাঁটা, আমাকে ক্লান্ত করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তবে সবসময়েই সকালে আবার প্রাণশক্তি ফিরে আসত।

লাসা থেকে গ্যাংটকে এটিই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান সড়ক। পাথর বিছানো খচ্চর যাবার পথ, ছ'ফিট চওড়া, এর বেশির ভাগটিই বাঁশের খাড়া ঝাড় ও জলপ্রবাহের মাঝ দিয়ে নেমে আসা সরু ঘোরানো পথ ; যখন কেউ ওপরে তাকায় দেখতে পায় ঘন সবুজ ঝোপের আড়াল, আর নিচের দিকে তাকালে দেখতে পায় সচল মেঘের অতল গহ্বর, সাথে হয়ত শুনতে পায় ঝরনার কলধ্বনি, দূরের কোন চূড়া থেকে নেমে আসছে, আর সেটা সব সময়েই খাড়াভাবে উঠছে বা নামছে। চামড়ার সূক্ষ্মরন্ধ্রের ভেতর দিয়ে সেই দৃশ্যের সৌন্দর্যটুকু আমায় ভেতরে টেনে নিতে হয়েছিল কারণ প্রতিটি পাথর ছিল আকারে ও আকৃতিতে আলাদা, আর দূরে দূরে এবং পায়ের পাতা থেকে চোখ তোলার মানে হলো ভাঙা গোড়ালি। খচ্চরদের চলার পথ এটা, ওরা এটা পছন্দই করে। একবার একটি খচ্চরচালক কাফেলার সাথে পথের মাঝে দেখা হলো, তারা আমাদের পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যখন ওরা আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন পথের খাড়া দিকে সরে আসাটাই জরুরি ছিল, কারণ, খচ্চরগুলো কোন ভদ্রতা জানে না, আর ওদের পিঠে বসানো চওড়া ঝুড়িগুলো পুরো জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল। খচ্চরচালকরা ছিল যেন হালকা অপেরার কোরাস-এর মতো। লাল ফিতে দিয়ে শুয়োরের লেজের মতো ঝুঁটি বেঁধেছিল তারা লম্বা চুলে। উজ্জ্বল ঝলমলে রঙের কম্বল কাঁধের ওপর থেকে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঝোলানো আর নকশিকাটা চামড়ার খাপ থেকে বেড়িয়ে আছে সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা ছুরি, পায়ে কালো ফেল্টের ঢাকনা দিয়ে জমকালো জুতো অ্যাপ্লিকের নকশিকাটা, যা, যে-কোন প্যারিস ফ্যাশন শোকে মাতিয়ে দিতে পারে। সব নয়, কিছু-কিছু খচ্চরের গায়ে ঘন্টি-বাঁধা জমকালো সাজ, এবং প্রায় সবসময়েই তাদের কোন-একটির ওপর স্থির হয়ে বসে আছে একটি ঈর্ষণীয় ছোট্ট বালক, যাকে দেখলেই বোঝা যায় সে জানে সে কোথায় বসে আছে, পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু স্থানে।

পুরুষেরা আমার দিকে তেমন কৌতূহল নিয়ে তাকাত ঠিক যেমনটি তাকাতাম আমি আর পার হয়ে চলে গেলে স্কুলের মেয়েদের মতো বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠ হাসিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেটে পড়ত, তাদের পরিচিত পথের ওপরে একটি অদ্ভুত গেঁয়ো বস্তু দেখতে পেয়ে।

জঙ্গলটি ছিল ছোটবড় নানা ধরনের ও আকারের প্রজাপতিতে পূর্ণ ; এত বিচিত্র রঙের সমাহার আমি আর কোথাও দেখিনি। মাঝে মাঝে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে একটি মালভূমির ওপরে এসে দাঁড়াতাম, একটি হ্রদের পাশ ধরে মাইলের পর মাইল হাঁটতাম, অথবা পার হয়ে যেতাম বাড়ন্ত ঘাসবিছানো বিস্তীর্ণ এলাকা, সেখানে বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড এসে জমেছে, যা আমায় মনে করিয়ে দিত ইর্য়কশায়ারের উপত্যকার কথা। কখনও কখনও কোন গিরিসংকটের ওপর দিয়ে সরু দড়ির মতো সেতু বিছানো। একবার একটি সর্পিল জলপ্রপাত পার হয়ে গিয়েছিলাম, মনে পড়ছে, যার কিনারে একটি ফুলের মালা বিছানো ছিল কোন দেবতার স্মরণে।

গ্যাংটকে একজন বৃদ্ধলোক আমাকে স্বাগত জানালেন, যিনি মিসেস পেরির বাবা, তিনি জানতেন যে আমি হিমালয় হোটেল থেকে এসেছি কারণ আসার আর কোন জায়গাই ছিল না। অর্ধেক তিব্বতি, অর্ধেক স্কটিশ, একসময়ে তিব্বতে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য কমিশনার, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড এই অংশে খুব স্বচ্ছন্দে আছেন এবং প্রত্যেকে তাঁকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। তাঁকে ধন্যবাদ যে সবচাইতে বড় বৌদ্ধমন্দির আমার দেখা হয়েছিল এবং একটি উচ্চকক্ষ আবাসে সঞ্চিত তাদের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের মুখোশ দেখার অনুমতি পেয়েছিলাম। দেয়ালের মাঝ থেকে ওরা যেন তাকাতে লাগল, প্রত্যেকের মুখে ভুতুড়ে রহস্যময়তা, অন্য কারও সাথে যা মেলে না, প্রতিটি মুখে অতীত অভিজ্ঞতার এমন এক সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি যা কোন ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশ করাই জটিল কাজ ; ভালো ও মন্দের সরলীকরণের ঊর্ধ্বে, সমবেত এক শক্তি।

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড জানালেন প্রথামত আমার উচিত হবে রাজপ্রাসাদে গিয়ে আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কিন্তু সেজন্যে মহামান্য রাজাকে উপহার দেয়ার জন্যে আমার একটি সাদা সিল্কের স্কার্ফ আনা উচিত ছিল। আমার ব্যাগে কোন স্কার্ফ নেই। অতএব তাঁর উপদেশে আমি রাজসন্দর্শনে গেলাম না। তার বদলে আমার উদ্দেশ্যের সরলতা প্রদর্শন করতে সেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাড়ি গেলাম। তাঁরা চমৎকার অতিথিপরায়ণ গৃহকর্তা ও কর্ত্রী এবং আমাকে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব ক্ষীণ নমনীয়তা নিয়ে যাতে প্রত্যাশা ছিল দুঃখবোধের। এটাই স্বাভাবিক ভারতীয় মনোভাব। যদি করাচি সেই সময়ে বাতিকগ্রস্ত সন্দেহের চোখে ভারতকে দেখে থাকে তবে দিল্লিও পাকিস্তানকে একটি সমস্যাপূর্ণ ভুলের পরিণতি হিসেবেই দেখতে চাইত, তার বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার চাইতে ; কিন্তু এই মনোভাব কিছুটা অন্যভাবে হলেও আমার সমালোচনাকে অনেকটা অনিশ্চিত রূপ দিল এবং আমি পূর্ববাংলায় যে-সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখেছি সে-সম্পর্কেই বেশি করে বললাম। 'খুবই অনুকূল'— এই ছিল তাদের না-বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্যটি, সহজেই যা আমি তাঁদের মনের ভেতরে পড়তে পেলাম, যদিও তাঁরা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

ফেরার পথটি যদ্দুর মনে পড়ে সহজ, নরম আর বিশাল গাছের ছায়াচ্ছন্ন ঘন একটি ধ্যানী প্রকৃতির পথ। একবার মাত্র, কেম্বিসের জুতো পায়ে আমি একটি মরা ডালের টুকরোয় আঘাত করেছিলাম যা কিনা মুহূর্তে বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে গেল, রেখে গেল এক ধরনের তীব্র পীশকাঁপানো বোধ, যেখানে পায়ের অবশ হয়ে যাবার কথা— একটি প্রমাণ সাইজের সাপ। অতঃপর কালিম্পঙে প্রত্যাবর্তন এবং আরও এক সপ্তাহের বিলাসী আলস্যের পর— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিভাগের প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে-কারু জন্যে ঘিরে-থাকা ছোটখাটো বিরক্তিকর ব্যাপারগুলো তখনও ছিল ; অসংখ্য কমিটি ও উপকমিটি, একটি জরুরি কাজের ভেতর আরেকটি জরুরি কাজের ঢুকে পড়া, ব্যক্তিগত সমস্যার সুতো যা কিনা যে-কোন কারণেই হোক বিভাগীয় প্রধানকেই ছাড়াতে হবে। আমার মনে হয় না এই সমস্যাগুলো কেবলমাত্র পাকিস্তানি ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে বর্তমান, তবে সেগুলো এখানে আগাছার মতো বেড়ে ওঠে এখানকার বিশেষ মানসিক আবহাওয়ার কারণে। ওই ধরনের অনেক সাক্ষাৎকারের একটিতে আমার মনে পড়ছে, একটি স্বপ্নময় মুহূর্ত এসেছিল যখন শূন্য বাতাস ঘিরে লালফিতার পেঁচিয়ে ওঠাকে মনে হয়েছিল শয়তান বা চরম প্রতিবন্ধকতাবাদীর মূর্তিমান রূপ, প্রাতিষ্ঠানিক পোশাকে একটি বিশুদ্ধ নেতিবাচকতার শরীরের মতো। সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছিল এবং সেটা বোঝা যাচ্ছিল বিভাগীয় প্রধানদের ওপরে জলপ্রপাতের ধারার মতো নেমে-আসা প্রজ্ঞাপনে। সেগুলোর ভাষা সাধারণত অদ্ভুত একটি সূত্র অনুসরণ করত যার শুরুতে বড় করে লেখা থাকত "গোপনীয়", কালো মোটা অক্ষরে আর নির্দেশ থাকত এর বিষয়বস্তুকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রচারণা দেয়ার। অদক্ষতা অথবা মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি? অভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলো কোন সূত্রের সন্ধান দিল না কারণ প্রচারণা ও গোপনীয়তা সাধারণত দেখতে খুব নির্দোষ। এগুলো কেবল মনে করিয়ে দেয়া যে, চাকুরিটি কোন-না-কোনভাবে এমন একটি যন্ত্রের অংশ যেটি নিজের সন্দেহজনক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্যান্যদের মতো আমিও সেই যন্ত্রটাকে ভুলে জীবনকে উপভোগ করতে শিখে গিয়েছি। বিভাগ খুব ভালো চলছিল, পূর্ণ প্রাণশক্তিতে, কোন তিক্ততা ছিল না, চমৎকার সহকর্মীদের সবাই ছিল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মানের সংহতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল ; এর একটি গ্রহণযোগ্য অংশ হওয়া যে-কারও জন্যেই গর্বের ব্যাপার ছিল। যদি খুব বেশি কাজ করতে হত, আমি মনের ইচ্ছেতেই তা করতাম। আর সুন্দর কথাবার্তা যা একটি সামাজিক বিনোদন হিসেবে আমি উপভোগ করতাম, তার কোন অভাব ছিল না। এবং নাগালের মধ্যেই ছিল ছুটি সিকিমে পাহাড়ে চড়ার মতো। কেবলমাত্র সংশোধনাতীত, খুঁতখুঁতে ও ক্ষুব্ধ কোন লোকই এমন জীবন উপভোগ করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই মুহূর্তের জন্যেও ভাষার দ্বন্দ্বটি একটি মজার পর্যায়ে আছে। দৃশ্যত সবদিক থেকেই ছাত্রদের ১৯৪৮ সালের দাঙ্গাটি পরাজয় বরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে জনমতের শক্তি প্রকাশ করে সেটা করাচিকে আরও পরোক্ষ কোন কৌশল প্রয়োগ করতে সচেষ্ট করেছে। তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্যে বাংলা হরফের বদলে আরবি হরফ ব্যবহারের প্রস্তাব এল। বাংলার ব্যাপারে সাধারণভাবে আপত্তি যে, অক্ষরগুলো শব্দকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে না ; আমার কাছে সত্য হলেও সেটা বিভ্রান্তিকর মনে হলো, কারণ কেউই ছাপার বই পড়ে মাতৃভাষার উচ্চারণ শেখে না। ইংরেজি শব্দের সাথে রোমান চরিত্রের কী সম্পর্ক? তারা যদিও বানানকে বিভ্রান্ত করে কিন্তু ইংরেজের ইংরেজি উচ্চারণকে তারা প্রভাবিত করতে পারে না এবং সব ইংরেজকে একই শব্দ একইভাবে উচ্চারণ করাতেও পারে না। তবে সত্যটা এই যে বাংলা হস্তলেখে অজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মকে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পুরোটা থেকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং যদিও পাঞ্জাবিরা এতে আপত্তির কিছুই দেখছে না, পূর্ববঙ্গীয়দের জন্যে এটা হবে খুব বড় আত্মত্যাগ। আরেকটি উদ্ভাবনী প্রস্তাব ছিল ভাষাটিকে "সংস্কৃতমুক্ত" করে বিশুদ্ধ করা; বেশির ভাগ উত্তর ভারতীয় ভাষার মতোই এটাও প্রধানত সংস্কৃত থেকেই আসা, যদিও প্রচুর স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বরবিভেদ এতে আছে এবং অন্য ভাষা, যেমন, ফারসি ও আরবি থেকে প্রচুর শব্দ এখানে গৃহীত হয়েছে। তত্ত্বটি ছিল যত বেশি সম্ভব শব্দ সংস্কৃতর বদলে এসব ভাষা থেকে নেয়া যায়। এটা অনেকটা হবে ইংরেজি ভাষা থেকে অ্যাংলো স্যাক্সন শব্দ আগাছার মতো তুলে ফেলে তার বদলে ফরাসি বা ল্যাটিন ভাষার মূল থেকে নিয়ে শব্দ বসানো (এভাবে আমার মনে হয়, additionally শব্দটি and শব্দের কাজ করবে)। রেডিও পাকিস্তানকে এর উদাহরণ স্থাপনের জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো এবং আমার মনে পড়ছে একদিনের কথা, যেদিন রেডিও সেটের ভেতর থেকে অস্বাভাবিক সেই পরিভাষা বেরিয়ে এল, এবং যারা শুনেছিল প্রত্যেকেই সেদিন চাপা হাসি হেসেছিল। কথিকার পরিচালক ছিলেন দেশপ্রেমিক বাঙালি এবং যদি একটি অরুচিকর আদেশকে সোজাসুজি অমান্য করা না যায় তা হলে সেটি অন্যভাবে মেনে চলা মানে আক্ষরিক যথার্থতা রক্ষা করা। এরপর, আমার বিশ্বাস পরিকল্পনাটি হারিয়ে গেল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এইসব সংঘাতের যা সামান্য জ্ঞান আমার হয়েছিল তা জনশ্রুতি থেকে, কারণ আমি ছিলাম সংশোধনের অতীত দুর্বল একজন ভাষাবিদ এবং বাংলা বা উর্দু কোন ভাষার সহজতম মন্তব্যটিও বুঝতে অপারগ ছিলাম। হতে পারে ইংরেজিতে অস্বাভাবিক অল্প বয়সে আমার শিক্ষা শুরু হয়েছিল বলে আর তারপর ক্ল্যাসিকাল শিক্ষা পেয়েছিলাম বলে, একটি বিদেশী ভাষা পড়ার জন্যে আমি পুরনো ব্যাকরণ ও অভিধান পদ্ধতিটিতেই সঠিকভাবে এগোতে পারি যেটি এখন সঙ্গত কারণেই অচল এবং কেবল কানে শুনে খুব কমই বুঝতে পারি। যেদেশে প্রায় প্রত্যেকে দ্বিভাষিক সেখানে এটা হয়ত কোনভাবে একেবারে অচল করে দেয় না কিন্তু অবশ্যই একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক। প্রায়শই সভাসমিতিতে যখন প্রত্যাশা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় যে আমি কিছু বলব, আমি বাংলা বক্তৃতাগুলো সাধ্যমতো যতটুকু বুঝতে পারি সেগুলো থেকে নিয়ে ইংরেজিতে আমার বক্তব্যটি দিই যা হয় অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। এটুকু বুঝতে পারি যে অন্যেরা হয়ত আমার কথা বুঝতে পেরেছে কিন্তু জানতে পারি না আমার বক্তব্যটি যথার্থ ও উদ্দীপক নাকি কেবলমাত্র পূর্বে উচ্চারিত মনোভাবেরই চর্বিতচর্বন।

কিন্তু আমি ভাষাসচেতনতা সম্পর্কে আমার চারপাশের সব ব্যাপারে অস্বস্তিকরভাবে অবগত ছিলাম এবং আমার নিজের বিষয়টিতেও এর একটি আপেক্ষিক অবস্থান ছিল। বাঙালি লেখকরা মুসলিম বাংলার একটি নূতন ভাবমূর্তি তৈরির প্রয়াসে শব্দ ও প্রবাদভাণ্ডারের অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডে আমি কোনভাবে যোগ দিতে পারিনি কিন্তু লিখিত ও কথ্যভাষার সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের প্রকাশিত উত্তেজনাকে বুঝতে পেরেছিলাম। এটা টিউডর ইংল্যান্ডে মৌখিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে আমার পড়াশোনাকে প্রাণবন্ত করে তুলল, আইরিশ সাহিত্যের রেনেসাঁর কথা বলার সময়ে কণ্ঠস্বরের ওঠানামাকে ব্যঙ্গ না করে ধরতে চাওয়ার সেই চেষ্টা কবিতার ভাষা সম্পর্কে সেই শেষ-না-হওয়া বিতর্কের ধারা, যা চলে আসছে ফিলিপ সিডনি থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। নিজেদের নয় এমন একটি সাহিত্যে এই ব্যাপারটি বাঙালি ছাত্রদের ভাষাবোধকে উজ্জীবিত করেছিল। যখন কোন ছাত্র তার রচনায় পোপের হোমারের "ভাষার কৌমার্য" সম্পর্কে লিখেছিল তখন সে, ধ্রুপদী লেখকদের ঐতিহ্যগত শুদ্ধ বাংলার সাথেই সেটাকে মিলিয়ে ফেলেছিল, একটি সাহিত্যিক ভাষা যা ব্যবহার হয় পেগাসাস বা পৌরাণিক সেই অলৌকিক ঘোড়াকে বশ মানাতে।

আমি P.E.N. সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম যার বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য, সেখানে বেশ ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলায় তাঁদের মতামত বলছিলেন। আলোচনাটি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু আমি দ্রুতই খেই হারিয়ে ফেললাম এবং বাচ্চাদের মতো ক্লাসে বসে বসে স্বপ্ন দেখছি এমন বোধ করছিলাম, যখন হঠাৎই আমাকে কথা বলতে আহ্বান জানানো হলো। যা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট ভালোভাবে বুঝতে না পারার জন্যে ক্ষমা চেয়ে আমি কিছু মন্তব্য করলাম যা আমার মনে হয় শুদ্ধ কাণ্ডজ্ঞান থেকে এসেছে, যেমন সৃষ্টিশীল ভাষা কোন কমিটি বা নিয়মনীতি দিয়ে নির্ধারিত বা পরিকল্পিত করা যায় না। নিজের লেখায় একটি জীবন্ত কণ্ঠস্বরকে আনতে হলে একজন শিল্পীর স্বাভাবিক কথাবার্তার প্রতি কান খুলে রাখতে হবে, বিশেষ করে যেগুলো বইয়ের মতো করে প্রকাশ করা হয় না এবং তাঁর শৈলীর ধরন অনুযায়ী সেই সুর ও প্রবচনকে বুনতে হবে। প্রশংসার ঝড় ছিল অপ্রত্যাশিত। আমার মনে হলো শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দ সভার মূল বক্তব্যটির ইংরেজি সারসংক্ষেপ শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সভাশেষে অভিনন্দন-এর কোরাস আমায় ঘিরে ধরল, "চমৎকার বক্তৃতা", "আমি বলছি তুমি একজন ভালো তার্কিক"। এদের বেশির ভাগই ছিল ভুল লোক, বাম বিপ্লবী, দৃষ্টিআকর্ষক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেজোদৃপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং এমন অনেকে, আর আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সাধারণ মন্তব্যগুলো নিশ্চয়ই কোথাও কোন একটা জায়গায় আঘাত করেছে। পরদিন সকালে যখন ছোট একটি দল একথা জানাতে এল যে তারা আমার সাহসকে কতটা শ্রদ্ধা করে তখন আমি ব্যাপারটির আরও গভীরে গেলাম এবং জানতে পারলাম যে অজ্ঞাতে আমি প্রধান সচিব তাঁর কর্তৃত্বের সমস্ত ওজন নিয়ে যে-ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তার ঠিক বিপরীতে সোজাসুজি বক্তব্য দিয়েছি। তিনি এত প্রভাবশালী ছিলেন যে উচ্চাকাঙ্খি বাঙালি লেখকদের পক্ষে তাঁর মুখের ওপরে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, আমি খুব ভালোভাবে ও সঠিকভাবে সে-কাজটি করেছি।

ভুলে গেছি ঠিক সে-বছর না তার পরের বছর আগাখান তাঁর উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে একবার দেখেছিলাম যখন তিনি সম্মানসূচক ডিগ্রি নিতে ঢাকায় এসেছিলেন, একজন বয়স্ক আকৃতির ব্যক্তি, গাঢ় ছড়ানো পোশাকের ফাঁকে তাঁর খুবই সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলেন। সবার মতো আমিও জানতাম তাঁর অবিশ্বাস্য রকম ঐশ্বর্যের কথা, তাঁর রেসের ঘোড়ার আস্তাবলের কথা, তাঁর নিজস্ব মুসলিম সম্প্রদায়ে তাঁর একান্ত পবিত্র ঐশ্বরিক ভাবমূর্তির কথা (যে-সম্প্রদায় পাকিস্তানে প্রভাবশালী নয়), এবং তাই অভিভূত হওয়ার প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে ভালো ব্যাপারটি হলো এই যে, ঐ চকিত দৃষ্টিপাতে আমার মনে যা রেখাপাত করেছিল তা ওঁর অর্থ নয় বরং তাঁর মনটি, একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের হৃদয়, একটু যেন তোষামোদ-ক্লান্ত।

পাকিস্তানি সংবাদপত্রের কাছে তাঁর দীর্ঘ চিঠিটি ছিল একটি বিস্ময়। তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন— উর্দু নয়, আরবিকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে। উর্দু, সবাই জানত যে একটি জারজ ভাষা। যার উদ্ভব হয়েছিল সেইসব মুসলিম হানাদার বাহিনীর বহুভাষিক অপভাষা থেকে যখন তাদের নিজেদেরকে হিন্দু অঞ্চলগুলোতে বোধগম্য করে তুলতে হয়েছে। এই ভাষাটির কোন উত্তরাধিকারের মর্যাদা নেই, নেই পৃথিবীতে এর কোন স্থান। একটি সম্ভাবনাময় বৃহৎ ইসলামি শক্তির উচিত তাদের নবীর ভাষাতেই প্রকাশ্যে কথা বলা।

মনে পড়ছে না যে কেউ তাঁর সেই উপদেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিল। হয়ত এটি অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত। কিংবা হয়ত তা-ও নয়, সেই গুরুর মুহূর্তে, যখন ভবিষ্যতের জন্যে কোন নকশাই তৈরি হয়নি। এই ছিল পাকিস্তান, অতীত যার ভবিষ্যতকে বাধাহীনভাবে রূপ দেবে। একটি জাতি যে কিনা ইসলামের নীতিগুলো আধুনিক বিশ্বে বাস্তবায়িত করবে আর আফ্রিকার, ও দূর ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমরা তা তাকিয়ে দেখবে। যদি এই দেশকেই একটি মুসলিম রেনেসাঁর নেতৃত্ব দিতে হয় এবং ঐক্যের পথনির্দেশ করতে হয় এবং মিশরে তখনও একাজের জন্য নাসেরের আবির্ভাব ঘটেনি, কোন্ ভাষায় তবে তারা তাদের সহকর্মী অথবা অবিশ্বাসীদের সাথে বাক্যালাপ করবে, আরবি ছাড়া? এই সিদ্ধান্ত হয়ত সবগুলো প্রদেশকে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের অধিকার সমভাবে রাখার ক্ষমতা দিত এবং তাদেরকে একটি আধিরাষ্ট্রিক বা আধিজাতিক বিশ্বাসও দিত। আগাখান সম্ভবত তাঁর নিজের বিচ্ছিন্ন বা দূরগত অবস্থান থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, যা করাচি দেখতে পায়নি। এবং তা হলো, "সবার জন্য উর্দু" একটি স্বপ্ন যা অবাস্তব কিন্তু কাল্পনিক বা উদ্দীপক কিছু নয়। করাচি যেন, উর্দু ছাড়া ভাবতেই পারছিল না। তাতেই বোঝা যাচ্ছিল যে পাকিস্তান এখনও মানসিকভাবে ভারতের দাসত্বে বন্দি হয়ে আছে। কিন্তু কোন প্রদেশেই এমন কোন ধীমান রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না যিনি অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে বা ভারতবিদ্বেষের আচ্ছন্নতার ওপরে উঠে ভাবতে পারবেন ; এবং সময় চলে গেল ; যদি কেউ কখনও আসত!

আমার একটু অনধীকৃত পূর্বানুভূতি হচ্ছিল যে ভাষাপ্রশ্নটি রক্তপাতে পৌছাবে। তখনকার অপেক্ষাকৃত শান্ত বিরতিতে এমন অনুভূতির জন্যে আমি হয়ত কোন বিমূর্ত কারণ দেখাতে পারব না, কিন্তু এর জন্যে কোন একক অলৌকিক উদ্ভাসের প্রয়োজন হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানকে তার নিজের ভাষার প্রতি এই একগুঁয়ে আসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের কোন ইচ্ছা ছিল না। শিক্ষিতদের কাছে ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু অশিক্ষিতরাও, যারা যে-কোন অবস্থাতে বাংলাতেই কথা বলে যাবে, পুরোপুরি তাদের সাথেই ছিল, কারণ তাদের দুঃখ-দুর্দশা ছিল অনেক আর ভাষা সে-সবের প্রতীক হয়ে উঠল। বাঙালিদের কাছে ভাষা, লিখিত ও কথ্য দুটোই, ছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভাববিনিময়ের একটি মাধ্যম, যেন সর্বসমন্বিত আত্মার এটি দেহ। ঘটনাক্রমে উর্দুর চেয়ে বাংলা একটি উন্নততর ভাষা, এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অভিব্যক্তিপূর্ণ।

পাঞ্জাবিরা এই ধরনের আবেগকে বুঝতেই চাইল না। তারা নিজেদের প্রাধান্য অর্জন ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেনি। বাঙ্গালীদেরকে তাদের নিজেদের জায়গায় রাখার জন্যেই যে কেবল উর্দূ তাদের অস্ত্র ছিল তা-ই নয়, বরং ভয় ছিল বাঙালিদের একটি বিজয় (যেমন হয়েছিল পরে) পশ্চিম পাকিস্তানি অন্যভাষী সম্প্রদায়গুলোকেও তাদের নিজস্ব স্বীকৃতির জন্যে দাবি জানাতে প্ররোচিত করতে পারে এবং এভাবে ঐক্য আরও বিনষ্ট হতে পারে। এ ছাড়াও আমি যতটুকু সঠিকভাবে তাদের মনোভাব পড়তে পারি মনে হয়, তারা বাঙালিদের দেখেছিল দুর্নীতিপরায়ণ হিন্দু মূল্যবোধের প্রবাহ হিসেবে, হিন্দু ষড়যন্ত্রের কথা বাদই দিলাম, যে-প্রবাহ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের পবিত্রতার ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য যত ঐশ্বর্যশালী হবে, ততই খারাপ। সভ্যতার যা-কিছু প্রয়োজন, ইসলাম তা-ই এবং তাদের পক্ষে সম্ভব হলে তারা দু বাংলাকেই পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলবে। আমার মনে হয়েছে এটা বুদ্ধির ভ্রান্তি প্রসূত চিন্তা; কিন্তু আমিও মুসলিম নই, আর পাঞ্জাবিরাও সেই প্রথম জনগোষ্ঠী নয় যারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেদের প্রভুত্বের লালসাকে যুক্তিসঙ্গত করে তুলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সমস্ত ঘটনায় আমার নিজের অবস্থান মোটেই কৌতূহলোদ্দীপক ছিল না, কেবল এই ব্যতিক্রম ছাড়া যে, যদি আমি এই স্মৃতিগুলোর ইতি টানতে চাই তবে আমাকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে মঞ্চ ত্যাগ করতে হবে এমন একটি সময় যখন একটি সহকারি চরিত্র হিসেবে আমি যথেষ্ট ভালোই করছিলাম। জানি না ঠিক কবে থেকে আমি সচেতন হলাম যে আমি মনে-মনে ঢাকা ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে শুরু করেছি। প্রথমে অলসভাবে পরে ক্রমাগত অনেক গভীরভাবে, আমি নিজের ভেতরে একটি তর্ক চালিয়ে যেতে লাগলাম, অনেকটা এমন, "তুমি যখন ইংল্যান্ড ছেড়েছিলে, তুমি চেয়েছিলে ভারতে কাজ করবে। এবং ১৯৪৭ -এর পাকিস্তান হয়ত দেখতে ভারতের একটি খণ্ডিত অংশের মতো ছিল, কিন্তু এখন আর তা নয়। তোমাকে যদি কোন দিকে সমর্থন দিতেই হয় তা হলে বরং তুমি সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটির দিকেই থাকো।

"আমাকে কোন পক্ষে থাকতেই হবে? একটি আছে— 'হরফের প্রজাতন্ত্র', ছাত্ররা সর্বত্রই ছাত্র, এবং এই পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্ররা আমার প্রাণ জয় করেছে আর আমাকেও তাদের ভালোবাসা দিয়েছে। আমার এখানে ভালো লাগে।"

— "তুমি কোনভাবেই রাজনীতিকে উপেক্ষা করতে পারো না।"

— "আমি একজন শিক্ষাবিদের জীবন বেছে নিয়েছি, রাজনীতিবিদের নয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সেটাই বোঝায়। আমি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব জীবনপ্রণালী স্থির করতে হবে, বাইরের কারও চাপিয়ে-দেয়া উপদেশে নয়— যদিও আমি আশা করি যে আমি ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচারের পাশে দাঁড়াব যেটা নিয়ে আমি চিন্তিত।"

- "তুমি সরকারকে বিরক্ত করছ।"

— "তারা আমাকে এখনও সেকথা বলেনি। এবং আমি তাদের কর্মচারী নই। আর আমি কিছু করিওনি। খুব খারাপ হলে তারা কেবল মুনীরের মতো আমাকে ভুল লোকের সাথে মেশার জন্যে দোষী করতে পারে (মনে হয় বাঙালিদেরকেই সাধারণভাবে ভুল লোক বলে ভাবা হয়, বিশেষ করে যাদের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ আছে)। আর আমার যুক্তরাজ্যীয় পাসপোর্ট আমাকে রক্ষা করবে এরকম একটি অলীক অভিযোগের দায়ে জেলে নির্জীব হয়ে পড়া থেকে।"

— "হয়ত করবে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার অন্য পথও আছে। বিশেষত যখন একজন বিশিষ্ট পাকিস্তানি পণ্ডিত যিনি মাত্রই অক্সফোর্ডে তাঁর গবেষণা শেষ করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাঁর নজর রাখছেন বলে শোনা যাচ্ছে।"

— "ঠিক আছে। তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, যদি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে চায়, আমি আনন্দিত চিত্তে সরে দাঁড়াব। যেমন সেই ব্রাহ্মসমাজের মহিলা আমাকে বলেছিল, জীবনটাকে খুব আঁকড়ে ধরা উচিত নয়। সবসময়েই অন্য কোথাও আরেকটি পৃথিবী আছে— কেবল কখনও কখনও চলে যাওয়াটা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল এবং আমি নিশ্চিত নই এটাও তেমনি কিছু কি-না। আর যাই হোক, আমার এখানে ভালো লাগছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পটভূমির আড়ালে এইসব যৌক্তিক বোধবুদ্ধিকে মৃদু খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল সেই পূর্বানুভূতি যে, রক্তপাত ঘটবেই এবং যতই আমি সহিংস জরুরি অবস্থাগুলোতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করি না কেন, আমার নিজের জন্যে অবীরোচিতভাবে শারীরিক অনুপস্থিতিকেই বেশি পছন্দ করি। সুতরাং একটি কণ্ঠস্বর বলছিল, "থাকো", অন্যটি, "যখন যাওয়াই ভালো, যাও"।

অতএব, আমি রয়ে গেলাম, যাবার প্রস্তুতি নিয়ে কিন্তু কোন অসম্ভব চাপে পড়ে নয়, এবং তার জন্যে কোন তাড়াহুড়োও ছিল না। ততদিনে শিখে গেছি যে পাকিস্তানে, এমনকি বন্ধুদের মাঝেও নিজের উদ্বেগ নিয়ে সরবে চিন্তা করা বোকামি, তাই আমি এসব ভাবনা মনের ভেতরেই রেখে দিলাম। এইসব ব্যাপার নিয়ে এতটুকুও ভাবতেন, এমন যে-কারও কাছে আমি সম্ভবত নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে অন্ধ বলে বিবেচিত হতাম।

উপাচার্য আমাকে ভীষণ গোপনে বললেন, যা কিছু ছাত্র ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, যে, গোয়েন্দা বিভাগ আমার ব্যক্তিগত চিঠি পড়েছে এবং অনুমোদন করেনি। তাই তিনি আমাকে সতর্কতার সাথে লিখতে বললেন। তিনি আরও কয়েক বৎসরের জন্যে চাকুরির চুক্তি বৃদ্ধি করার আহ্বান জানালেন। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, যেহেতু এটা তাঁকে প্রয়োজনে আমার অপসারণের চাপের বিরুদ্ধে যুক্তি দেবে। কিন্তু আমি কোন চুক্তি দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাইলাম না। অতএব, ধন্যবাদের সাথে প্রত্যাখ্যান করলাম। আর ব্যাপারটি সেখানেই শেষ হলো। কেবল এই অনুভূতিটিই এতে প্রখরতর হলো যে আমার বরং যাবার প্রস্তুতিই নেয়া দরকার।

ইতিহাসের অধ্যাপক ও জগন্নাথ হলের ওয়ার্ডেন ডঃ পি. সি. চক্রবর্তী কোন-একটি কাজে দেখা করতে এসেছিলেন ; তিনি চুপচাপ একটি সাদা খাম আমার ডেস্কে ফেলে গেলেন। একা হলে আমি খামটি খুললাম। দুটো পত্রিকার কাটিং ছিল ওতে কলকাতার Statesman কাগজের, একটিতে বানারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধানের পদের জন্য বিজ্ঞাপন, অন্যটি ভারতীয় পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদের জন্যে, অভিবাসীর কিছু অংশ সেখানে লাহোর পার হয়ে গেছে এবং সাময়িকভাবে জুলুন্ধরের কাছে হুশিয়ারপুরে বসতি গেড়েছে।

হিন্দু অধ্যাপক দলের ডঃ চক্রবর্তী ছিলেন সেইসব স্বল্পসংখ্যক উত্তরজী বিদের একজন, যিনি পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকে দীর্ঘদিন ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। তিনি ছিলেন পর্যবেক্ষণশীল, শান্ত ও ঠাণ্ডামাথার লোক, আমার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল এবং মোটেও মজা করার জন্যে ষড়যন্ত্রের খেলা খেলবার মতো মানুষ নন। আমি ইঙ্গিতটি গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং দুটো নিয়োগের জন্যেই চেষ্টা করব ভাবলাম। কিন্তু চাইলাম না যে আমার কোন চেষ্টাই গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ধরা পড়ুক বা ডাকবিভাগে হারিয়ে যাক আর কোন উত্তর পাবার আগেই রটনায় পরিণত হোক। আমি অপেক্ষা করলাম যতদিন না কোন নির্ভরযোগ্য বন্ধু কলকাতায় যান এবং সেখানে চিঠিগুলো পোস্ট করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তাহ চলে গেল, কিন্তু যেহেতু কোন উত্তর এল না, মনে হলো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই আমার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এক বিকেলে আমি যখন ডিসেম্বরের সূর্যালোকে স্নাত হচ্ছিলাম, এক পুরনো ছাত্র এলো, ভালো লাগার মতো অপদার্থ তরুণ, যে দ্বিতীয় শ্রেণী পায়নি এবং ঢাকা থেকে বেশ দূরে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছে। গমগমে কণ্ঠস্বরে, যা নিশ্চয়ই উপাচার্যের বাড়ি পর্যন্ত পৌছেছিল, সে ঘোষণা করল সে জানতে পেরেছে আমার পাঞ্জাবের পথে রওনা হবার খবর, যেখানে ভাবাই যায় না যে আমি নিজের ইচ্ছেয় যেতে পারি। সে জানতে চাইল সরকার আমার হাত থেকে নিস্তার পেতে কোন চাপ সৃষ্টি করছে কি না। তা যদি হয় তবে সে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আমার যত ছাত্র ও পুরনো ছাত্র আছে সবাইকে সক্রিয় করে তুলবে এবং এমন একটি হৈহট্টগোল শুরু করবে যে কেউ আমার দিকে একটি আঙুল তুলতে সাহস পাবে না। কেউ আমায় কোন হুমকি দিচ্ছে না তাকে এমনটি বিশ্বাস করাতে বেশ সময় লাগল। সে বিশ্বাসই করতে চাইছিল না, কারণ,সৎ এবং অন্যায়ের শিকার এমন কারও উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দেয়াকে সে হৃদয়ের এক সাহসী ও মহান উদ্যোগ হিসেবে নিয়েছিল, সেইসাথে গ্রাম্য স্কুলের একঘেঁয়েমি থেকে এটা হত তার জন্যে স্বাগত পরিবর্তন। কিন্তু আমার দিক থেকে এমন একটি হৈ-হাঙ্গামা ঘটার ভয়াবহ পরিণতি হয়ত এই হত যে, আমি যদি এখনও দ্বন্দ্বে ভুগতাম নিজের থেকেই সরে যাব, না চাপের জন্যে অপেক্ষা করব, তা হলে ব্যাপারটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। কিন্তু এ-ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলার মতো কিছুই ছিল না। উপাচার্যের কাছে সে-ব্যাপারে কিছু বলার আগে এই বেপরোয়া তরুণের কাছে আমার মনের দোলাচল প্রকাশ করতে আমার ঔচিত্যবোধ আমাকে বাধা দিল। গোয়েন্দা বিভাগের স্পষ্টতই বিবেকের এমন দংশন ছিল না।

এরপর, এটা আর কোন বিস্ময় রইল না যখন পরদিন সকালে একটি চিঠি পেলাম ক্রিসমাসের ছুটির মধ্যে দিল্লি গিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শর্মার সাথে দেখা করার একটি তারিখ জানিয়ে। আমি উপাচার্যকে খবরটি জানালাম, দিল্লি গেলাম এবং সে-বছর অনার্স পরীক্ষার্থীদের শেষ টার্মের খাতা দেখে তিন মাসের মধ্যে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে এলাম। বিতাড়িত বা নির্বাসিত না হয়ে অন্য কোনভাবে একটি দেশ থেকে বেরিয়ে আসা কখনও কখনও সেখানে ঢোকার চেয়ে বেশি কঠিন হয়ে ওঠে। আমি আর এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ও কাস্টমের সেই বিভীষিকার কথা মনে করব না, কারণ, যাঁরা একবার পূর্বের সীমান্ত পার হয়েছেন তাদের কাছে সে-অভিজ্ঞতা বলার প্রয়োজন নেই আর যাঁরা পার হননি তাঁদের বলে বোঝানো যাবে না। তবে সে সবই আবার গতকালকের মাথাব্যথার মতো মিলিয়ে যায়। আর সেই প্রধান প্রতিবন্ধকতাবাদী (শয়তান) যাঁর রাজ্য এই সবটাই, তাঁর হয়ত কোন খারাপ ইচ্ছা ছিল।

আমার যাবার ক'দিন আগে ঠিক সময়মতো প্রজ্ঞাপনটি এল, সেইসব গোপন সংবাদের একটি হয়ে ব্যাপক প্রচারণাই যার উদ্দেশ্য, যাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশি নৌকা বা বাইসাইকেলে করে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করা আইনবিরোধী। এর একটি ধারণাও আমার মাথায় আসেনি, কিন্তু জিনিসপত্র গোছানোর এই চূড়ান্ত এলোমেলো পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা দুটোকে ভীষণ অপ্রতিরোধ্য রকমের লোভনীয় মনে হচ্ছিল।

যেটা ভোলার নয় তা হচ্ছে বিদায়ের উদার উষ্ণতা। যখন আবদুলকে জানানো হলো তখন সে, যে-ছাত্রটি দ্বিভাষীর কাজ করছিল তার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল, "উনি কি নিজেই যেতে চান নাকি তাকে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে?" ও বেশিকথার লোক ছিল না, কিন্তু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার একটি নিজস্ব ভঙ্গি খুঁজে নিয়েছিল যেটিকে আমি গভীরভাবে প্রশংসা করি। আমার দুজন ইউরোপীয় বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে আসছিলেন এবং কোন কারণে দেরি হচ্ছিল। আব্দুল, খুব ভালোই জানত, যে, ঢাকায় সে-ই সবচাইতে ভালো বেয়ারা ও বাবুর্চি এবং ইংরেজ ও আমেরিকান যে-কোন নিয়োগকর্তাকে ও বেছে নিতে পারে ; ও শান্তভাবে অপেক্ষা করল প্রায় ছয়মাস বেকার থেকে, যতদিন না ওঁরা এলেন এবং তারপর নিজেকে তাঁদের কাছে উপস্থিত করল। আমি তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করব আশা করেছিলাম কিন্তু এর চাইতে ভালো উত্তরাধিকারী দিয়ে যেতে পারতাম না।

আমি ভাসাভাসা বুঝতে পারছিলাম আব্দুলের মতো আমার সহকর্মীরা এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও জেনে গিয়েছিল যে, আমার এই এখন আমার এখানে থাকার বিরুদ্ধে কিন্তু আমাকে তারা বুঝিয়েছিল যে তাঁদের জগতে আমার অনুপস্থিতি তারা ভীষণ অনুভব করবে যাবার বেলায় এমনটিই হয়। আমি নিজের ইচ্ছাতেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তবু এটা অবিশ্বাস্য লাগছিল যে এমন চমৎকার বন্ধুদের ছেড়ে, উৎসাহের এমন চমৎকার অংশীদারদের ছেড়ে, যেতে আমি আদৌ চেয়েছি। কিন্তু ট্রেন হুইসেল দিল, কেঁপে উঠল এবং প্ল্যাটফর্মে হাত-নাড়া ভিড় ক্রমে দৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে এল।

আমার গল্পটি সঙ্গতভাবে এখানেই শেষ হয় যেখান থেকে আমি আর প্রত্যক্ষদর্শী নই। পরের পাঁচ বছর আমি ভারতের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি, এত দূরে যে সেখানে ঢাকার কথা বলাও খুবই অর্থহীন শোনাত যদিও কথাগুলো ছিল খুবই জোরালো। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথেই চলছিল, এবং পরের বছর কী হয়েছিল তার একটি ছোট বিবরণ অন্তত উপসংহারের জন্যে দেয়া দরকার, কারণ তাতেই প্রমাণ হয়েছিল যে, সে ছিল, আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম তার চাইতেও দীর্ঘ ও মরিয়া এক যুদ্ধ।

যেমনটি হয়, ফেব্রুয়ারির বাজেট অধিবেশনে সমস্যাটি শুরু হলো। ছাত্ররা উর্দুর সাথে সমানভাবে পাকিস্তানি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির দাবিটি নূতন করে জানাতে একটি মিছিল সংগঠিত করেছিল। তারা সশস্ত্র পুলিশের মুখোমুখি হলো যারা তাদেরকে পেছনে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করল। ইটপাটকেল ছোড়া হলো, পুলিশ হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করল এবং বেশ কজন ছাত্র মারা গেল। তারপর যখন ছাত্রদের অনেকেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল পুলিশ তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়া করল এবং ফটকের ভেতরে ক'জনকে মেরে ফেলল। পরে গুলির ঘটনার একটি আনুষ্ঠানিক তদন্তে দেখা গেল পুলিশ নির্দোষ যেমন তারা ছিল, হয়ত এই অর্থে যে পুলিশ মাথা-গরম করেনি এবং আদেশ ছাড়া গুলি করেনি। আবার যে-পরিস্থিতিতে পুলিশ গুলি করেছিল উদ্ভূত সেই পরিস্থিতির জন্যও কোনভাবে পুলিশ দায়ী ছিল না ; তবে তদন্ত কমিটিরও কাজ নয় তত গভীরভাবে দেখা। তারা হয়ত গুলি করত না যদি না সরকার বিশ্বাস করত যে, আন্দোলনের পেছনে জনসমর্থন আছে এবং এটাকে নিরস্ত করে সরকার একটি বহুবিস্তৃত গণউত্থানকে দমন করেছিল। সবদিক থেকেই মনে হলো যেন তারা দমিত হয়েছে, কারণ কদিন অসন্তোষের পর শহরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হলো, আর মফস্বলে কোন বিদ্রোহ ছিল না। কিন্তু সেইদিন ফেব্রুয়ারির ২১শে, তার পর থেকে পূর্ববাংলার ছাত্ররা স্মারক ছুটি হিসেবে পালন করে আসছে এবং গুলির সেই জায়গায় যে-স্মৃতিস্তম্ভ তারা গড়ে তুলছিল, সেখানেই দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১-এ সেটি ধ্বংস করার আগে পর্যন্ত।

আমার সন্দেহ হয় বহির্বিশ্ব কখনওই এই ঘটনার সম্পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল কি-না। কীভাবেই-বা করবে যখন সীমান্ত পেরিয়ে যে-সংবাদ যেত তা পাকিস্তানি সরকারের গণমাধ্যম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত? এই দ্বন্দ্বে এটাই প্রথম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রক্তপাত, যা ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় শেষ পর্যন্ত একাত্তরের যুদ্ধে রূপ নিয়েছিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, আর জনগণের চোখে ছাত্রদেরকে তাদের ঝটিকাবাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যেহেতু ভাষাপ্রশ্নে গণআবেগকে এই মৃত্যু আরও তীব্রতর করে তুলল যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা গেল না, শিগ্‌গিরই, বছরের মধ্যেই বাংলা স্বীকৃতি পেল, উর্দুর সাথে সাথে, যার মানে গিয়ে দাঁড়াল যে কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হলো পূর্বাঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বাধীন একটি কাদার তালমাত্র নয়।

এমন সাংঘাতিক মূল্যে ছাত্ররা তাদের পাওনা জিতেছিল। আমার পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গির বেপরোয়া বিশ্বাসে, আমার মনে হত যে একটি ন্যায্য দাবির জন্যে তারা আরও কার্যকরভাবে লড়তে পারত যদি তারা প্রথমত নিজেদের শাখায় আরও যোগ্যতা অর্জন করত ; তারা রাজনীতিবিদদের খরচযোগ্য গুটি হওয়া থেকে নিজেদেরকে নাগরিকদের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করল যাদেরকে উপেক্ষা করা যায় না যেহেতু তারা অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু ঘটনাটি আমার চিন্তাভাবনাকে অর্থহীন করে তুলল। অথবা তা-ই কি? কারণ, হতাশাগ্রস্তদের জন্য কূটনীতির চেয়ে অবাধ্যতা অনেক বেশি স্বাভাবিক অস্ত্র এবং ক্ষমতার নিশ্চয়তা অনেক বেশি বোধগম্য সন্তুষ্টি আনে, একটি নির্দিষ্ট ক্ষোভকে দূর করার চেয়ে। তারা কি অপ্রয়োজনীয় রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল এমন একটি কারণে যা হয়ত এতকিছু না ছুড়ে ফেলে দিয়েও জেতা যেত? অথবা এটাই কি সত্যি যে যেহেতু ক্ষমতা নিজেই কেবল যারা তাকে ধরে রাখতে পারে তাদেরকে এর নিরঙ্কুশ যথার্থতা বিশ্বাস করাতে পারে, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কোনকিছুই সরকারকে টলাতে পারত না, একমাত্র ক্রমাগত এর ক্ষমতাকে অস্বীকার করা ছাড়া? এই সব প্রশ্ন কখনও উত্তর পাবে না, কারণ গবেষণাগারে পরীক্ষা করার মতো করে ইতিহাসকে আবার বিচার করা যাবে না, এটা দেখার জন্যে, যে, উপাদানগুলো অন্যভাবে মেশালে ফলাফল কী হত। অতীত বর্তমানকে রূপ দেয় এবং চুপচাপ বসে হয়ত কেউ এই দেখতে পায় যে লোকেরা যদি যেমনটি ছিল তেমনটি না থাকত, তবে হয়ত এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে পারত যেখানে আত্ম-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা অত বেদনাময় রকম কঠিন হত না।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অন্য গল্পের, কিন্তু যেহেতু এইসব স্মৃতি খুবই ব্যক্তিগত, তাই আমার সততার সাথে বলা উচিত যে সেখানেও আমি স্থায়ী বন্ধুত্ব পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম সহকর্মী ও ছাত্রদের যাদেরকে না জানলে দুঃখ রয়ে যেত, এবং যদিও আমি কখনও পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি মুসলিমদের সাথে কাজ করিনি, আমার সন্দেহ করার কারণ নেই যে সেখানেও হয়ত এমনই হত। আমার মনে হয় জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোই সত্যিকার জিনিস এবং গোষ্ঠীগতভাবে জনগণের ব্যবহারে তার প্রভাব পড়ে, কিন্তু একটি অপরিচিত পরিবেশে তারা নিজের দেশের চেয়ে অনেক বেশি অনধিকারচর্চা প্রবণ হয়, যেখানে সর্বজনীন বলে তাদেরকে হয়ত নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা হয় কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে তারা গভীরতম বা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব মিল ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তোলে তা জাতীয়তাবাদ থেকে উঠে আসে না, অথবা একসাথে অংশ নেয়া ধর্মীয় বোধ থেকেও নয়, নয় একই শ্রেণীজাত বেড়ে ওঠা থেকেও, যদিও এর যে-কোন একটিই এই সবকিছুকে জানার পথটি মসৃণ করতে পারে। অথবা ইতিহাস যেমন পরিষ্কার করে দেয় বাঙ্গালী, পাঞ্জাবি, ইংরেজ, জার্মান বা আমেরিকান বা চীনা কোন পরিচয়ই নিশ্চয়তা দিতে পারে না সভ্য আচরণ নষ্ট না হওয়ার। অন্য যে-কোন জিনিসের চেয়ে সহজে এটাকে নষ্ট করতে পারে ভয়, আর কর্তৃত্বের ও দাসত্বের সম্পর্ক কখনওই পারস্পরিক ভয় থেকে মুক্ত নয়। ইউটোপিয়ার কোন নীলনকশা আমার নিজের পকেটে বহন করে বেড়ানোর ভান না করে আমি এই ধরনের নীলনকশার ব্যাপারে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলাম যা কিনা ঐ সম্পর্ককে একটি সংক্ষিপ্ত পথ হিসেবে ব্যবহার করতে ছাড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~